ভ্র ম ণ কা হি নী

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দেশে

আনিসুল হক

ভ্রমণ কাহিনী

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দেশে

আনিসুল হক

সন্দেশ

www.nagorikpathagar.com

সন্দেশ
ISBN-984-70209-0036-8
স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দেশে
আনিসুল হক

স্বত্ব © মেরিনা ইয়াসমিন

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১১১৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

২৪০.০০ টাকা

www.nagorikpathagar.com

উৎসর্গ

আরিফ ভাই, মুনমুন আপা

www.nagorikpathagar.com

লেখকের আরো বই:

রাজা যায় রানি আসে (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৬)
ফ্যান্টাসী (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৬)
খেয়া (উপন্যাস ১৯৯৬)
অন্ধকারের একশ বছর (উপন্যাস ১৯৯৫)
আসলে আয়ুর চেয়ে বড়ো সাধ তার আকাশ দেখার (কবিতা ১৯৯৫)
গণতান্ত্রিক ফ্যান্টাসী (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৫)
কথাকার্টুন (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৪)
গদ্যকার্টুন (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৩)
আমি আছি আমার অনলে (কবিতা ১৯৯১)
খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে (কবিতা ১৯৮৯)

www.nagorikpathagar.com

সূচিক্রম

গল্প বলে শুরু # ৯
ওয়াশিংটনে আগন্তুক # ১৬
সেই শাদা বাড়িটি # ২৩
২০ কোটি টাকা টেলিফোন বিল! # ৩২
কলারাডো স্প্রিংস : ছবির মতো শহরে # ৪০
আমেরিকায় বিক্ষোভ দেখতে যাওয়া # ৪৮
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন... # ৫৬
জীবনের প্রথম বরফ # ৬৫
ও জে সিম্পসন, কালো-সাদা এবং ড. ইউনূস # ৭৪
১৪ হাজার ফুট পর্বতে আরোহণ # ৭৯
আমেরিকার সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে খারাপ # ৮৩
চার্চে # ৯১
মফস্বল থেকে নিউইয়র্কে # ৯৭
প্রবাসীতে # ১০৮
আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি, তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ # ১২৫
বিদায় আমেরিকা # ১৩২

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

গল্প বলে শুরু

একটা গল্প বলে শুরু করি। এক ফরাশি যুবক এলো বাংলাদেশে, পর্যটনে। এ দেশে আসার আগে সে শুনেছে বাঙালিরা শিবলিঙ্গে পূজা করে। বাংলাদেশে এসেই সে প্রথমে দেখতে গেলো শিবলিঙ্গ। এরপর তার বাঙালি সঙ্গী তাকে নিয়ে গেলো গ্রামে। গ্রামের রাস্তায় তখন মাটিকাটার কাজ চলছিল। মজুরেরা পথের দুই ধারে মাটি কেটে কাজের পরিমাপ রাখার জন্য ছোট ছোট মাটির ঢিপি বানিয়ে রেখেছিল। সিলিন্ডার আকৃতি সেই সব ঢিপি দেখে ফরাশি যুবক প্রশ্ন করলো, ওই মাটির ঢিপিগুলো কি শিবলিঙ্গ? এই বিদেশীকে নিয়ে যাওয়া হলো গুলিস্তানের কামান দেখাতে। এখানেও তার জিজ্ঞাসা, এটা কি লোহার শিবলিঙ্গ?

দিন সব সময় সমান যায় না। এবার বাঙালি সঙ্গীটি গেলো প্যারিসে, এই যুবকের সঙ্গে। আইফেল টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবকটি বললো, ভাই, তোমরা তো দেখছি আমাদের চেয়েও অনেক বেশি শিবলিঙ্গ পূজারী, এতো বড়ো একটা শিবলিঙ্গ তোমরা কতো যত্ন করে এখানে খাড়া করে রেখেছো।

এই যুবকদ্বয়ের শিবলিঙ্গ দর্শনের মতোই আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দর্শন। ছয় সপ্তাহের দ্রুতগতির সফর। স্বল্প মেয়াদের সফর বলেই বহু কিছু আছে, যা আমি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারি। ওখানে দীর্ঘদিন থাকলে সেসব আমার চোখে সয়ে যেত, ফলে বলবার মতো বিষয় বলে সেসব আর গণ্য হতো না। বাংলাদেশে অল্প দিনের জন্য বেড়াতে এলেই কোনো বিদেশীর পক্ষে বলা সম্ভব- এই দেশে তিন চাকার সাইকেল সদৃশ এক বিশেষ মনুষ্যচালিত যান আছে, যাকে রিকশা বলে। কোনো বাঙালির জন্য রিকশা হয়তো দর্শনীয় বস্তু নয়, কিন্তু লণ্ডনের কমনওয়েলথ জাদুঘরে নাকি একটা আস্ত সত্যিকারের রিকশা আছে, আর ওটা তাদের মূল্যবান কালেকশন বলে তারা গর্বও নাকি করে থাকে। তো ইউএসএ-তে আমি কি কি শিবলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছি? প্রথমে একটা পর্যবেক্ষণের কথা বলি।

www.nagorikpathagar.com

টিকটিকি ও মার্কিনীরা জল খায় না

টিকটিকি জল খায় না? শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার একটা উপন্যাস শুরু করেছিলেন এই বাক্য দিয়ে ; গল্পের নায়ক ক্রমাগত ভেবে চলেছে, টিকটিকি কি জল খায়? জল খেতে কেউ কি কখনো দেখেছে টিকটিকিকে?

আমেরিকায় ছয় সপ্তাহ আমিও ক্রমাগত ভেবে মরেছি, আচ্ছা, মার্কিনীরা কি পানি খায়? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি পেয়িছি, না, খায় না। ওদের হোটেল, রেস্তরাঁ, বারে সব কিছু পাবেন, পানি ছাড়া। খাবার খেয়ে ওরা খায় সোডা (কোক, পেপসি ইত্যাদি)। কিংবা সব ধরনের মদ। কিন্তু পানি? কদ্যপি নয়। যদি আমার মতো নিতান্ত বেরসিক মানুষ বলে, ভাইটি, দয়া করে একটু পানি দাও না, তাহলে গ্লাস ভরে ওরা সাজিয়ে দেবে আস্ত আস্ত বরফ। খেলে খাও বরফ গলা পানি, কিংবা কামড়ে কামড়ে খাও বরফ। আর আছে বোতলবন্দী মিনারেল ওয়াটার। কিনে খাও।

মার্কিনীরা পানি খায় না কেন? কে জানে? আমার শিবলিঙ্গ দর্শনের দর্শনে এর ব্যাখ্যাটা এ এরকম : ওরা নিতান্তই কঠোর কঠিন একঘেঁয়ে জীবনযাপন করে। সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করে তারা। কোনো শিফট নেই, ৮ ঘণ্টা- ১০ ঘণ্টার বালাই নেই। বেশির ভাগই ছুটছে ব্যক্তিগত আয় উন্নতির পেছনে, অন্য কিছুর দিকে তাকানোর সময় নেই। অনেকে বেতন পায় ঘণ্টা হিসেবে, অতিরিক্ত খাটলে অতিরিক্ত পয়সা। সপ্তাহে পাঁচ দিন এভাবে খেটে ওরা পায় দুই দিনের উইকএন্ড- সাপ্তাহিক ছুটি।

ওই দুই দিনে তোমরা কি করো? এ প্রশ্নের জবাবে এক আমেরিকান সাংবাদিক আমাকে বলেছে, ঘরে কোনো না কোনো কাজ থাকে। হয়তো বাথরুমের কলটা সারাতে হবে, নয়তো শোবার ঘরের ছাদে একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। হায়রে কর্মপাগল মানুষ। এই বৈচিত্র্যহীন মার্কিন জীবনে ওরা সব সময়ই খোঁজে মজা, ফান। পানি তাই ওদের কাছে নিতান্তই ঝাঁজহীন, পানসে। ওরা পান করে ঝাঁজযুক্ত পানীয়। একই কারণে ফুটবলের চেয়ে আমেরিকান ফুটবল ওদের কাছে এতো সমাদৃত। আমেরিকান ফুটবল খেলা যেন জুডো, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ কাবাডি সমুদয় দাঙ্গা হাঙ্গামার সমাহার। আমাদের ফুটবল দেখে ওরা হাসে। এটা কোনো খেলা হলো?

নির্ভেজাল পানি আর শিল্পিত ফুটবলের মজা তোমরা কি বুঝবে? তোমরা হাত দিয়ে নারকেলের মতো খেলনা খেলে তার নাম দিয়েছো ফুটবল। সারা পৃথিবী যাকে ফুটবল নামে জানে, তাকে তোমরা বলো সকার। তোমাদের জন্য আমার একটাই প্রার্থনা- হ্যাভ ফান গাইজ।

এই ঔষধি আমি কি রূপে পাইলাম

ভারতের বাঙ্গালোরে একটা সেমিনার ছিল। ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে মেরিনাকে সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। শুধু তাই নয়, এও সিদ্ধান্ত হলো- আমাকে সঙ্গে

www.nagorikpathagar.com

যেতে হবে। আমি বললাম, তথাস্তু। কলকাতার বিমান ধরার জন্য বসে আছি জিয়া বিমান বন্দরের লাউঞ্জে। হঠাৎ দেখা অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সঙ্গে। বহু বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্প চললো। অবশ্য গল্প না চালিয়ে উপায় ছিল না। এয়ার ইণ্ডিয়া ঐতিহ্য বজায় রেখে ছিল বহু ঘণ্টার লেট।

মুনতাসীর মামুন স্যার বললেন, এতো দিন কাজে কর্মে পুরুষেরা বাইরে যেত, সঙ্গী হতো বউয়েরা, এবার মেয়েরা বাইরে যাচ্ছে, সঙ্গী হচ্ছে বরেরা। বেশ তো।

স্যারের এই রসিকতা একজন সাম্যবাদী মানুষ হিসেবে আমি সানন্দে সহাস্যে উপভোগ করলাম। কিন্তু ঈশ্বর সম্ভবত ততোটা নারীবাদী নন। এক সপ্তাহের ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরতেই শুনলাম, কাগজ এসে গেছে। 'কংগ্রাচুলেশন্স। ইউ হ্যাভ বিন চোজেন এজ ওয়ান অফ দি টুয়েলভ পার্টিসিপ্যান্টস ইন দি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিজম একচেঞ্জ প্রোগ্রাম, আউটঅফ ওয়ান এইটি অ্যাপ্লিকেন্টস ফ্রম অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড।' এবার আমার সত্যি সত্যি বিস্মিত হবার পালা। মাস তিনেক আগে একটা ফরম পেয়েছিলাম, একেবারে শেষ দিনে। রাতারাতি পূরণ করে ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওই ফরমের একটা পয়েন্ট ছিল ৫০০ শব্দে একটা রচনা লেখো। তোমাকে আমেরিকায় নেয়া হবে কিনা বহুলাংশে তা নির্ভর করবে এই রচনার ওপরে। লেখালেখি করতে আমার আলস্য নেই। রাত ১২টায় বসে গেলাম লিখতে। ৫০০ শব্দ লিখতেও তেমন অসুবিধা হয়নি, অসুবিধা যা হয়েছে তা এই ইংরেজি নিয়ে। পরদিন ভোরবেলা সেই ফরম ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিলাম যথা নাম্বারে। ভেবেছিলাম ৫ পৃষ্ঠা ফ্যাক্স লাগবে শপাঁচেক টাকা। কপাল খারাপ। ১৪০০ টাকা বেরিয়ে গেলো। পুরো দুদিন মন খারাপ হয়ে রইলো। লটারির টিকেটের পেছনে ১০ টাকা করা যায়, কিন্তু ১৪০০ টাকা? ফ্যাক্স করতে যিনি কাগজগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন, হোটেল শেরাটনের ফ্যাক্স মেশিনে ভিড় জমে গিয়েছিল। সবাই একই নাম্বারে একই ফরম পূরণ করে পাঠাচ্ছিল।

লটারিতে নিজের নাম ওঠার মতোই নাম উঠে গেলো। মেরিনা বলতে লাগলো, আমি বলেছিলাম না, তোমারটা হবে। তোমাকে আমি বাঙ্গালোর নিয়ে গেছি, এখন তুমি আমাকে আমেরিকা নিয়ে চলো।

আমাদের এই আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিনিময় কর্মসূচির উদ্যোক্তা তিনটি মার্কিন সংগঠন– আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউজ পেপার এডিটরস, সেন্টার ফর ফরেন জার্নালিস্টস ও ফ্রিডম ফোরাম। পৃথিবীর ১২টি দেশের ১২ জন তরুণ সম্পাদক এই কর্মসূচিতে আমন্ত্রিত। বাংলাদেশ থেকে আমি একা। কিন্তু নেমন্তন্ন পেয়ে আনন্দে লাফানোর বদলে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেলো। আমার ইংরেজি বিদ্যার কি হবে? আমেরিকা ফেরত অভিজ্ঞরা অভয় দিতে লাগলেন, ইংরেজি কোনো ব্যাপার না। আমার ভয় তবু কাটে না। সহজ ইংরেজি শিক্ষার যাবতীয় বই ও ক্যাসেট নিয়ে আমি রীতিমতো লেগে পড়লাম। রবার্ট ব্রুস ৭ বারের চেষ্টায় যুদ্ধ জয় করেছেন আর আমি তিন মাসে ইংরেজি আয়ত্ত করতে পারবো না!

www.nagorikpathagar.com

আজ ফিরে আসার পর বলি, ইংরেজি নিয়ে মার্কিন দেশে আসলেই কোনো সমস্যা হয় না। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল ইউক্রেনের এক সাংবাদিক- দিমিত্রি। সে সব সময় একটাই কৌতুক বলতো এবং নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতো। কৌতুকটি হলো- একজন সভিয়েট গোয়েন্দা ১৫ বছর আমেরিকায় ছিল গোয়েন্দা বৃত্তিতে নিয়োজিত। ১৫ বছর পর দেশে ফিরে গিয়ে সে রিপোর্ট করলো কেজিবি সদর দফতরে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছো?

সে বললো, হ্যাঁ।

কি রকম?

আমি দুটো ইংরেজি বাক্য বলতে পারি। ডু ইউ হ্যাভ এনি সিক্রেট ইনফরমেশন? আর থ্যাংক ইউ।

তেমন মজার গল্প নয়। কিন্তু এই গল্প শুনেই বুলগেরিয়ার মেয়ে নাতাশা হা হা করে হাসতো। নাতাশার হাসি রোগ আছে।

আমন্ত্রণ পাওয়া গেলো। যাতায়াত থাকা খাওয়ার চিন্তা নেই। কিন্তু ওরা বলে দিয়েছে, নিজের ভিসা নিজেই করে নাও। অসুবিধা হলে আমাদের জানিও।

মার্কিন ভিসা, বন্ধুদের মুখে শুনেছি, এক মহা মহার্ঘ বিষয়। ভোর বেলা লাইনে দাঁড়াতে হয়, ইংরেজিতে ইন্টারভিউ দিতে হয়। আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম। তার ওপর আমি মার্কিন অ্যামবাসি চিনি না।

রাত যখন গভীর হয়, সূর্যোদয় তখন কাছিয়ে আসে। এই মহা সঙ্কটে আমার উদ্ধারে এগিয়ে এলো ইউসিস ঢাকা। ওরা আমাকে বললো, পাসপোর্ট দিয়ে যাও। আমি পাসপোর্ট দিয়ে দুদিন পর ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। ভেতরে জ্বলজ্বল করছে মার্কিন ভিসা। ফলে মার্কিন দূতাবাস চেনার কষ্টকর কাজটা আমাকে আর করতে হলো না। থ্যাংক ইউ ইউসিস, থ্যাঙ্ক ইউ আসাদুজ্জামান বাচ্চু।

ইউসিসের বাচ্চু সাহেব আমাকে বলেছিলেন, আপনাকে এ রেফারেল দেয়া হয়েছে। বি রেফারেলও খুব ভালো। কিন্তু এ রেফারেল হচ্ছে ভিআইপিদের জন্য।

সেই কথা মনে করে আমি আজো আপন মনেই হাসি। কি একটা ফরম পূরণ করে পাঠিয়ে দিলাম, আর ভিআইপি হয়ে গেলাম। আমার শার্টের নিচে গেঞ্জি তো এখনো ময়লা। আঙুলের নখের ভেতরে কালো ধূলি আসলে, এই সফরে আমার একটাই শিক্ষা হয়েছে, তা হলো- দুনিয়াটা চলছে যোগাযোগের ওপরে। তুমি যোগাযোগ করো, তুমি নানান দাওয়াত টাওয়াত পাবে, যোগাযোগ করো না, মনে হবে ওরা কতো বড়ো, গুরুত্বপূর্ণ কতো জায়গায় ওদের ওঠবোস। ফুঃ।

আমাদের এই প্রোগ্রামের ডিরেক্টর এলজবিয়েটে। তিনি পোল্যান্ডের মেয়ে। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে তিনি প্রায়ই ফোন করতেন ভোরের কাগজ অফিসে। আল্লাহ্‌র রহমত, ওই সময় আমি অফিসে থাকিনি। ইংরেজিতে কথা বলার ভয়ে তখন আমি ছিলাম রীতিমতো সঙ্কুচিত।

www.nagorikpathagar.com

এলজবিয়েটার ফ্যাক্স এলো। তোমার টিকেট ঢাকার ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। নিয়ে যাও।

টিকেট নিয়ে দেখি, ফেরার পথে লণ্ডনে বিমান দাঁড়াবে পনেরো ঘণ্টা। এই পনেরো ঘণ্টা আমি কি করবো? এক ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি সোজা চলে গেলাম বৃটিশ হাই কমিশনে, বললাম, ভিসা দাও। ওরা দিয়ে দিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছি– এ কথা ঘরে বাইরে বেশ রাষ্ট্র হয়ে গেলো। ঘরে আমার কদর গেলো বেড়ে। যে সব খাবার আমার প্রিয়, দেখি সেসব ঘন ঘন রান্না হচ্ছে। আর অফিসে লোকজন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে ঈর্ষা প্রকাশ করতে লাগলো। আজ শ্রীলঙ্কা, কাল শারজা ঘুরে বেড়ানো স্পোর্টস রিপোর্টার উৎপল শুভ্র বললো, দ্যাখো, আমার সামনে আমেরিকা নিয়ে কোনো কিছু বলবা না, হিংসায় আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। অন্য অনেকেরই ঈর্ষা হচ্ছে। ওরা মুখে বলে না, কিন্তু আমি তো সরল সত্যবাদী মানুষ, মনে এক মুখে আরেক, আমি তা করতে পারবো না।

যাত্রা হলো শুরু

সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ ১৯৯৫ রাত ৯টায় বৃটিশ এয়ার ওয়েজের এক ফ্লাইট যোগে আমি ঢাকা ছাড়লাম। উদ্দেশ্য ওয়াশিংটন ডিসি। আমার মেয়ে পদ্যর বয়স সেদিন দুমাস।

প্লেনে আমার পাশে বসেছেন দুজন ভদ্র মহিলা। এই ফ্লাইট যাবে লণ্ডনে। সেখানে ফ্লাইট বদলাতে হবে।

পাশের ভদ্র মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়ি কি সিলেটে? ওরা পরস্পর মাতৃভাষায় কথা বলছেন আর পান বিনিময় করছেন। বৃটিশ এয়ারওয়েজ বড় পর্দায় বিবিসির খবর দেখাতে লাগলো। ইংরেজি শেখার আশায় আমি মনোযোগী ছাত্রের মতো তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

দিল্লি এয়ারপোর্টে খানিকক্ষণের বিরতি দিয়ে প্লেন হিথরো বিমান বন্দরে যখন চাকা রাখলো, লণ্ডনে তখন ভোর হচ্ছে। হিথরোতে আমার পরবর্তী ফ্লাইট দুপুর একটায়। এই ঘণ্টাছয়েক আমাকে এয়ারপোর্টের ভেতরেই ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে দিতে হবে। প্রথম কাজ যেটা করলাম. তা হলো ২০ ডলার ভাঙিয়ে পাউণ্ড বানানো। তারপর কয়েন বক্স টেলিফোনে দাঁড়িয়ে টেলিফোন করলাম, প্রথমে লণ্ডনে এক আত্মীয়ার বাসায়, অতঃপর আবদুল গাফফার চৌধুরীর বাসায়। মি. চৌধুরী বাসায় নেই, সম্ভবত লণ্ডনেই নেই, সুতরাং কথা হলো না। এরপর রিং করলাম ঢাকায়।

হ্যালো, আমি লণ্ডন থেকে বলছি, হিথরো থেকে, তোমাদের ওখানে এখন কটা বাজে, দুপুর একটা? এখানে সকাল আটটা। কি একটু কথা বলতে না বলতেই হাতের কয়েন সব ফুরিয়ে এলো। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভালো থেকো, রাখি, খোদা হাফেজ।

www.nagorikpathagar.com

এবার মনে হলো একটু চা খাওয়া যাক। এয়ারপোর্টের ভেতরে অনেক রেস্তরাঁ। একটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেলফ সার্ভিস। একটা ছোট নিমকি আকৃতির নিরেট রুটি আর এক কাপ কফি নিলাম। দাম? মাত্র তিন পাউণ্ড। কফি নিয়ে এসে বসলাম টেবিলে। এবার মনে মনে হিসেব করবার পালা। তিন পাউণ্ড মানে কি? কমপক্ষে ১৮০ টাকা। আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ঢাকার নিউমার্কেটে এই কফির দাম ৭ টাকা। আর এই রুটি? ২ টাকার বেশি না। ব্যাটা ৯ টাকার জিনিস দিয়ে ২০ গুণ বেশি দাম রেখে দিল!

প্রিয় পাঠক, পরবর্তী কয়েকদিন আমার এই এক রোগ হয়ে গিয়েছিল- গুণন ম্যানিয়া। যে কোনো ডলারের অঙ্ককে সঙ্গে সঙ্গে ৪০ দিয়ে গুণ করা। ওয়াশিংটন ডিসিতে নেমেই বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে আমার ঠোঁট ফেটে যেতে লাগলো। ভাবলাম, ভিটামিন রিবোফ্লোবিন কিনে খাই। দেশে দুই টাকার রিবোফ্লোবিন কিনলেই চলতো। ওয়াশিংটন ডিসিতে রিবোফ্লোবিন খুঁজে না পেয়ে কিনলাম এক কৌটা ভিটামিন বি। দাম পড়লো ১০ ডলার। ৪০০ টাকা। আমি এই ওষুধের ঘায়ে প্রায় পুরো অসুস্থ হয়ে পড়ি আর কি!

আমার এই রোগ (৪০ গুণন ম্যানিয়া) সেরেছে অ্যামেরিকার শেষ সপ্তাহে, নিউ ইয়র্কের বাঙালিদের সঙ্গে মিশে। ওরা ডলারকে ডলার বলে না, বলে টাকা। ২৫ সেন্টকে বলে চার আনা। ওদের সঙ্গে মিশে মিশে এখন আমারও ডলারকে টাকাই মনে হয়। দেশে ফিরে একদিন আমি ৪০০ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিলাম। মেরিনা বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ৪০০ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া? আমি শান্ত স্বরে বললাম, কি এমন বেশি। মোটে তো ১০ ডলার। আমেরিকায় কতো ১০ / ১২ ডলার ট্যাক্সি ভাড়া দিলাম।

লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরটা আমার কাছে মনে হলো মানব চিড়িয়াখানা। কতো বিচিত্র মানুষ! এর মধ্যে নানান পদের ইণ্ডিয়ান মানুষ আছে। শাড়ি পরা, শাড়ি ছাড়া, পাগড়ি পরা, জিনস পরা। তবে চিড়িয়াখানার তখনো আমি সামান্যই দেখেছি। পরবর্তীকালে আমেরিকায় গিয়ে বুঝেছি- কতো বিচিত্র জাতের মানুষ একটা দেশে জড়ো হতে পারে।

ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে

এবার হিথরো ছেড়ে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে যাত্রা। আমার পাশে বসেছেন এক শ্বেতাঙ্গ যুবক। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কটায় পৌঁছবে। আমি বললাম, আমেরিকান সময় বিকেল চারটায়। এরপর ভদ্রলোক গভীর মনোযোগে ম্যানেজমেন্টের বই পড়তে লাগলেন। ৯ ঘন্টার ফ্লাইট। কতোক্ষণ আর পড়বেন? আমি গল্প জুড়ে দিলাম। ভদ্রলোকের নাম জন। ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকেন। গিয়েছিলেন লণ্ডন। ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইউরোপ যেতে হয়। আমি কি কাজে যাচ্ছি, সবিস্তারে বললাম।

www.nagorikpathagar.com

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। নিজের সাফল্যে আমার আত্মহারা হবার যোগাড়। আরে, আমি এক আমেরিকানের সঙ্গে এতোক্ষণ কথা বললাম! ইংরেজিতে! ওয়াও!

ওয়াশিংটন ডিসি ডাল্লাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখলাম। কাঁধে ব্যাগ। হাতে ইমিগ্রেশনের ফরম। সব যাত্রী একই দরজা দিয়ে নামলো, এরপর শুরু হলো শ্রেণী বিভাজন। যারা আমেরিকান সিটিজেন, তারা সোজা বেরিয়ে যাও। যারা ইউরোপের, অমুক অমুক দেশের তারা অমুক লাইনে দাঁড়াও। আর এর বাইরে থেকে যারা এসেছো, তারা গণলাইনে দাঁড়াও।

সেই বিকেলটি ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিল বেশ বিষণ্ন ধূসর, আলো কম, শীত শীত, ম্লান; দীর্ঘ ৩৬ ঘন্টার ধকলে আমার শরীর জুড়ে ক্লান্তি।

ইমিগ্রেশনের ছয় সাতটা লাইন। আমি একটার পেছনে দাঁড়িয়ে। নিজেকে বড়ো অনাত্মীয় বলে মনে হলো চারদিকের পরিবেশের বিচারে। ঠিক তখনই দেখি পাশের লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে এক পরিচিত বাঙালি। ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গ্রামীণ ব্যাংকের ইউনূস। বড়ো ভালো লাগলো। ক্লিনটন পরিবারের প্রশংসাধন্য ড. ইউনূস যদি এভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, তবে আমি পারবো না কেন?

ড. ইউনূস একই ফ্লাইটে এসেছেন। কিন্তু প্লেনে একবারও আমি তাকে দেখলাম না কেন? অনেকবার তো পুরো প্লেন হাঁটাহাঁটি করেছি। অবশ্য বৃটিশ এয়ার ওয়েজের এই বিমানগুলো সিনেমা হলের সমান। খুঁজে না পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবু মনে হলো, ড. ইউনূস বিমানে ঠিক আমাদের সমতলে ছিলেন না। ইকোনোমি ক্লাসে তো নয়ই, সামনের বড়লোকদের ক্লাসেও নয়। বিমানের ভেতরেই কোনো দোতলা আছে নাকি? অতি দামী শ্রেণী ড. কি সেখানে ছিলেন? ড. ইউনূসকে জিজ্ঞাসা করা যায়।

নিজের লাইন ছেড়ে তাকে হ্যালো বলতে যাবো কিনা ভাবতে ভাবতেই তিনি ইমিগ্রেশন পার হয়ে ওয়াশিংটন ডিসির বিজনপ্রান্তরে হারিয়ে গেলেন।

পরে আমি অবশ্য তাকে খুঁজে পেয়েছি, সেটা পরের গল্প।

www.nagorikpathagar.com

ওয়াশিংটনে আগন্তুক

ওয়াশিংটন ডিসি ডাল্লাস বিমানবন্দরে আমাকে রিসিভ করতে লোক আসার কথা। ট্রলিতে স্যুটকেস তুলে ঠেলতে ঠেলতে এগুচ্ছি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে পথ চিনতে হয় না, পথই পথিককে চিনে নেয়। মানবস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই হলো। আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি যে পথ চিনি না।

আমার হাত ধরার জন্য একজন সখা দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে একটা কাগজ ধরা। তাতে মোট চারটি নাম লেখা। একটা নাম আমার। হক। আমি গিয়ে বললাম, জনাব আমি এসে গেছি। উনি বললেন, আমি এক সঙ্গে চার জনকে নিতে এসেছি। এর মধ্যে তুমিই প্রথম এলে। বাকি রইলো আরো তিন জন। তুমি এক কাজ করো, হাতমুখ ধুয়ে এসো, আরো ঘন্টাখানেক তোমাকে বসে থাকতে হবে।

ঘন্টাখানেক নয়, মিনিট তিরিশেক পর উনি বললেন, চলো, চলো, ওরা এসে গেছে। ওয়াশিংটন ডিসি ডাল্লাস এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা মাইক্রোবাসে উঠে পড়লাম। আমেরিকান গাড়ি। দেখতে কিম্ভুত। ওরা এটাকে বলে লাক্সারি ভ্যান।

আমার সঙ্গে এ ভ্যানে উঠেছেন আরো দুজন। পরিচয় বিনিময়। একজন ফাতোস ভ্রাদি। ইনি এসেছেন আলবেনিয়া থেকে। বয়সে তরুণ। ছিপছিপে গড়ন। চামড়া শাদা। অপরজন তুলকুন। দেখতে মঙ্গোলিয়ান ধরনের। এসেছেন কিরগিজস্ত ান থেকে। কিরগিজস্তান সাবেক সভিয়েট ইউনিয়নের অংশ ছিল। দেশটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যেই, চীনের উত্তরে।

লাক্সারি ভ্যান ছুটে চলেছে। ঘন্টাখানেকের পথ। পথের দুধারে সবুজের সমারোহ। উঁচুনিচু ভূমিতল। আর নানা ধরনের অট্টালিকা। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের দিকে তাকিয়ে তুলকুন বললো, বিউটিফুল বিল্ডিং। আমি অবশ্য ওর মধ্যে তেমন কিছু বিউটি খুঁজে পেলাম না। তুলকুনকে দোষ দেয়া যায় না। একে তো মহিলা, তার ওপর এসেছে সাবেক সভিয়েট ইউনিয়ন থেকে। ইউএসএ'র বহু কিছু এদের মুগ্ধ করবেই।

অর্ধেক পথ এসে ড্রাইভার সাহেবের হুঁশ হলো, চার জনের মধ্যে তিন জনকে নিয়ে তিনি রওনা হয়েছেন। চতুর্থজনের কথা তিনি ভুলে গেছেন। এবং এই চতুর্থ

www.nagorikpathagar.com

জন মহিলা। একা একা বেচারী কি বিপদেই না পড়বে! ড্রাইভার নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগলেন।

সন্ধ্যার পর পর এসে পৌঁছলাম হোটেলে। দি হ্যাম্পশায়ার হোটেল। হ্যাম্পশায়ার এভিনিউতে।

ফরাশি ভাজা, ফরাশি চুমা

শেভ-গোসল সেরে বেরুতে বেরুতে রাত নটা বেজে গেলো। আলবেনিয়ার ভ্লাদিকে বলে রেখেছিলাম এক সঙ্গে খেতে বেরুবো। বের হলাম। রাত নটায় বেশির ভাগ রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। আমেরিকানরা সান্ধ্য আহারী। সন্ধ্যা মানে সন্ধ্যাই রাত্রি নয়। অধিকাংশ মানুষ রাত ৮টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নেয়।

একটা পিজার দোকান খোলা পাওয়া গেলো। শ্বেতাঙ্গ তরুণ ভ্লাদিকে সামনে ঠেলে ওর পেছন পেছন আদি দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। কিভাবে অর্ডার দিতে হবে, কিভাবে দাম দিতে হবে, কিছুই জানি না। ভ্লাদি যা যা করবে, আমিও তাই করবো।

কিন্তু ভ্লাদি পরীক্ষায় পাস করতে পারলো না। খাবার পছন্দ করে দাম দিয়ে সেই খাবারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোকানী তাকে ছোটখাটো ধমক দিয়ে বললো, যাও বসো। খাবার তৈরি হলে ডাকা হবে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। দোকানী এতো খারাপ ব্যবহার করলো কেন? চিকেন বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের অর্ডার দিয়ে বিরস মুখে আমি বসে রইলাম। দোকানীকে কাজে সহযোগিতা করছে বছরদশেকের এক ছেলে। রাত ৯টার সময় রেস্তরাঁয় শিশু শ্রমিক কাজ করছে খোদ আমেরিকায়? এই ব্যাটারা আমাদের গার্মেন্টসে শিশু শ্রমের বাহানা তোলে কোন মুখে? সারা ছয় সপ্তাহে আমেরিকার তিন অংশে হোটেলে রেস্তরাঁয় আমি বহু কিশোরকে কাজ করতে দেখেছি। ওরা নাকি শখ করে কাজ করে। বড় লোকে চাউল ভাজা খেলে হয় শখ আর গরিবে খেলে হয় অভাব।

চিকেন বার্গার মুখে দিয়ে আমার কান্না পাবার যোগাড়। ভয়াবহ স্বাদ। এর চেয়ে বাংলাদেশের আলমের এক নম্বর পচা সাবানও নিশ্চয়ই খেতে ভালো। এক কামড় দিয়ে সরিয়ে রাখলাম। আমার ভরসা এখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবারটা নিশ্চয়ই বেশির ভাগ পাঠকই চেনেন। লম্বা লম্বা করে আলু কেটে ডুবন্ত তেলে ভেজে নিলেই ফরাশি ভাজা। দেশে এই খাবারটা আমার খুবই প্রিয় ছিল। বহু আগ্রহ ভরে আমি একটা আলুর টুকরা মুখে তুললাম। হায় আল্লা। তুমি আমাকে একি খাওয়ালে। বিস্বাদ। আমার ধারণা, দোযখে এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দুবেলা দোযখবাসীকে খাওয়ানো হবে। প্রায় পুরোটা খাবার ফেলে দিয়ে কোক দিয়ে পেট ভরে বেরিয়ে এলাম রেস্তরাঁটা থেকে।

হোটেলের সামনের রাস্তাটা নির্জন। শনিবার রাত। ছেলেমেয়েরা একজোড়া দু'জোড়া করে নাইটক্লাবে যাচ্ছে। আমাদের হোটেলের সামনের ফুটপাথে একটা

www.nagorikpathagar.com

বালক, আরেকটা বালিকা। ১২-১৩ বছর বয়স হবে দুটোরই। আমাদের দুজনের উপস্থিতিকে ঘোরতরভাবে অগ্রাহ্য করে তারা দাঁড়িয়ে পড়লো ফুটপাথের মধ্যখানে। তারপর চুমু খেতে শুরু করলো। যে সে চুমু না, ফরাশি চুমু। ফ্রেঞ্চ কিস। ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট আড়াআড়ি করে ধরে পেটভরে খাওয়া চুমা। মনে মনে দুটো প্রবাদ আওড়ালাম। এক- আজকালকার পোলাপান, বাপেরে কয় হুক্কা আন। দুই- আল্লা তুমি রহমানুর রহিম, কাউরে দিলা মুরগির বাচ্চা, কাউরে দিলা ডিম। দ্বিতীয় প্রবাদটা অবশ্য আমার নিজস্ব কম্পানিতে ম্যানুফ্যাকচারড। আলোচ্যক্ষেত্রে প্রবাদটি প্রয়োগের অর্থ- আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে পারলাম না, আর দুটো অবোধ বালক বালিকা ফ্রেঞ্চ কিস খাচ্ছে। ক্ষুধিতের প্রতি বিধাতা তোমার একি নিষ্ঠুর রসিকতা।

রুমে ফিরে স্যুটকেস খুলে বের করে ফেললাম জাদুর বাক্স। এক প্যাকেট সন্দেশ। আসার আগে আগে আরিফ ভাই স্যুটকেসে ভরে দিয়েছিলেন। মনের দুঃখে মনের সুখে সন্দেশ খেতে শুরু করলাম।

ওয়াশিংটন ডিসি চক্কর

১ অক্টোবর ৯৫। দুপুরে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেলো। প্রথম কাজ হলো ওয়াশিংটন ডিসি গাড়িতে করে ঘুরে দেখা। ১২ দেশের ১২ জন নাগরিক একা গাড়িতে। সেই লাক্সারি ভ্যান। ড্রাইভার কেবল ড্রাইভারই নন, গাইডও। তিনি গান ছেড়ে দিলেন। হিন্দি ক্লাসিকাল মিউজিক। ব্যাপার কি? আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া? জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ। ২০ বছর আগে এসেছেন ভারত থেকে। আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা সাংবাদিক এসেছেন ত্রিনিদাদ থেকে, তার নাম ভ্যানিসা বকশ। ভ্যানিসার দাদাবাড়ি ভারতের দক্ষিণে। তার দাদার নাম কি খোদা বকশ বা এলাহি বকশ ছিল? জিজ্ঞাস করিনি। কিন্তু ভ্যানিসার চেহারা দেখে তাকে ব্রায়ান লারা, ভিভ রিচার্ডসের নিজের বোন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না।

গাড়ি ধীরে ধীরে ওয়াশিংটন ডিসির পথ ধরে এগুচ্ছে। গাইড সাহেব বিভিন্ন এলাকা ও বিল্ডিঙের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছেন গরগর করে। ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়া পোটোম্যাক নদীর ধারে অবস্থিত। কথা সত্যি। অপূর্ব সেই নদীর দৃশ্য। নদীর ধারে ঘন বাগান। ১৭৯১ সালে জর্জ ওয়াশিংটন ১০ মাইল বর্গ এই জায়গাটা বরাদ্দ করেন রাজধানী বানানোর জন্য। এটাই পৃথিবীর প্রথম পরিকল্পিত ও বানানো রাজধানী। মেজর পিয়ের এল এনফ্যান্ট হচ্ছেন এর স্থপতি। ১৮০০ সালে মার্কিন ফেডারেল সরকার এই রাজধানীতে চলে আসে। বর্তমানে ডিসির লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার। যদিও বৃহত্তর শহরে প্রায় চল্লিশ লাখ লোকের বাস। এ এলাকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে তারা বানিয়েছে তাদের সংসদ ভবন, ক্যাপিটল। জেঙ্কিনস হিল তাই এখন ক্যাপিটল হিল। আর প্রেসিডেন্টের বাসভবন এখান থেকে মাইলখানেক দূরে, নদীর কাছে। আইন পরিষদ আর নির্বাহী প্রধানকে

www.nagorikpathagar.com

শারীরিকভাবেই দূরে রাখার জন্য এইভাবে নগরপরিকল্পনা করা হয়েছে। ক্যাপিটল বিল্ডিঙের ভিত্তিপ্রস্তর বসানো হয় ১৭৮৩ সালে। হোয়াইট হাউজেরটি ১৭৯২ সালে। দুশ বছরের পুরনো স্থাপত্যগুলো এখনো বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে। এর একটা কারণ বোধহয় যে বিল্ডিংগুলো পোড়ামাটির ইটের তৈরি নয়। একেবারে নিখাদ পাথরে তৈরি।

গাইডের ধারাভাষ্য চলছে, আমরা ওয়াশিংটন ডিসির এ পথ সে পথ ঘুরঘুর করছি। কোথাও কোথাও গাড়ি থামছে। আমরা নেমে দেখছি। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ওয়াটারগেটে। খুবই দামী এক হোটেল। এই হোটেলের একটা কক্ষেই নিক্সন সাহেবের সেই কেলেঙ্কারির সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তার ইস্তফা দান। আমেরিকার রাজনীতির পাশাপাশি সংবাদপত্রের জন্য এটা খুবই বড়ো ঘটনা।

ওয়াশিংটন ডিসি আসলে আকারে ছোট। মোট ৬৭ বর্গমাইল। যদিও এর মেট্রো এলাকা অনেক বড়ো। সুতরাং ছোট্ট ডিসি দেখে আমার কাছে মনে হলো, আরে, এতো ওয়ারির সমান। আর ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা। লোকজন হাঁটে কম। যারা চলাচল করছে, সবাই গাড়িতে। কারো সঙ্গে কারো তাই মোলাকাত হচ্ছে না। প্রত্যেকে বন্দী লোহা আর কাচের ঘরে (অর্থাৎ গাড়িতে)। এমন নির্জন সড়ক দেখে মনে হয় কোনো ভুতুড়ে শহরে এসে পড়লামরে বাবা। মহেঞ্জোদাড়ো নাকি!

সন্ধ্যার মধ্যে আমরা চলে এলাম হোটেলে। এবার আমাদের কর্মসূচি পরিচালিকা এলজবিয়েটা আর তার তরুণী সহকারী আমেরিকান স্কাট যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। রাতের খাবার খেতে আমরা চললাম হোটেলের খুব কাছেই এক রেস্তরাঁয়।

দুপুরে খেয়েছি এক চাইনিজ রেস্তরাঁয়। ভ্লাদিকে পটিয়ে নিয়ে গেছি, চলো, চাইনিজ খাই। চাইনিজ খাবার মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ছিল। যদিও আমাদের দেশের মতো এখানকার চীনে খাবার মশলাদার নয়। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট ওরা সেখানে সেই ফুলই বেচবে চাইনিজ নাম দিয়ে। পর্ক খাবো না শুনে চীনা দোকানী আসার সময় আমাকে বললো, আশশালামু আলাইকুম, খোদা হাফেস।

সবাই মিলে রেস্তরাঁয় পৌঁছা গেলো। রেস্তরাঁর নাম ফ্রন্টপেজ। মানে প্রথম পৃষ্ঠা। এখানে সাধারণত সাংবাদিকরা এসে থাকেন খেতে ও আড্ডা দিতে। এ কারণে এই সংবাদপত্রসুলভ নামকরণ। রেস্তরাঁর বাইরে রাস্তার ধারে থরে থরে চেয়ার সাজানো। আমরা বাইরেই বসলাম। বাইরে বসতে পেরে সবাই খুব আনন্দিত। কেবল আমার মুখ শুকিয়ে আমসি। কারণ আমার ঠাণ্ডা লাগছে। পাঁচ ছয় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা মার্কিনীদের কাছে কিছু নয়। আমার সঙ্গে আসা অন্যরাও এমন তাপমাত্রায় অভ্যস্ত। কারণ ওরা এসেছে রাশিয়া, ইউক্রেন, পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, জর্জিয়ার মতো দেশ থেকে। এশিয়া থেকে তিন জন, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও কিরগিজস্তান থেকে।

www.nagorikpathagar.com

আমি ঠাণ্ডায় কাঁপছি আর আর প্রহর গুনছি কখন ডিনার শেষ হবে। ওয়েটার এসে মেনু দিয়ে গেলো। ভারী মজার মেনু। সংবাদপত্রের পাতার মতোন করে সাজানো। প্রথম পাতায় কেবল মজার মজার খাবার। লোকজন কেন ইদানীং শুধু সালাদ দিয়ে ডিনার সারছে, এই নিয়ে মজার বক্রোক্তি। আর কিছু বানানো পরিসংখ্যান। যেমন মার্কিনীরা খাবার শেষে ডেজার্ট খায় শতকরা ২৫ ভাগ, সঙ্গম করে শতকরা ২৫ ভাগ আর বাকি ৫০ ভাগ ডেজার্টও খায়, সঙ্গমও করে। অতি শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে আমি এদের এই রসিকতা উপভোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম সর্বশরীর দিয়ে। মেনুতে উল্লিখিত নামের খাবারটি কি হবে তা বোঝা আমার কর্ম নয়। আমি যাহোক একটা অর্ডার দিলাম। ১৪ জন ১৪ রকম অর্ডার দিল। সেসব খাবার এলে দেখা গেলো এক অসাধারণ দৃশ্য। কারো পাতে গরুর পাঁজরের পাতলা হাড়গুলো গোটা গোটা ভেজে এনে দেয়া হয়েছে। ওর সঙ্গে মাংস আছে সামান্যই, (হাড্ডি রাখারই জায়গা হয় না টেবিলে, আবার মাংস)। করুণ মুখে আমার পূর্ব ইউরোপিয়ান বন্ধুগণ আমেরিকার এইসব খাদ্য কাটাচামচ দিয়ে ছাড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছেন। ওদের দুর্দশা দেখে আমার মন ভালো হয়ে গেলো, শরীরের শীত কেটে দেখা দিল উষ্ণতা। চীয়ার্স, কমরেড- মনে মনে বললাম।

জীবনের প্রথম মেট্রো

২ অক্টোবর সারাদিন কেটে গেলো লেকচার শুনে শুনে। আমাদেরকে আমেরিকায় আনা হয়েছে ফ্রিডম ফোরামের পয়সায়। ফ্রিডম ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালে, ফ্রাংক ই গ্যানেট সাহেবের পয়সায়। এখন ৭২ কোটি ৫০ লাখ ডলার এই ফ্রিডম ফোরামের সম্পত্তির মূল্য। *ইউএসএ টুডে* পত্রিকা এই গ্যানেট হাউজের। ফ্রিডম ফোরাম সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার লক্ষ্যে তাদের ধরনে কাজ করে যাচ্ছে। *ইউএসএ টুডে* অফিসের পাশে আলাদা বিল্ডিংয়ে বিশাল ফ্রিডম ফোরাম ওয়ার্ল্ড সেন্টার। সারা দিন সেই ওয়ার্ল্ড সেন্টারের কনফারেন্স রুমে বসে লেকচার শুনতে হলো। শ্রেণী কক্ষ মার্কা বক্তৃতা শুনতে পেলেই আমার ঘুম চলে আসে। কাপের পর কাপ কফি পান করেও আমি দুচোখ থেকে ঘুম তাড়াতে পারছিলাম না।

ফ্রিডম ফোরামের নিচে অনেক কয় তলা মিলে বানানো হচ্ছে 'মিউজিয়াম'। সংবাদপত্র সংক্রান্ত মিউজিয়াম। মানুষের টাকা থাকলে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। ওরা করছে।

সকাল নটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করে অতঃপর ছুটি মিললো। এবার হোটেলে ফেরার পালা। নিজ দায়িত্বে ফিরতে হবে। ভার্জিনিয়া থেকে নিউ হ্যাম্পশায়ার এভিনিউ মাইল তিনচারেকের পথ। আমার পূর্ব ইউরোপিয়ান সঙ্গীরা সিদ্ধান্ত নিল হেঁটে হেঁটে ফিরবে।

www.nagorikpathagar.com

আমি ইন্দোনেশিয়ার ধিনাম, ত্রিনিদাদের বকশ আর আমার ইতিমধ্যে জুটে যাওয়া বন্ধু ভ্লাদি- আমরা মেট্রোয় চড়ে হোটেলে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। মেট্রো মানে টিউব রেলওয়ে। এর আগে জীবনে পাতাল রেল দেখি নাই। এই সুযোগ। এলজিবিয়েটা বলে দিয়েছে, ওয়াশিংটনের মেট্রো খুবই ভালো। এটা নিউ ইয়র্কের মতো নোংরা নয়।

রসলিন নামের মেট্রো স্টেশনে ভূগর্ভে অবতীর্ণ হলাম। অবতার হবার জন্য এখানে বাহন হচ্ছে এসকেলেটর। বহুত লম্বা। এতো নিচে তাকাতে ভয় লাগে। পাতালে নেমে টিকেট করতে হয়। এক ডলার ২৫ সেন্ট ভাড়া মেশিনে ঢুকিয়ে আমরা যার যার টিকেট হাতে পেলাম। সেই টিকেট গেটের মেশিনে ঢুকিয়ে আমরা অনুমতি পেলাম প্লাটফরমে যাবার। শত শত নারী পুরুষ ছুটে চলেছে যে যার গন্তব্যে। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। আমরা যাবো ডুপন্ট পয়েন্টে। এ জন্য আমাদের প্রথমে ধরতে হবে অরেঞ্জ লাইন। এ লাইনে গিয়ে নামতে হবে মেট্রো সেন্টারে। তারপর গাড়ি বদলে উঠতে হবে রেড লাইনে। অরেঞ্জ ট্রেন চলে এলো। অটোমেটিক দরজা খুলে গেলো। আমরা ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন চলতে লাগলো।

আমি লোকটা একটু নার্ভাস প্রকৃতির। বাসে ট্রেনে উঠলে সব সময়ই আমার ভয় হয় ঠিক স্টেশনে নামতে পারবো তো। যদি ট্রেন বাস আমাকে না নামিয়েই চলে যায়। টেনশনে আমি সাধারণত আগের স্টেশনেই নেমে পড়ি। এই ট্রেনে উঠে আমার মনে হলো- ঠিক গাড়িতে উঠেছি তো? আমি ট্রেনের গায়ে আঁকা ম্যাপ দেখতে লাগলাম। একি! আমরা তো উল্টো দিকে যাচ্ছি। ম্যাপের সঙ্গে দুএকটা স্টেশনের নাম মেলাতেই আমি আঁতকে উঠলাম। আমার অতি উদ্বেগের ফল জীবনে প্রথমবারের মতো ইতিবাচক হলো। সবাইকে নিয়ে পরের স্টেশনে নেমে পড়লাম। এবার ধরলাম উল্টো দিকের ট্রেন। ফলে খানিক কেঁচেগণ্ডুষ করে পৌঁছানো গেলো কাঙ্ক্ষিত মেট্রো সেন্টারে। সেখানে ট্রেন বদলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের হোটেলের কাছের স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

জীবনে প্রথম মেট্রোয় চড়ার অভিজ্ঞতা নিতান্ত খারাপ হলো না।

রোগের নাম দেশপ্রেম

রাতে হোটেলে বসে ফোন করলাম কানাডায়। ওখানে আমার ভাই আশরাফুল হক থাকেন, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটিতে। ভাবী থাকেন, ওদের তিন বছরের মেয়ে নোহা থাকে। নোহা টেলিফোনে মিহি গলায় বললো, চাচা, তুমি কেমন আছো?

ভালো মা, তুমি কেমন আছো?

আমি ভালো আছি, আল হামদুলিল্লাহ- তিন বছরের নোহা পাখির মতো চিকন সুরে বললো। ওর বাবা মা হেসে উঠলেন। এই কৃতজ্ঞতাবোধ নোহা সম্প্রতি অর্জন করেছে।

www.nagorikpathagar.com

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নোহা, তুমি খেয়েছো?

হ্যাঁ।

কি খেয়েছো।

ভাত, ডাল।

হাত দিয়ে খেয়েছো না চামচ দিয়ে?

হাত দিয়ে।

আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তো মা তুমি ভালো থাকবাই। হাত দিয়ে মেখে যে ডাল ভাত খেতে পারে তার চেয়ে সুখী আর কে আছে? শুনে ভাবী বললেন, এদের খাবারে এরা লবণ মরিচ দেয় না, নিজেকে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিতে হবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এর পর যে খাবারই নিয়েছি, সঙ্গে নিয়েছি সল্ট এণ্ড পেপার।

কানাডায় কথা বলে টেলিফোন রেখেছি কি না রেখেছি একটু পর পর টেলিফোন কল আসতে লাগলো সারা আমেরিকা থেকে। ব্যাপার কি? আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা একে একে ফোন করতে শুরু করেছে। আশরাফ ভাই কানাডা থেকে ফোন করে আমার নাম্বার দিয়েছেন একজনকে, তার কাছ থেকে একে একে জেনে যাচ্ছে সবাই– আনিসুল আমেরিকায়। বুয়েটের কতো ছাত্র যে সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়ানো। রাত্রি ১২টা ১টা পর্যন্ত হলো মাহমুদ, তাজুল, মিঠু, মতি, মোজাম্মেল আর মান্নানের সঙ্গে। সবাই জানতে চায় দেশের খবর। খালেদা জিয়া কেয়ার টেকার সরকার দেবে না! দিলে কি ক্ষতি! দেশে আর কতো হরতাল হবে! দেশে এখনো কেন এতো হরতাল হয়!

বেশ রাত করে ঘুমুতে গেলাম। ঘুম আসছে না। দেশে এখন দিন। হঠাৎ করে মনে পড়লো বিকেল বেলা হোয়াইট হাউজের বাইরে দেখা একটা দৃশ্য। একটা কালো পাগল মতো মানুষের হাত দুটো পিঠমুড়া করে বেঁধে তাকে উপুড় করে ফেলে রেখেছে কয়েকজন মার্কিন পুলিশ। অসহায় লোকটা হোয়াইট হাউজের বাইরে পড়ে আছে! কেবল হাত দুটো পিঠের কাছে বাঁধলে একটা লোক এমন অক্ষম হয়ে পড়ে! বিশাল আকাশের নিচে পড়ে থাকা ওই লোকটার জন্য খুব মায়া হতে লাগলো।

আমাদের দেশটারও ডানা দুটো বেঁধে একে ফেলে রাখা হয়েছে। এগুতে দেয়া হচ্ছে না একে। দেশপ্রেমহীন একগুঁয়েমি, ক্ষমতাসক্তি, নিজের প্রতি ভালোবাসার অন্ধত্ব অসহায় করে ফেলে রেখেছে এই দেশটাকে– কেবলি মনে হতে লাগলো এই কথা।

প্রিয় পাঠক, বাদ দিন, প্রবাসে থাকলে মানুষ অসুস্থ থাকে, এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে, সেই ব্যাধির নাম দেশপ্রেম। প্রবাসীর কোনো কথাতেই আমাদের কান দিতে নেই!

www.nagorikpathagar.com

সেই শাদা বাড়িটি

অক্টোবরের ৩ তারিখ সকালে আমাদের প্রোগ্রাম হোয়াইট হাউস সফর করা। নিজেকে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হতে লাগলো হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পাবো ভেবে। কিন্তু অকুস্থলে গিয়ে ভুল ভাঙলো। এটা কোনো বিশিষ্ট ব্যাপার নয়। হোয়াইট হাউসের একটা অংশ প্রতিদিনই জনগণের প্রদর্শনীর জন্য খুলে রাখা হয়। যে কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে সিকিউরিটি গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। বিদেশীরাও পারে, তাদের পাসপোর্ট দেখাতে হয়। আর যেকোনো দেশে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঢুকতে হলে আপনার শরীর ও ব্যাগ ধাতুমুক্ত রাখতে হবে, নইলে মেটাল ডিটেকটরে আপনি আটকে যাবেন। সকাল ৯টায় হোয়াইট হাউসের দর্শক প্রবেশপথে আমরা দীর্ঘ লাইনের শেষে দাঁড়ালাম। এই লাইনটা বোধহয় আগে থেকে যারা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে এসেছে তাদের। তাড়াতাড়িই ঢোকা গেলো। আরেকটা লাইন দেখলাম প্রায় অনন্ত ধরনের। শত শত আমেরিকান সেটায় দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধের সংখ্যা বেশি। আমেরিকায় অন্তত দুটো বিষয় আমার খুব ভালো লেগেছে। এক. ওদের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানেই দর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা আছে এবং বিশেষ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে নানা বিখ্যাত সরকারি বেসরকারি জায়গা সফর করে থাকে। সেটা যেমন হোয়াইট হাউস বা ক্যাপিটল হিলের মতন সরকারি জায়গা, তেমনি *ইউএসএ টুডে* বা *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার মতো বেসরকারি জায়গা। আমি বাংলাদেশে কোনো স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোনো পত্রিকা অফিস সফর করতে দেখিনি। দ্বিতীয় যে জিনিসটি ভালো লেগেছে, তা হলো, ওরা ওদের সব পাবলিক ভবনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেছে। সেটা সরকারি, বেসরকারি যাই হোক না কেন। সব সংবাদপত্র অফিস এখানে ধূমপানমুক্ত এলাকা। এমনকি অনেক হোটেল রেস্তরাঁও তামাকমুক্ত। প্রায়ই দেখবেন, ভবনের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে বা বরফের মধ্যে বেচারী ধূমপায়ী সিগারেট ফুঁকছে। তাকে দেখাচ্ছে চোরের মতো। ইউএসএ ধূমপায়ীদের মুখ তস্করের মুখমণ্ডলের মতো করতে পেরেছে– ভাবতেই ভালো লাগে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, এমন চোরবেশে যাদের ধূম্রশলাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন, তাদের এক বিশাল অংশ নারী, বলা

www.nagorikpathagar.com

যায়, সুবেশী তরুণী। মেয়েদের দুঃখকষ্ট দেখলে দরদ বোধ করি না– আমি মোটেও তেমন পুরুষ নই।

জনস্রোতের অংশ হিসেবে হোয়াইট হাউসে ঢোকা গেলো। প্রথমেই টুকটাক সুভেনিরের (স্মৃতিচিহ্ন) দোকান। আমেরিকানরা খাঁটি বেনিয়া। জিনিসপত্র বেচার কোনো উপলক্ষ তারা ছাড়বে না। হোয়াইট হাউসের প্রথম রুমটিতেই আপনি ইচ্ছে মতো জিনিসপাতি কিনতে পারেন। কিনতে পারেন হোয়াইট হাউসের বিভিন্ন অংশের ছবি, ভিউ কার্ড, হোয়াইট হাউসের মডেল ইত্যাদি। এরপর আপনি ঢুকতে পারেন কতোগুলো কক্ষে, যেগুলো নামকরণ করা হয়েছে রঙের নামে। যেমন গোলাপি কক্ষ। এই কক্ষে সবকিছুর রঙ গোলাপি। এরকম নীল কক্ষ, সবুজ কক্ষ– নানা কক্ষ আছে, সঠিক রঙের নাম আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে– এ ধরনের রঙ অনুযায়ী কক্ষ সজ্জার উদ্যোক্তা জ্যাকুলিন কেনেডি, বিখ্যাত জনএফ কেনেডির বিখ্যাত স্ত্রী। হোয়াইট হাউসের দেয়ালে বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের এবং তাদের পরিবারের আলোকচিত্র আছে। একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের বউ কাপড় কেচে শুকোতে দিচ্ছেন– এই আলোকচিত্র দেখে বেশ পুলক বোধ হলো। মৃত্যুর পর লিঙ্কনকে কোথায় শোয়ানো হয়েছিল, সেই জায়গা, একটা সুসজ্জিত ডাইনিং রুম এসব দেখতে দেখতে গাইডের মুখে জানা গেলো– হোয়াইট হাউসে একবার আগুন লেগে গিয়েছিল। অন্যের শয়নকক্ষের বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই বলে এবং নিজের ইতিহাস ভালো করে জানি না বিধায় অন্যের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানো পণ্ডশ্রম হবে মনে করে হোয়াইট হাউস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো আমি লিখে রাখিনি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা আমি জানি সেটা আপনাদের দেবো কি দেবো না ঠিক সাহস করে উঠতে পারছি না। তথ্যটা হলো হোয়াইট হাউসের বাইরের রঙ শাদা এবং এর ভেতরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকেন। মিসেস ক্লিনটন এই বাড়িতেই আছেন এবং তিনি এক কাপ চা খাওয়ানোর সুযোগও পাবেন না। কারণ আমরা বাড়ির সেই অংশে ঢুকবার অনুমতি পাচ্ছি না।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার ক্যামেরা বের করার পালা। এতোক্ষণ ছবি তোলা নিষেধ ছিল।

হোয়াইট হাউসের ভেতরে আমরা মোট গেছি তিনবার। আরো দুবার ইউএস প্রেসিডেন্ট ভবনে আপনাদের আমি নিয়ে যাবো, এই ভয়ংকর আশ্বাসবাণী জানিয়ে রেখে এখন যাওয়া যাক ভয়েস অফ আমেরিকায়। কারণ সকাল পৌনে ১০টায় আমাদের ওখানে পৌঁছবার কথা।

ভয়েস অফ আমেরিকায়

ওয়াশিংটন ডিসির সেন্ট্রাল স্ট্রিট। সেই লাক্সারি ভ্যানে চড়ে আমরা ১২ দেশের ১২ জন সাংবাদিক ভয়েস অফ আমেরিকার প্রবেশপথে সময় মতো পৌঁছে গেলাম।

www.nagorikpathagar.com

গেটে আমাদের নিতে এলেন একজন বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ। তার নাম সম্ভব জিনিন ব্যাস। ভয়েস অফ আমেরিকার নিম্নতম পদে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের পদের উন্নতি ঘটিয়েছেন এবং এখন অতি উচ্চপদে তিনি আসীন। তার পদযুগল যে অতি উচ্চ তা অবশ্য বলে দেবার দরকার ছিলো না। তবু তিনি বললেন। তিনি বললেন, মাত্র আধঘণ্টায় আমরা পুরো রেডিও স্টেশনটা ঘুরে দেখবো। আমার পক্ষে তা সহজেই সম্ভব। কারণ আমার পা দুখানি লম্বা। আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে, দ্রুত আমাকে অনুসরণ করতে হবে।

তিনি মুখ খুলতেই শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো। কি কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি অনুষ্ঠান শুনছি! ভরাট, সুমিষ্ট গলা। আমার এই মনে হওয়াকেও দোষ দেয়া যায় না। ভদ্রলোক আসলেই এই রেডিওতে ইংরেজি অনুষ্ঠান করেন।

এই কালাপাহাড়কে অনুসরণ করতে গিয়ে রীতিমতো দৌড়াতে হলো আমাদের। এর মধ্যে আমার অবস্থা হলো সবচেয়ে খারাপ। কারণ আমি বাঙালি। বোমা না ফাটলে বাঙালি সচরাচর দৌড়ায় না। আমরা ধীরেসুস্থে চলাচল করতেই অভ্যস্ত। পৃথিবীর অন্যত্র লোকজন এমনিতেই খুবই দ্রুত হাঁটে। আমাদের সেই ঐতিহ্য নেই। আমরা হাঁটবো কেন? আমাদের রিকশা আছে না!

আমাদের গাইড ভদ্রলোকের ব্যবহার অমায়িক। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের কক্ষগুলো আমাদের ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। তার আগে একটা ভিডিও ফিল্ম দেখালেন এই বেতারকেন্দ্রের ওপরে। বললেন তাদের অর্থকষ্টের কথা। ভোয়া মার্কিন সরকারের তথ্য বিভাগের একটা প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার সমাজ, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্রনীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে এর প্রতিষ্ঠা। সংবাদ, ফিচার, সম্পাদকীয়র মতো অনুষ্ঠান তারা প্রচার করে থাকে। কিন্তু এখন তাদের দুর্দিন যাচ্ছে। টাকার অভাব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ডেমক্রেট, কিন্তু সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানরা। এখন ওদেশে বাজেট মরশুম। রিপাবলিকানদের বলা হয় রক্ষণশীল, ডেমক্রেটদের উদার। রিপাবলিকানরা চায় স্মল গভর্নমেন্ট, ছোট সরকার। আমেরিকানরা বিশ্বাস করে ব্যক্তি স্বাধীনতায় আর ব্যক্তির সম্ভাবনায়। আমি কষ্ট করে আয় করি, তার বড় অংশ সরকার নিয়ে যাবে ট্যাক্স হিসেবে, সেই টাকায় ভয়েস অফ আমেরিকার মতো রেডিও চালাবে না সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করবে, তা হবে না। ট্যাক্স দিতে পারবো না। আমি একটা পোস্টার দেখেছি- ডোন্ট ট্যাক্স অন মাই বিয়ার। এই পোস্টারের প্রকাশক আমেরিকান বিয়ারপায়ী সমিতি। পোস্টারে একটা ছবি– এক লোক, চোখ বিয়ারের নেশায় টইটুম্বুর, রক্তিম; আঙুল তুলে আছে, ভাবটা এরকম এবার বিয়ারের ওপরে ট্যাক্স বসালে ক্লিনটনের রক্ত খেয়ে নেবো! ভয়েস অফ আমেরিকাতেও লেগেছে সেই অর্থনৈতিক সংকটের শীতুরে হাওয়া। অনেক ভাষার অনুষ্ঠানের মেয়াদ কমিয়ে দেয়া

www.nagorikpathagar.com

হচ্ছে। বাংলা ভাষার অনুষ্ঠানের মেয়াদও কমেছে। অনেকের চোখেমুখে চাকরি হারানোর আশঙ্কা।

আধ ঘন্টায় পুরো ভয়েস অফ আমেরিকার আন্তর্জাতিক সম্প্রচার কক্ষগুলো ঘুরে ফিরে দেখে আবার নিচে ফেরা গেলো। মনে হলো আমার নাম বিমল। এই মাত্র সাফ গেমসে ১০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিয়ে ফিরলাম।

কিন্তু নিচে একজনকে দেখেই আমার চোখ গেলো আটকে। আমি তার চোখের দিকে নিজের চোখ দুটো স্থায়ীভাবে স্থাপন করে ফেললাম। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এভাবে অন্তত ৩০ সেকেণ্ড। তারপর মৌন ভাঙার পালা। তিনিই মুখ খুললেন– আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

আহ্। কতোদিন পরে মাতৃভাষা। কতোদিন পরে বাঙালির মুখ (মোটেও বেশি দিন নয়। ৪ দিন!)। তিনি এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলেন, আমার নাম ইকবাল বাহার চৌধুরী। চলুন, বাঙলা বিভাগে যাওয়া যাক।

আমরা বাঙলা বিভাগের উদ্দেশে হন্টন যাত্রা শুরু করলাম। এবার বাঙালিচালে হাঁটা।

এই ফাঁকে বলে রাখি ইকবাল বাহার চৌধুরীকে আমি চিনলাম কি করে। প্রশ্ন করতে পারেন, বারে, বাঙালি বাঙালিকে চিনবে না! নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবে আমাকে অন্তত দুজন মেক্সিকান তাদের দেশী ভাই বলে ভুল করেছিল। একবার বাসে। ডেনভার থেকে কলার‍্যাডো স্প্রিংস যাচ্ছি। পাশে একজন মেক্সিকান বসলো। আমাকে স্প্যানিশ ভাষায় কি যেন জিজ্ঞাসা করলো। আমি ইংরেজিতে বললাম, কি বললে হে কিছুই তো বুঝছি না। সে তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি মেক্সিকো যাচ্ছো? আমি বললাম, না, এই তো পরের শহরেই নেমে যাবো।

আমেরিকায় এ ধরনের হিস্পানিকদের সংখ্যা জনসংখ্যার ৯%। পরিসংখ্যান বলছে, এ দেশের জনসংখ্যার ৮০% শ্বেতাঙ্গ, ১২.১ ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ, ৯% হিস্পানিক, ২.৯ ভাগ এশিয়ান ও প্রশান্ত দ্বীপীয়, .৮ ভাগ আদিবাসী আর ৩% অন্যান্য। মোট জনসংখ্যা ২৫ কোটির মতো আমার গুম্ফিত চেহারাখানি নাকি হিস্পানিকদের মতো। কে জানে, হয় তো গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজের ভ্রাতুষ্পুত্রের মতো দেখতে লাগে আমাকে। নিউ ইয়র্কে ইস্টরিভারের পাশে বিখ্যাত কুইন বরো ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই আমাদের বস্তির ছইয়ের নিচে ছিন্নমূল মানুষের সংসারের মতো দুতিন ঘর মানুষের বাস। তার পাশেই দুজন ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। আমার সঙ্গীরা ক্যামেরা বের করে নদী ও সাঁকোর ছবি তুলছে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখছি– কি মাছ উঠলো। এমন সময় এক তরুণ এসে সলজ্জ ভঙিতে বললো, তুমি কি মেক্সিকো থেকে এসেছো? আমি হেসে বললাম, না, বাংলাদেশ থেকে। তোমার কি সমস্যা? দেখি তার হাতে ক্যামেরা। সে একা। বুঝলাম, ছবি তুলতে চায়। বললাম, দাও, ছবি তুলে দিচ্ছি। দাঁড়াও।

www.nagorikpathagar.com

তো আমেরিকায় বাঙালিকে বাঙালি বলে চিনবেন কি করে? ভৌতপরীক্ষা বা ড্রাই টেস্টের উপায় বাৎলে দিচ্ছি।

এক. যদি দেখেন প্যান্টের সঙ্গে শার্ট ইন করে পরেছে, কিন্তু কলারের বোতাম খোলা ও টাই নেই, বুঝবেন ইনি বাঙালি। আমেরিকানরা টাই ছাড়া এভাবে কাপড় পরে না। জিনস হলে অবশ্য আলাদা কথা।

দুই. যদি দেখেন শার্টের ওপরে সোয়েটার পরেছে, বুঝবেন ইনি বাঙালি। আমেরিকানরা শার্টের ওপর সোয়েটার পরে না। ওরা কোট, কোটের ওপর ওভারকোট, জ্যাকেট ইত্যাদি পরে।

তিন. যদি দেখেন গলা বা মাথা ঢেকে পেঁচিয়ে মাফলার পরেছে, তবে বুঝবেন ইনি বাঙালি। আমেরিকানরা সাধারণত মাফলার পরে না। যারা পরে, তারা সেটা ব্যবহার করে টাইয়ের বিকল্প হিসেবে, ঘাড়ে পেঁচিয়ে কোটের নিচে ঝুলিয়ে রাখে। কলারাড্যো স্প্রিংসে একটা মার্কিন পরিবারের রিটায়ার্ড জেনারেশনের এক বৃদ্ধা তো হেসেই কুটিকুটি। ও কি, তুমি স্কার্ফ পরেছো কেন? ওতো মেয়েরা পর্দা করার জন্য পরে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা। তুষার ঝরছে। আর আমি কান ঢেকে মাফলার পরবো না? আমাদের দেশে বাস ট্রাকের ড্রাইভাররা হরদম অমন করে পরে না! এই বৃদ্ধাকে কিভাবে বোঝাই- যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার।

ইকবাল বাহার চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে ভোয়ার বাঙলা বিভাগে প্রবেশ করলাম। পরিচয় হলো সরকার কবীর উদ্দিন, জিয়াউর রহমান, দিলারা হাশেমের সঙ্গে। বাঙলা বিভাগের কক্ষটি বেশ বড়। দেয়ালে বাংলাদেশের কতগুলো পোস্টার। জিয়াউর রহমান তখন খুবই ব্যস্ত। আমাকে বললেন, আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেবো। আজ তো তাড়াহুড়া হয়ে যাবে। আপনি কি পরে সময় করতে পারবেন। টেলিফোনেও সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। আমি বললাম, হবে, হবে। খুব হবে। টেলিফোনে নয়, সরাসরি চলে আসবো। ৭ তারিখ শনিবারে আমার কোনো কাজ নেই। ওই দিন আসবো।

পরে শনিবারে (৭ অক্টোবর) একা একা মেট্রো রেলে চড়ে ভোয়া অফিসে এসে আমি একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। বটে। কেমন দিলাম? আজ্ঞে, আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে আমার কণ্ঠ ও হস্তপদের কম্পন যে মাত্রায় হওয়া সঙ্গত, সেই মাত্রাতেই হয়েছিল। যারা শুনেছেন, তারাও বলেছেন, আমি টেবিলে বাকপ্রতিভায় যতোটা স্বতঃস্ফূর্ত, মাইক্রোফোনে তেমন নই। আমি হেসে বলেছি, তবু ভালো রেডিওতে মুখ দেখা যায় না। না হলে বুঝতে পারতেন- কাঁপুনির আর কি দেখছেন স্যার, প্রশ্ন তো শুরু করেনইনি।

তবে আমার জিয়াউর রহমান সাহেবকে খুব পছন্দ হয়েছে। ইনি আমাদের আগের প্রজন্মের সাংবাদিক। বলা যায়, সিনিয়রদের একজন। তিনি অনেক গল্প

www.nagorikpathagar.com

করলেন। নিজে চা বানিয়ে খাওয়ালেন। দেশের খবর নেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, এরশাদ সাহেব আমার ওপরে একবার খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম তার সাক্ষাৎকার নিতে। প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিরোধী দলগুলোর ৪৮ ঘণ্টা হরতালের মাধ্যমে জনগণ আপনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে, আপনি কবে পদত্যাগ করছেন? প্রশ্ন শুনে উনি রাগে কাঁপতে লাগলেন।

দেশে ফিরে শুনলাম, যারা বিবিসিতে টেলিফোনে দুতিন মিনিটের সাক্ষাৎকারে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছেন, তারা ৩০ / ৪০ পাউণ্ড করে পাচ্ছেন। শুনে দমে গেলাম। আমাকে তো ভয়েস অফ আমেরিকা এক ডলারও দেয় নাই। না দিক। আমি দাবি পরিত্যাগ করছি। বেচারারা আসলেই অর্থকষ্টে আছে। বিল ক্লিনটন ও তার ফেডারেল সরকারের সব কর্মকর্তা কর্মচারীরই পেটে-ভাতে অবস্থা। কে যেন প্রস্তাব করলো, বাংলাদেশে হেলপ ক্লিনটন সাহায্য কর্মসূচি খুলবে। দুই চার ডলার চাঁদা তুলে ক্লিনটন সাহেবের দুর্দিনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। সাধু প্রস্তাব!

আবার হোয়াইট হাউস

৩ অক্টোবরেই দুপুর বেলা আবার হোয়াইট হাউসের গেটে আমরা হাজির। এবার আর ১২ জন নয়, ৬ জন। এবার আমাদের উদ্দেশ্য হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিং অবলোকন করা। হোয়াইট হাউসের প্রেস রুমে প্রতিদিন দুপুর দুটোয় প্রেস ব্রিফিং হয়। রুমটা ছোট। বেশি সাংবাদিক এক সঙ্গে ধরে না। বেশির ভাগ আসনই সিএনএন কিংবা ওয়াশিংটন পোস্টের মতো প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের জন্য স্থায়ীভাবে বরাদ্দ। অল্প যে ক'টা আসন খালি থাকে, তাতে আমাদের গ্রুপের ৬ জনের বেশি সাংবাদিককে এক সঙ্গে জায়গা দেয়া যাবে না। দুপুর ১টায় আমরা হোয়াইট হাউসের গেট পার হবো। কিন্তু প্রহরীরা আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা বাদ দিয়ে গভীর মনোযোগে রেডিও শুনছে। ব্যাপার কি? না, ওজে সিম্পসন বিচারের রায় ঘোষিত হচ্ছে। আমেরিকানরা যে কতো বড় উন্মাদ, ওজে সিম্পসন মামলা নিয়ে তাদের হুজুগ থেকে তা বেশ বুঝতে পারছি। আগের দিন থেকেই সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, কি রায় হয়, কি রায় হয়!

আমাদের সঙ্গে ছিল এক আমেরিকান তরুণী, শ্বেতাঙ্গ, নাম স্কাট। উদ্বেগে উত্তেজনায় তার অবস্থাও খারাপ। সে মহাউৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে পুলিশদের জিজ্ঞাসা করলো, কি রায় হয়েছে?

নট গিল্টি। ওজে সিম্পসন দোষী নয়।

দোষী নয়! দোষী নয়! স্কাট বিস্মিত। কিন্তু এই বিস্ময় সে গোপন করার চেষ্টা করছে। কারণ তার গায়ের রঙ শাদা। সে যে এই রায় গিলতে পারছে না, তার

www.nagorikpathagar.com

গলায় আটকাচ্ছে, এটা সে কাউকে বুঝতে দিতে নারাজ। সে বললো, ওজে দোষী নয়, তবে আমি জানি কে দোষী। আমি জানি কে দোষী।

ওদিকে হোয়াইট হাউসের প্রবেশ পথের কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশেরা খুশিতে আটখানা– তাদের প্রিয় কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড় ওজে সিম্পসন নির্দোষ! এদিকে স্কাট বলেই চলছে– আমি জানি, কে দোষী। সমস্ত আমেরিকা দুইভাগ হয়ে গেলো। কালোরা ভাবছে, ন্যায়বিচার হয়েছে। শাদারা ভাবছে, আদালত ওজেকে ছেড়ে দিলেও আসলে সেই খুনি। হোয়াইট হাউসের ভেতরে ঢুকলাম। দুটোয় প্রেস ব্রিফিং। এখন বাজে ১টা ১৫। ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা প্রেসরুমের বাইরে হোয়াইট হাউসের বিস্তারিত সবুজ চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। সবুজ মানে গাঢ় সবুজ ঘাসের গালিচা। তার ওপরে সার ছিটানোর গাড়ি সার ছিটিয়ে যাচ্ছে। এই গাড়িটা লনের এ মাথা ও মাথা লম্বালম্বিভাবে যাতায়াত করছে। চারদিকে অনেক গাছ। গাছের নিচে অকুতোভয় কাঠবিড়ালী খেলা করছে। আমেরিকার সর্বত্র আপনি প্রচুর কাঠবিড়ালী দেখবেন। হোয়াইট হাউসও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রেস রুমের বাইরে খোলা আকাশের নিচে বড় বড় টিভি ক্যামেরা। টেলিভিশনের তুখোড় সাংবাদিকেরা সে সব ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, হোয়াইট হাউস থেকে যুবক অমুক বলছি। একটা শর্ট আগেভাগে নিয়ে নেয়া আর কি!

আমরা যথাসময়ে প্রেস রুমে ঢুকলাম। যে কোনো সাধারণ স্কুলের একটা শ্রেণীকক্ষ যতো বড় হয়, রুমটা ততো বড়। এক প্রান্তে ছোট্ট মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে নীলপর্দা। পর্দায় শাদা রঙে হোয়াইট হাউসের সেই বিখ্যাত খিলানগুলো আঁকা। টেলিভিশনে ক্লিনটন সাহেবকে কথা বলতে দেখলে খেয়াল করবেন তার পেছনে নীল পর্দায় শাদা হোয়াইট হাউসের প্রতীক আঁকা। ওটাই সেই বিখ্যাত পর্দা। কক্ষটির অপরপ্রান্তে সব বড় বড় টিভি স্টেশনের বড় বড় ক্যামেরা।

হোয়াইট হাউসের এই প্রেস ব্রিফিঙে ক্লিনটন কোনো দিন প্রয়োজন মনে করলে আসেন, কোনো দিন আসেন না। আজ তিনি এলেন না। বদলে তার মুখপাত্র তার সারা দিনের কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। আজকের ব্রিফিঙের প্রধান আলোচ্য বাজেট সংকট। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তারা প্রথমে কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন বাজেট বিষয়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেন্ট কি ওজে সিম্পসন মামলার রায় শুনেছেন? তিনি কি সারপ্রাইজড হয়েছেন? তিনি কি দাঁড়িয়ে শুনেছেন নাকি বসে শুনেছেন?

বিকেল বেলা *ওয়াশিংটন পোস্ট* টেলিগ্রাম সংখ্যা বের করলো– ওজে নট গিল্টি। টেলিভিশনগুলো একযোগে ২৪ ঘণ্টা ওজে সিম্পসন মামলার রায় ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করলো। ভয়াবহ অবস্থা। কারো আর কোনো দিকে খেয়াল নাই।

www.nagorikpathagar.com

বাসের মধ্যে বসে রেডিওতে শুনলাম ফ্লোরিডায় সাইক্লোন হয়েছে। ১৪ জন নিখোঁজ। কিন্তু এই খবরে মার্কিনীদের কোনো উৎসাহ নেই। তারা মত্ত ওজে সিম্পসন মামলার রায় নিয়ে।

এরপর যখন মার্কিনীরা আমাকে বলেছে, ও বাংলাদেশ, ওখানে তো শুধু বৃষ্টি আর বন্যা আর সাইক্লোন হয়, আমি কষে মুখের ওপর জবাব দিয়েছি, বেআক্কেলের মতো কথা বলো না। তোমাদের ফ্লোরিডায় কি হচ্ছে। তোমরা সেই খবর চেপে গিয়ে ওজে সিম্পসন মামলার রায় নিয়ে মেতে রইলে। আমরা হলে ওই সাইক্লোনের খবরকে বেশি গুরুত্ব দিতাম। আমরা সেলিব্রেটির পেছনে না ছুটে মানুষের জীবন মৃত্যুর খোঁজ খবর রাখি, এই হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। এর বেশি কিছু না।

এর পরের দিন ৪ অক্টোবর দুপুরে আমরা আবার হোয়াইট হাউসে গিয়েছি। প্রেস রুমে বসেছি। আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হোয়াইট হাউসের পাশের এক সরকারি ভবনে। সেখানে হোয়াইট হাউসের মধ্য ও পূর্ব ইউরোপিয়ান পররাষ্ট্র বিষয়ক সিনিয়র পরিচালক ড্যানিয়েল ফ্রাইয়েড-এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছি আমরা। আমাদের মধ্যে অন্য ৬ জনের এখন প্রেস রুমেই থাকার কথা, ওরা প্রেস ব্রিফিং দেখেনি আগের দিন। কিন্তু শেষে প্রোগ্রাম বদল করে ওদেরও এ মিটিঙে আনা হয়েছে। সে ভালোই হয়েছে। কারণ আজকের প্রেস ব্রিফিঙে বিল ক্লিনটন নিজে উপস্থিত ছিলেন। ওরা ৬ জন ক্লিনটনের প্রেস ব্রিফিং কাভার করতো, আর আমরা তা থেকে বঞ্চিত হতাম, সেটা খুব সাম্যের কথা হতো না।

ড্যানিয়েল ফ্রাইয়েড লোকটা ছোটখাটো। কিন্তু চেহারা দেখলেই বোঝা যায়– কূটনৈতিক বুদ্ধির কূট চালে মগজ গিজ গিজ করছে। এই ভদ্রলোক দীর্ঘদিন মস্কোয় ছিলেন। সভিয়েট ইউনিয়ন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার পর এখন হোয়াইট হাউসে স্থায়ী হয়েছেন। এখন তো আর ঠাণ্ডা যুদ্ধ নেই। সব ঠাণ্ডা করে দেয়া গেছে। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে আমার কিন্তু খুব রাগ হলো। আমাদের স্বপ্নের দেশটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য এই লোক নিশ্চয়ই কম কোশেশ করেনি। আমাদের ১১ সহসাংবাদিকের বেশির ভাগই এসেছে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে। তারা বিপুল উৎসাহে ড্যানিয়েল ফ্রাইয়েড সাহেবকে প্রশ্ন করতে লাগলো। তাদের প্রধান জিজ্ঞাসা, আমরা কবে ন্যাটোর সদস্য হতে পারবো।

ড্যানিয়েলের উত্তর– ইউএসএ মনে করে এখনই নয়। যদিও এটা ন্যাটোর নিজস্ব ব্যাপার।

শুনে আমার পূর্ব ইউরোপিয়ান সাংবাদিক বন্ধুরা বেশ নিরুৎসাহিত বোধ করলো। আমি ভাবতে লাগলাম, কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমেরিকা। সেই ইউরোপের কতোগুলো দেশ ন্যাটোর সদস্য হতে পারবে কি পারবে না– এতো দূরে বসে ইউএসএ তা নিয়ে সুতো নাড়ছে। হায় আল্লা, দুনিয়াটার তুমি একি করলা।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু আমার এই আফসোস রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, কিরগিজস্তান, পোল্যাণ্ডের সাংবাদিকদের মধ্যে কোনো দুঃখ নেই। এদের প্রত্যেককে আমি আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমাদের দুঃখ হয় না সমাজতন্ত্রের পতনে। এরা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলেছে, হয় না। কারণ আগে আমরা খারাপ ছিলাম, এখন অনেক ভালো আছি।

যার জন্য করলাম চুরি সেই যদি বলে চোর, তাহলে আর আমি চোর সাজতে যাই কেন। বরং আকাশের দিকে (এবং হোয়াইট হাউসের দিকে) তাকিয়ে বলি, *এই করেছো ভালো, নিঠুর হে*।

www.nagorikpathagar.com

২০ কোটি টাকা টেলিফোন বিল!

ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা অফিসটা যে ভবনে, তার একতলা দোতলা পেরুনো এক মজার অভিজ্ঞতা। বড় বড় এসকেলেটর, সুদৃশ্য ফোয়ারা মিলিয়ে এলাহি কাণ্ড। সে সবের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে, এমন দৃশ্য আমি কত্তো দেখেছি এমনি ভাব দেখিয়ে, *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগে ঢুকে পড়লাম! প্রথমে দ্রুতগতিতে পুরো পত্রিকা অফিসটা একবার দেখা।

ওয়াশিংটন পোস্ট আমেরিকার অন্যতম বড় পত্রিকা। প্রচার সংখ্যা ৮ লাখ ৫৫ হাজার। রোববারে এর প্রচার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লাখ ৭০ হাজারের মতো। আমেরিকানরা পরিসংখ্যান প্রিয় জাতি। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা সম্পর্কে পরিসংখ্যান জোগাড় করা তাই খুবই সোজা বিষয়। সেই অতি সহজে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে কিছু কিছু জিনিস আমি আপনাদের পাতে তুলে দিতে পারি। এ পত্রিকায় মোট কাজ করে ২ হাজার ৮শ ৬৯ জন লোক। এর মধ্যে বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগে ৬২২ জন, সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন, হিসাব বিভাগে ১ হাজার ২০ জন আর কম্পোজ, প্রেস রুম, মেইল রুম ইত্যাদি কারিগরি কাজ করে ১ হাজার ২শ ২৭ জন। এ থেকে বুঝতে পারছেন সাংবাদিকদের চেয়ে ওই পত্রিকায় বাণিজ্যিক কর্মী বেশি। ওদের সংবাদপত্রের তিন ভাগের দুই ভাগে বিজ্ঞাপন। লাভজনক সংবাদপত্র মানে ওদেশে সোনার খনি। কিন্তু ওই স্বর্ণখনিতে বিনিয়োগের পরিমাণও আকাশ ছোঁয়া। আমরা নর্থওয়েস্ট রোডের যে ভবনটিতে গেছি, সেখানে ওদের দুটো প্রেস আছে। তার দাম ২০ কোটি টাকা। এ রকম ১৩টি প্রেসে রোজ এ পত্রিকা ছাপা হয়। প্রতি ঘণ্টায় একটা প্রেসে ৬৫ হাজার কপি পর্যন্ত ছাপা চলে। প্রতিটা কপিতে ১৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত থাকতে পারে। রোজ তিনটি সংস্করণ বেরোয় এ কাগজের। রাত সাড়ে ১০টা, সাড়ে ১২টা ও আড়াইটা– তিন দফায় ছাপার কাজ চলে।

রোববারের *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ পাতা থাকে গড়ে ৫২০টা। তবে ১,১৮৬ পাতার একটা সংখ্যা বেরিয়েছিল একবার। পুরো পত্রিকা অফিস কম্পিউটার সজ্জিত। এমনকি লিফটগুলো পর্যন্ত কম্পিউটার চালিত। ওদের অফিসে টেলিফোন

www.nagorikpathagar.com

লাইন আছে ১৬০০, এর বিল আসে প্রতি বছর ২০ কোটি টাকা। ২০ কোটি টাকা শুধু টেলিফোন বিল! শুনে চোখ চড়ক গাছ! যদিও জীবনে চড়ক বৃক্ষটিকে দেখিনি। ওরা অয়ার সার্ভিস (এপি, রয়টার ইত্যাদি) নেয় ১৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সালে। এদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি উদ্‌ঘাটন।

ঘুরে ঘুরে সম্পাদকীয় দফতর দেখলাম। প্রতিটি ডেস্কে একটা করে পারসোনাল কম্পিউটার। সবচেয়ে মজা পেলাম পেস্টিং রুমে গিয়ে। কাগজের প্রথম পাতা এখনো কাঁচি দিয়ে কেটে হাত দিয়ে পেস্টিং হয়। তাহলে আর আমাদের সঙ্গে ওদের পার্থক্য থাকলো কি?

অক্টোবরের ৪ তারিখ। দুপুর ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ট্যুর হলো। তার আগে আমরা বৈঠক সেরেছি পোস্টের ম্যানেজিং এডিটর রবার্ট কায়সারের সঙ্গে। ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে বিদায় নেবার সময়টা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো। কারণ ওরা হাতে ধরিয়ে দিল একটি করে প্যাকেট। প্যাকেটের মধ্যে নানা ছোটখাটো উপহারের সঙ্গে একটা করে টি শার্ট।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাহেবের দুটো কথা এখনো মনে আছে।

এক. 'আমরা একজন সাংবাদিককে প্রতি বছর ৭০ হাজার ডলারের মতো বেতন দিই। এটা আমেরিকার একজন বড় লোকের গড় বার্ষিক আয়ের সমান।' এর মানে ওদের বড় পত্রিকার সাংবাদিকেরা ওদের সমাজে মোটামুটি বড় লোক।

হায়! আমাদের দেশের সংবাদপত্র মালিকেরা নিউজপ্রিন্ট কেনার টাকা দিতে পারেন, ছাপাখানা বসানোর টাকা দিতে পারেন, কেবল সাংবাদিকেরা বেতন চাইলেই তাদের অনেকের কলজেতে পানি থাকে না। লেখালেখি করে, এ জন্য আবার বেতন চাওয়া কেন? চা-সিঙ্গারা খেয়েই তো লিখে দিতে পারে।

দুই. সংবাদ ছাপা হলে বিজ্ঞাপনদাতা ব্যাজার হতে পারে, এ ভয়ে কোনো সংবাদ ছাপা থেকে তারা বিরত থাকেন। বিজ্ঞাপনদাতারা রুষ্ট হয়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে, এ উদাহরণ তাদের আছে। আবার আপত্তিকর, অশ্লীল, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন তারা হরহামেশাই ফিরিয়ে দেয়।

দুপুর বেলা আমাদের লাঞ্চ করালেন আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউজ পেপার এডিটরসের নির্বাহী পরিচালক লী স্টিনেট আর প্রকল্প পরিচালক ডায়ান বর্ডেন। খাওয়ালেন একটা দামী রেস্তরাঁয়। অবশ্যই ধূমপানমুক্ত রেস্তরাঁ। থ্রি কোর্স খাওয়া। তিন জোড়া ছুরি চামচ দেখে বুঝে নিলাম। অমেরিকায় যাওয়ার আগে বেশ শরমিন্দা ছিলাম– টেবিল ম্যানারস জানি না বলে। ডান হাতে ছুরি আর বাম হাতে চামচ ধরে কিভাবে খেতে হয়, খাওয়া শেষ হলে ছুরি চামচ কিভাবে রাখতে হয়– সে সব শেখাতে অনেকেই বেশ কোচিং ক্লাস নিচ্ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে এই বিষয়ে মুক্তির আস্বাদ পেলাম। আহ্। ওরা এ সব নিয়ে মোটেই খুতখুত করে না। হাত

www.nagorikpathagar.com

দিয়ে তুলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খায়, হাতে ধরে কামড়ে বার্গার খায়, চামচ ধরার বেলায় ডানহাতী বাঁ-হাতী হবার ব্যাপারে তারা পুরো স্বাধীন। মুরগির রান খাবার সময় হাড্ডিটা হাতে ধরে মাংসটা মুখে চালান করে দিতেও তারা সঙ্কুচিত নয়।

ইউএসএ টুডে পত্রিকা দফতরে

এ দিন সন্ধ্যায়ই আমাদের সফর *ইউএসএ টুডে* পত্রিকায়। *ইউএসএ টুডে* ভবনটা দেখার মতো। নদীর ধারে এই বিল্ডিংটা সম্ভবত বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি শহরের সবচেয়ে সুন্দর আকাশচুম্বী ভবন। প্রথমে আমরা বৈঠকে বসলাম ওদের আন্তর্জাতিক সম্পাদক জন সিম্পসনের সঙ্গে। এই পত্রিকাটি চলে ১০ লাখেরও বেশি। জন সিম্পসন বললেন, সংবাদপত্রে আমাদের কোনো প্রতিযোগী নেই। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা নিজে ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। আমি বিস্মিত হলাম। পাশেই ওয়াশিংটন পোস্ট চলে সাড়ে আট লাখ। প্রতিদ্বন্দ্বী নেই মানে? আমার প্রশ্ন শুনে জন বললেন, না না, *ওয়াশিংটন পোস্ট* তো আঞ্চলিক পত্রিকা, আর আমরা তো হলাম জাতীয়। এইবার খোলাসা হলো। আমেরিকার বেশির ভাগ পত্রিকাই আঞ্চলিক চরিত্রের। *ওয়াশিংটন পোস্ট* ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক, *নিউ ইয়র্ক টাইমস* নিউ ইয়র্কার। যেমন আমাদের পূর্বকোণ বা আজাদী চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। একমাত্র *ইউএসএ টুডে* সমস্ত আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের কাছে পৌঁছবার লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ১২ বছর আগে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু। পত্রিকাটির আন্তর্জাতিক সংস্করণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সুলভ।

ইউএসএ টুডে পত্রিকাটি সম্পূর্ণ রঙিন। বড় বড় রঙিন ছবি তারা ছাপে। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* কিংবা *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ কিন্তু কোনো রঙিন ছবি ছাপা হয় না। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* পারলে কোনো আলোকচিত্রই ছাপে না।

রাতের বেলার খাবারটা খাওয়ালো *ইউএসএ টুডে*। ফর্মাল ডিনার পার্টি। কে কোন টেবিলে বসবে, নাম লেখা। আমার এক পাশে বসেছে ওদের রিপোর্টার লিন্ডা, অন্য পাশে বলিভিয়া থেকে ইন্টার্নি করতে আসা রিভেরা। রিভেরা নামটা শুনেই আমার মনে পড়লো চিলির কবি রবার্টো রিভেয়া রিয়েজ-এর কথা। এই হিস্পানিক কবির কবিতা আমি বেশ কিছু অনুবাদ করেছিলাম। হাবিব ওয়াহিদ সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন *অনিন্দ্য*'য় সেগুলো ছাপাও হয়েছিল। চারটা লাইন এখনো মনে আছে :

যদি তোমায় বাসতে ভালো আমায় মরে যেতেই হবে
তবে তোমায় ফিরিয়ে দেবো তোমার শুভ্র লিলির তোড়া
এবং তোমার চ্যালেঞ্জ তোমায় দেই ফিরিয়ে;
তোমায় ভালোবাসতে আমি রইবো বেঁচে।

www.nagorikpathagar.com

অন্যদিকে বলিভিয়া নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল চে গুয়েভারাকে। এই বিপ্লবী বলিভিয়ার পাহাড়ি জঙ্গলে বহুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। পরে বলিভিয়ার সামরিক জান্তা তাকে হত্যা করে। রিভেরার সঙ্গে এসব নিয়ে গল্প করতে চেষ্টা করলাম, খুব বেশি এগুলো না। রিভেরা এদের নামটা শুনেছে মাত্র।

লিন্ডা বললো, তোমাদের বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক আমাদের এখানে ট্রেনিঙে আছেন, তুমি জানো

আমি বললাম, কে? মাসুদ। *ডেইলি স্টার*-এর মাসুদ একটা ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকায় যাচ্ছে, এই খবর আমি *ডেইলি স্টার* পত্রিকাতেই দেখেছিলাম। লিন্ডা নাম বলতে পারলো না। তবে এটুকু বললো, সে দুটো তলা নিচে কাজ করছে। আমি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি।

আমি বললাম, চলো যাই।

মাত্র দুটো তলা নিচে। লিন্ডা কিন্তু আমার সঙ্গে লিফটে উঠলো না। সে বেছে নিলো সিঁড়ি। তার আগে বিনয়বশত সে জিজ্ঞাসা করলো, উড ইউ মাইন্ড স্টেয়ারস। সিঁড়ি দিয়ে নামতে হলে তুমি কি কিছু মনে করবে?

আমি বললাম, না, কিছু মনে করবো না। মনে করার কি আছে। আমার কি কোনো অসদুদ্দেশ্য আছে?

মনে করিনি বটে, কিন্তু সদ্যপরিচিত কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো একাকী তরুণীর যে লিফটে উঠতে নেই– সেই শিক্ষাটা আমি পেয়ে গেলাম। আমার পাঠিকারা কথাটা মনে রাখতে পারেন। আর হ্যাঁ, লিফটকে মার্কিনীরা বলে এলিভেটর।

নিউজ রুমে গিয়ে দেখি একজন বাঙালি পিসির সামনে বসে আছে। বুঝলাম, ইনিই সেই। তাকে আমি এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। কিন্তু তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন। বলে উঠলেন, আনিস ভাই, আপনি।

সেই প্রবাসে একজন বাঙালিকে এতো আপন মনে হলো যে, আমি অবলীলায় তাকে তুমি করে বললাম, কেমন আছো মাসুদ।

ক্যাপিটাল হিলে

অক্টোবরের ৫ তারিখটা কেটে গেল বিশ্বব্যাংকের এ ভবনে ও ভবনে। বিশ্বব্যাংকের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হচ্ছে এখানে। নানা সভা সেমিনার, গ্রুপ আলোচনা। অক্টোবরের ৬ তারিখ সকালে আমরা রওয়ানা হলাম ক্যাপিটাল হিলের দিকে। সিনেট ভবনে আমাদের দায়িত্ব নিলেন সিনেট রেডিও-টিভি গ্যালারির সুপার ল্যারি জেনজিক। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন রেডিও-টিভি গ্যালারিতে। বয়স্ক মানুষ।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের প্রত্যেককে একটা শাদা কাগজ দিয়ে বললেন, এই শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিকের নাম লেখো, পৃথিবীকে বদলে দিতে যার অবদান খুব বেশি। ১২ জন ১২টি নাম লিখলো।

ল্যারি বললেন, এই শতাব্দীতে পৃথিবীকে বদলে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক নেতাটি, তার নাম গান্ধী।

গান্ধী?

হ্যাঁ। এই শতকের শুরুতে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতে ফেরেন। তিনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের সূচনা করেন। তার এই অহিংস আন্দোলনের আইডিয়া নিয়ে মার্টিন লুথার কিং আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেন। কাজেই, মার্কিন সিনেট ভবনের রেডিও-টিভি গ্যালারির তত্ত্বাবধায়ক ল্যারির মতে, পৃথিবীতে এই শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিকের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

সিনেট ভবন ঘুরে ঘুরে দেখা হলো। এখানেও সেই এক চিত্র- ভবনের বিভিন্ন অংশ জনগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত। একজন দুজন সিনেটরও উঁকি দিলেন আমাদের দলের দিকে। আমেরিকার ইতিহাসের তৈলচিত্র দেয়াল জুড়ে টাঙানো। দুটো বড় বড় হল রুমে সাবেক প্রেসিডেন্টদের প্রমাণ সাইজ ভাস্কর্য। মূর্তিগুলো এক ঘরে রাখা হয়নি, এসব ইস্পাতের ভাস্কর্যের ভারে ইমারত ভেঙ্গে পড়বে এ আশঙ্কায়।

সিনেট ভবনে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থার জন্য ছোট ছোট রুম বরাদ্দ। সেই রুমে কম্পিউটার, টেলিফোন সবকিছু আছে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিধিমালা ও ফ্লোর-প্রসিডিং দিয়ে সাহায্য করার দায়িত্ব রেডিও-টিভি গ্যালারির। কেউ যদি সিনেটরদের সাক্ষাৎকার নিতে চায় সে জন্য স্টুডিও সুবিধাও দেয়া হয়।

গরিব আমেরিকানদের মধ্যে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গরিব আছে। তবে কোনো শ্বেতাঙ্গ দরিদ্র আছে কিনা, আমি জানি না। আমি কোনো শাদাকে ভিক্ষা করতে দেখিনি আমেরিকায় (অবশ্য লণ্ডনের রাজপথে শ্বেতাঙ্গ ভিক্ষুক দেখেছি। এমনকি কোনো শ্বেতাঙ্গকে গায়ে খাটার কাজ করতেও আমি দেখিনি। হোটেলে বাথরুম পরিষ্কার করতে যারা আসে, তারা হয় কৃষ্ণাঙ্গ, নয়তো হিস্পানিক, নয়তো এশিয়ান। শাদারা এ ধরনের কাজ করছে, এমন দৃশ্য আমি কেবল কল্পনা করতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। ওয়াশিংটন ডিসির বিভিন্ন দোকানের সামনে কালো মানুষেরা ভিক্ষা করছে- এ এক সাধারণ দৃশ্য।

www.nagorikpathagar.com

আমেরিকার ভালো ভালো স্থান ও জিনিসগুলো বেছে বেছে দেখিয়ে আমাদেরকে খণ্ডিত ধারণা দেয়া হয়েছে– এ ধরনের অভিযোগ যেন না ওঠে সে জন্য এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো এক গরিবখানায়। এখানে গৃহহীনদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। একটা পুরনো চারতলা ভবন। ১৩৫০ শয্যাবিশিষ্ট। এটির মালিকানা আমেরিকার ফেডারেল সরকারের। প্রতিষ্ঠানের নাম কমিউনিটি ফর ক্রিয়েটিভ নন ভায়োলেন্স। দৈনিক ২৮০০ লোককে এখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা দেয়া হয়। অনেক মেয়ে বাচ্চাসহ থাকে। এক পাশে পুরুষ, অন্য পাশে নারীদের ডেরা। আমরা প্রথমে গেলাম পুরুষদের এলাকায়। আমাদের সঙ্গে যেহেতু মেয়ে আছে, সেজন্য মাইকে ঘোষণা দেয়া হলো– উমেন অন দি ফ্লোর। আমরা ছোট ছোট ঘরে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখলাম। সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। কেউ কেউ বুড়ো। ডাইনিং রুমে টিভি আছে, কফি বানানোর মেশিন আছে। তবে সর্বত্রই একটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। খাটগুলো দোতলা।

পুরুষদের এলাকা থেকে আমরা ঢুকলাম মহিলা চত্বরে। এবার মাইকে ঘোষণা– মেন অন দি ফ্লোর। মহিলাদের এলাকায় গিয়েই প্রথমে যা মনে হলো– নারীরা পুরুষদের চেয়ে সব সময়েই বেশি পরিষ্কার। যারা বাচ্চা নিয়ে থাকে, তাদের রুম খেলনায় ভর্তি।

ফেডারেল সরকারের এ ধরনের দাতব্য কর্মসূচির বিরুদ্ধেই রিপাবলিকানদের বাজেট সংকোচন নীতি। ডেমক্রেটরা সংখ্যালঘুদের সমর্থনপুষ্ট কেন– বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা কেন সাধারণত গরিব হয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি নানাভাবে খোঁজার চেষ্টা করেছি। যে উত্তর আমি পেয়েছি, তাতে ঐতিহাসিক কারণের পাশাপাশি আর একটা দিকে তর্জনি উঠে আসে– পারিবারিক বন্ধনের অভাব। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে পুরুষেরা সন্তানের জন্ম দিয়েই কেটে পড়ে, বিয়ে হয় কি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীর কোলে তিনটা বাচ্চা, তিনটার বাবা তিনজন। স্বভাবতই এই শিশুরা বড় হয় অযত্নে, অবহেলায়, এরা লেখাপড়া করতে চায় না। বড় হয়ে কাজও করতে চায় না, সহজেই ঢুকে পড়ে মাদক ও অপরাধের জগতে।

প্রবাসী বাঙালিদের কেউ কেউ বলেন, দেখো, আমাদের গ্রীনকার্ড নেই, ওয়ার্ক পারমিট নেই, তবু আমরা কাজ করে খাচ্ছি, দেশে টাকা পাঠাচ্ছি। আর কালোরা ভিক্ষা করে কেন? ওরা তো আমেরিকান। ওদের কতো সুবিধা। আসলে ওরা ভিক্ষা করাটাই উপভোগ করে। ওদের স্বভাব খারাপ।

ওয়াশিংটন ডিসিতে আমাদের হোটেলের সামনের রাস্তায় আমি একজন মাত্র পাগল দেখেছিলাম। কৃষ্ণাঙ্গ। হাতে একটা মার্কিন পতাকা। রাস্তার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটি আমার কাছে খুবই তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল। বিশেষ করে তার হাতের ওই পতাকাটার জন্য।

www.nagorikpathagar.com

রাতের ডিসি

৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ফ্রিডম ফোরাম ওয়ার্ল্ড সেন্টারে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে এক ককটেল পার্টি। নানা দেশের রাষ্ট্রদূতরাও তাতে উপস্থিত। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রদূত অবশ্য তাতে হাজির হননি। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পার্টি ফুরিয়ে গেলো। ইন্দোনেশিয়ার ধিনামের এক বন্ধু থাকে ওয়াশিংটন ডিসিতে। সে তার গাড়িতে করে হোটেলে পৌঁছে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, রাতের ডিসি দেখতে যাবে?

সাগ্রহে বললাম, হ্যাঁ।

সে বললো, চলো তোমাদের নিয়ে যাবো।

আমি বললাম, টাকা-পয়সা খরচ করতে পারবো না কিন্তু।

না, না, টাকা পয়সা আর কি! নাচতে নাচতে মেয়েরা যখন কাছে আসবে তখন এক ডলার দু'ডলার দিতে হবে।

মহা উৎসাহে হোটেলের লবিতে জমায়েত হলাম। অন্য ১১ দেশের সাংবাদিকও এলো। পরদিন শনিবার। কোনো প্রোগ্রাম নেই। আজকের সন্ধ্যাটা সবাই উদ্‌যাপন করতে চায়।

ধিমানের বন্ধুটি বললো, চলো, সবাই যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই যাই। মার্কিন তরুণী স্কাটের নেতৃত্বে আমরা একটা নাইট ক্লাবে গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে আমি নিতান্তই হতাশ।

উচ্চগ্রামে ক্যাসেট বাজছে। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা সব টেবিলের চারদিকে ভিড় করে বসে আছে। টি শার্ট পরা রূপসী তরুণীরা খদ্দেরদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে কুলোতে পারছে না। হৈ চৈ। নাচতে নাচতে কেউ কাছেও আসছে না, কাউকে ডলারও দিতে হচ্ছে না। এতে মজা পাবার কি আছে? রাত ১১টা বেজে গেলো। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি বললাম, তোমরা মজা করো, আমি রুমে ফিরবো।

আমার সঙ্গে ফেরার জন্য আরো তিনজনকে পাওয়া গেলো। স্কাট হিসেব করে বললো, কার কতো বিল হয়েছে। বখশিসসহ যার যার বিল স্কাটের হাতে তুলে দিলাম। এর নামই আমেরিকান স্টাইল। খাবে এক সঙ্গে, কিন্তু যার যার বিল সেই দেবে।

তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম। ভগ্নমনোরথে ফিরে আসা। রথ জিনিসটা কখনো চোখে দেখিনি। তবে মনের রথ ভেঙে গেলে তাতে চড়ে আসার অভিজ্ঞতাটা কেমন– আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারেন।

মহাশূন্য জাদুঘরে

৭ অক্টোবর শনিবার। সারাদিন কোনো কাজ নেই। দুপুরে ভয়েস অফ আমেরিকায় গিয়ে সাক্ষাৎকার দিয়ে ফেলেছি। জিয়াউর রহমান বললেন, এখান থেকে বেরুলেই স্পেস মিউজিয়াম, দেখে যান।

www.nagorikpathagar.com

গেলাম মহাশূন্য জাদুঘরে। প্রথমেই রাইট ব্রাদার্সের সেই আদি বিমান। অনেক বড়। হা করে তাকিয়ে দেখলাম। এপোলো ১১-এর যে অংশটিতে চড়ে প্রথম চাঁদে নেমেছিলেন নিল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন– সেটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিশাল জাদুঘর। বহু মহাকাশযান সশরীরে খাড়া করে রাখা। সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে সরাসরি সে সবের ভেতরে ঢুকে দেখে আসার ব্যবস্থাও আছে। লম্বা লাইন, হাজার হাজার দর্শক। নারী-পুরুষ-শিশু। শাড়ি পরা ভারতীয়রাও আছেন। চাঁদে নামার দৃশ্য, যা টিভিতে সরাসরি দেখানো হয়েছিল, তা এখন ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ানদের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই জাদুঘরে সেটার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে অকপটে। ছোট ছোট ভিডিও গেম আছে, শিশুরা সেটাতে রকেট– টকেটের নকশা আঁকতে পারে।

একা একা ভবঘুরের মতো খানিক ঘুরে বেরিয়ে এলাম। শনিবার। রাস্তায় ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে ফেরিঅলারা গেঞ্জি-টুপি-টাই বিক্রি করছে। এই দোকানগুলো চাকাঅলা। আমাদের চটপটির দোকানের মতো।

মেট্রোয় চড়ে ফিরলাম হোটেলে। পরদিন ডিসি ছেড়ে যাবো কলার‍্যাডো স্প্রিংসে। বাঁধা ছাঁদা করতে হবে। ৬ সপ্তাহের কর্মসূচির কেবল ১ সপ্তাহ গেলো। সামনে আরো ৫ সপ্তাহ। চিন্তা করতেই রক্ত জমে যাবার যোগাড়।

আরো ৫ সপ্তাহ এই পাণ্ডববর্জিত দেশে একা একা থাকতে হবে। দাঁত বের করে 'থ্যাংক ইউ,' 'থ্যাংক ইউ' বলতে হবে।

প্রভু, আমি বড় একা। এলি এলি লামা সবক্তানি।

www.nagorikpathagar.com

কলারাড়াডো স্প্রিংস : ছবির মতো শহরে

কলারাড়াডো স্প্রিংস একটা ছোট্ট শহর। কলারাড়াডো স্টেটের শহর। কলারাড়াডোর রাজধানীর নাম ডেনভার। ডেনভারের নাম অনেকেরই জানার কথা, যারা টিভিতে *ডাইনাস্টি* দেখেন। *ডাইনাস্টির* ডাইনাস্টির নাম ডেনভার ক্যারিংটন।

কলারাড়াডোর নাম আমি প্রথম পাই কবিতায়। অ্যালেন গিন্সবার্গের বিখ্যাত কবিতা *হাউল*-এ। গিন্সবার্গ *হাউল* কবিতাটি শুরু করেছেন এভাবে– 'আমি দেখেছি আমার প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মনীষারা ধ্বংস হয়ে গেছে পাগলামিতে।' গিন্সবার্গ তার বিনষ্ট প্রজন্মের সদস্যদের আর যা যা করতে দেখেছেন, তার তালিকাটা দীর্ঘ, সেই দীর্ঘ তালিকায় একটা জায়গায় বলা হয়েছে– এইসব যুবক অপহৃত গাড়িতে করে কলারাড়াডো গেছে পতিতাগমনে।

তা হলে কলারাড়াডোর খ্যাতি পতিতার জন্যে?

তা নয়। কলারাড়াডোর খ্যাতি অত্যন্ত সুন্দর জায়গা বলে। আমেরিকানরা বেশি সুন্দর বলার জন্যে বিউটিফুল বিশেষণটি বাক্যে বসায় দু'বার। 'কলারাড়াডো স্প্রিংস? ইটস এ বিউটিফুল বিউটিফুল প্লেস'-এই কথা যে আমেরিকায় আমাকে কতোবার শুনতে হয়েছে!

ওয়াশিংটন ডিসিতে এ প্রসঙ্গে কথা হয়েছিল আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউজ পেপার এডিটরসের প্রকল্প পরিচালিকা ডায়ানের সঙ্গে। ডায়ান ছোটখাটো নম্র মায়াবী মহিলা। বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশ। আমার সঙ্গে এক ধরনের খাতির হয়েছিল তার। ডায়ান বললেন, আনিস, তুমি কলারাড়াডো স্প্রিংস যাচ্ছো? খুব সুন্দর জায়গা। তার চোখ ছলছল করে উঠলো। বললেন, আনিস, কলারাড়াডো আমার জন্মস্থান। আমার ছেলেবেলা কেটেছে কলারাড়াডোয়।

আমি মুহূর্তে তিনটি চরিত্রের বেদনা ডায়ানের চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম। মনে হলো, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা তার মেয়ের ছবি বের করে তাকিয়ে আছেন। মুজতবা আলীর আবদুর রহমান পানশিরের নাম করে বলছেন, 'ইনহাস্ত ওয়াতানাম, এই তো আমার জন্মভূমি।' আর শরৎবাবুর শ্রীকান্তের সামনে

www.nagorikpathagar.com

সেই বাঙালি তরুণীটি কাঁদছে, যার বিয়ে হয়েছে হিন্দুস্তানে, খোট্টাদের দেশে– বাপের বাড়ির খবর না পেয়ে যে মৃতপ্রায়।

মানুষের কতোগুলো আবেগ আছে, যেগুলো জাতনিরপেক্ষ, কি বাঙালি, কি কাবুলি, কি পাঠান, কি আমেরিকান– সবারই অন্তর নীরবে দগ্ধ হয় জন্মস্থানের জন্য।

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে কলার‍্যাডো স্প্রিংসে পৌঁছলাম বিমানে। পথে প্লেন বদলাতে হলো একবার। ছোট্ট বিমানবন্দর, আমাকে নিতে এয়ারপোর্ট এসেছেন ওয়াইন হেলম্যান। ইনি *গেজেট টেলিগ্রাফ* পত্রিকার বাণিজ্য-প্রতিবেদক। হেলম্যানের গাড়িতে ওঠা গেলো। ইনি কথা বলছেন অবিরাম। ভদ্রলোকের জন্মস্থান ক্যালিফোর্নিয়া। ক্যালিফোর্নিয়ার ইংরেজি ঢেউ খেলানো সুর তোলা। সেই বিশেষ সুরে বলা ইংরেজির অবিশ্রান্ত বর্ষণের বহু কিছু আমার কানে ঢুকলো না।

আমি তাকিয়ে রয়েছি গাড়ির জানালা দিয়ে। শহরকেন্দ্র থেকে এয়ারপোর্ট মাইল বিশেক দূরে। এই বিশ মাইল পথের দুধারে বিরাণ প্রান্তর। দূরে দিগন্তজোড়া পাহাড়। পাহাড়ের পাশে সমতলভূমি। মাঠের পর মাঠ পড়ে আছে– অব্যবহৃত, ক্ষেতখামার নেই, জনবসতি নেই– স্রেফ পতিত ভূমি। মানুষ কম, জমি বেশি, সম্পদ বেশি– এর নাম আমেরিকা।

প্রথম দর্শনেই কলার‍্যাডো স্প্রিংস আমাকে মোহিত করলো। সমুদ্রতল থেকে ৭ হাজার ফুট উঁচুতে এই পাহাড়ি শহর। চোখ তুললেই পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়ি। টাউন হোম। একতলা দোতলার চেয়ে উঁচু বাড়ি নেই। প্রধানত কাঠের তৈরি। ভেতরে একেকটি ঘর একেক উচ্চতায়। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে নেমে এ ঘর ওঘর করতে হয়। ওয়াইন হেলম্যান তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পাশেই এক ভারতীয় দম্পতির বাড়ি। সেই বাড়িতেও গেলাম। সেখানে খানিকক্ষণ থেকে হেলম্যান আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমার মোটেলে। দি ইকোনোমি মোটেল। এখানে একটা ঘরে আমাকে ৪টা সপ্তাহ থাকতে হবে। আর *গেজেট টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় সংযুক্ত থেকে শিখতে হবে আমেরিকান পত্রিকার অন্ধিসন্ধি।

মোটেলটা নেভাডা এভিনিউতে। এটা পর্যটকদের এলাকা। রাস্তার দুধারে শুধু মোটেল আর মোটেল। এই মোটেলের কর্মচারীরা ভারতীয়– গুজরাটী। মোটেলের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝরনা। ঝরনার ওপরে সাঁকো। সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে শোনা যায় শুধু পানির শব্দ– সাঁই সাঁই করে খুবই দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে জলধারা। নির্জন পথ। এই শহরটি ছোট। সব মিলিয়ে দশ লাখ লোকের বাস। লোকজন হাঁটে না। যানজট নেই বলে গাড়িগুলো ছুটে চলে ভীষণ বেগে। প্রায় সবারই গাড়ি আছে। সবাই চলাচল করে গাড়িতে। একমাত্র আমি হাঁটি।

www.nagorikpathagar.com

মোটেল থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে যাই রেস্তরাঁয়– প্রতিদিন সন্ধ্যায়। রাত ৮টার পর সব হোটেল-রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে যায়, মোটেলের ঘরে হিটার আছে, তাই শীত লাগে না। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। দুই তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে হেঁটে হেঁটে একা আমি যাই রাতের খাবার খেতে। প্রথম রাতে খেলাম একটা বার্গার শপে। দ্বিতীয় রাতে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম প্রায় আধ মাইল দূরে, ম্যাকডোনাল্ডস-এ। এই দোকানে সস্তায় বার্গার, স্যাণ্ডউইচ, ফ্রেঞ্চফ্রাই পাওয়া যায়। দোকানে কাউন্টার তিনটা। তিনটায় তিনজন দাঁড়িয়ে সেলসগার্লের দায়িত্ব পালন করছে।

আমি এগিয়ে যেতেই একটি মেয়ে বললো, ক্যান আই হেলপ ইউ।

আমি তার কাউন্টারে গেলাম। সে বললো, তুমি কি ভারত থেকে এসেছো?

আমি বললাম, না। তার টিশার্টে নামফলক ঝোলানো। পিংকি। নাম দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেলো। আমি বললাম, আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া?

এরপর সে আমাকে প্রশ্ন করে, পাল্টা আমি প্রশ্ন করি। কেউ আগে দেশের নাম বলে না। আমি তাকে বললাম, দেখো, তোমার নাম বলছে তুমি ভারতীয়।

পিংকি বললো, না, আমার দেশ পাকিস্তান।

আমি বললাম, আমার দেশ বাংলাদেশ।

আমি মেয়েটিকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। একটু স্বাস্থ্য ভালো, পৃথুলা বলা যায় তাকে, মোটা না বলে। ফর্শা মুখে অল্প বয়সের লাবণ্য। দুটো তিনটে আপেলরঙা ব্রণ মুখটাকে দূরবর্তী না করে বরং নিকটবর্তী ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তার গায়ে বেগুনি-গোলাপির মতো টিশার্ট, কালো ট্রাউজারের সঙ্গে ইন করে পরা।

খাবার প্যাকেট নিয়ে আমি দোকান ছেড়ে পথে নামলাম। অনেকটা পথ হেঁটে আবার আমাকে ফিরতে হবে অনাত্মীয় মোটেলে।

কিছু দূর যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে নারীকণ্ঠের ডাক, হ্যালো, এক্সকিউজ মি। আমি চমকে তাকালাম পেছন দিকে। পিংকি। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। আমি ফিরে গেলাম তার কাছে।

সে বললো, ইউ হ্যাভ ফরগটেন ইয়োর কী। তুমি তোমার চাবি ভুলে ফেলে এসেছো।

কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেলো। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি চাবিটা নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলাম। আমার পিঠের মধ্যে, মনে হচ্ছে, পিংকির চোখ আছড়ে পড়ছে।

পরদিন আবার আমি গেলাম সেই দোকানে। পিংকিকে কোথাও দেখলাম না। পরদিন আবার। আজ পিংকি কাউন্টারে দাঁড়ায়নি। ভেতরে কাজ করছে। মেঝেতে বসে মেঝে মুছছে, র‍্যাক মুছছে। এমন একটা টকটকে তরুণীকে এ ধরনের কাজ করতে দেখে খারাপ লাগলো। একটা টেবিলে বসে একা একা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে

www.nagorikpathagar.com

লাগলাম। দূর থেকে আমাকে দেখে পিংকি হাসলো। সেই হাসির অর্থ কি ভাবতে ভাবতে আমি আবার ঘরে ফিরলাম।

এইভাবে তিন-চার সন্ধ্যা। তারপর আবার একদিন পিংকিকে পেলাম কাউন্টারে। যথারীতি খাবারের অর্ডার দিলাম, মিটিয়ে দিলাম বিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কেন এসেছি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে এখানে মরতে এসেছে কেন? পিংকি জানালো, সে এখানে পড়াশোনা করতে এসেছে।

দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বেশি কথা বলা যায় না। পেছনে অন্য খদ্দের লাইনে দাঁড়িয়ে। আমেরিকা হচ্ছে লাইনের জায়গা– দোকানে লাইন, এয়ারপোর্টে লাইন, হোয়াইট হাউসে লাইন।

ভাবলাম, আজ আর আলাপ বেশি দূর এগুবে না। কাল সন্ধ্যায় আবার আসবো।

পরদিন শনিবার। *গেজেট টেলিগ্রাফ* অফিস সাধারণভাবে বন্ধ। সারাদিন কি করবো? প্রথম দিন আমাকে ঘোরানোর দায়িত্ব নিল টেলিগ্রাফের সম্পাদকীয় লেখক ড্যান। দুপুরে ড্যান আমাকে নিয়ে গেলো আমার মোটেলের পাশেই এক মেক্সিকান রেস্তরাঁয়। এখানকার খাবার খেয়ে আমি মুগ্ধ। একটা খাবার হুবহু আমাদের দেশের চটপটির মতো। ম্যাকডোনাল্ডসের অখাদ্য বার্গার খাওয়ার বদলে এই চটপটি খাওয়া ভালো– এমনকি পিংকির সঙ্গে গল্প করার চেয়েও এই খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ উত্তম– এ ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত হলাম। তার ওপর এই রেস্তরাঁটা আমার বাসস্থানের একদম কাছে। নির্জন শীতার্ত সন্ধ্যায় ম্যাকডোনাল্ডসে যাওয়াটা বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে? তিন-চার রাত বোকার স্বর্গে ছিলাম, সেখান থেকে নেমে এলাম বুদ্ধিমানের মতো। ফলে পিংকি পর্বের এখানেই ইতি।

পুনশ্চ : পতিতা প্রসঙ্গ

গেজেট টেলিগ্রফ-এ প্রথম দিন রিসিভ করলেন সম্পাদক জন স্টেপলেটন। তিনি পুরো অফিসটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখালেন। বয়স্ক মানুষ। দেখতে অনেকটা লেনিনের মতো, তবে আরেকটু লম্বা এবং চুলদাড়ি কাঁচাপাকা। জনের সঙ্গে পুরো *গেজেট টেলিগ্রাফ* অফিস দেখে আমার ঠাঁই হলো ওদের সম্পাদকীয় বিভাগে। একটা পার্সোনাল কম্পিউটার টার্মিনাল পেলাম ডেস্কসহ। এ বিভাগে কাজ করেন দুজন। একজন ড্যান নিগোমির– সম্পাদকীয় লেখক, অপর জন চক এসি– সম্পাদকীয় কার্টুনিস্ট।

প্রথমে আসি ড্যানের কথায়। ড্যানের বাবা আমেরিকায় এসেছেন যুগোস্লাভিয়া থেকে, ৪০ বছর আগে। তিনি একজন স্লাভ। ড্যানের জন্ম আমেরিকায়। পিতৃভূমি নিয়ে ড্যানের আগ্রহ আছে; তবে সে একজন আমেরিকান হিসেবেই গর্ববোধ করে। ড্যান দেখতে লম্বা, শাদা; ছেলেমানুষের মতো প্রাণচঞ্চল আর ছটফটে।

www.nagorikpathagar.com

আমাকে পেয়েই সে তার সম্পাদককে বললো, আনিসকে আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে নিয়ে নিন, কারণ আমাদের একজন লোকের দরকার। আমার এক কাজিনের নামে গ্রীন কার্ড করা আছে, আনিস সেই নামে কাজ করবে।

সম্পাদক জন বিব্রত হাসি দিয়ে বললেন, আনিস বলেছে সে তার দেশে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির বোধ করছে; এদেশে সে কিছুতেই থাকবে না।

ড্যানের সঙ্গে শনিবার সারাটা দিন কাটালাম। ড্যান বললো, তোমার মোটেলটা যেখানে, সেটা খুব ভালো জায়গা নয়। ওখানে প্রচুর পতিতা। ত্রিশ-চল্লিশ ডলার দিলেই রাত কাটিয়ে যাবে।

দুপুর বেলা রাস্তা দিয়ে একটা স্বল্পবাস মেয়ে যাচ্ছে। ড্যান তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি নিশ্চিত, ওই মেয়েটা একটা গণিকা।

আমি বললাম, সেটা তুমি বুঝলে কি করে?

সে বললো, ওর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সে নিজেকে দেখাতে চাইছে।

কথাটা আমার মনঃপূত হলো না। এই মেয়েটা যতোখানি বের করে রেখেছে, তার চেয়েও বেশি বেশি বের করে রাখা মেয়ে আমি এ দেশে দেখেছি। এদের সবাই কি তাহলে পতিতা? আমি মনে মনে বললাম, জানিয়া শুনিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া ঠকিতে রাজি আছি, তবু না জানিয়া শুনিয়া নারীর কলঙ্কে বিশ্বাস করিয়া জিতিতে রাজি নই। এ ডায়ালগটা শরৎচন্দ্রের। হুবহু মনে নেই। তবে অর্থটা এরকমই। মুখে বললাম, আমি মেয়েটাকে খারাপ না ভাবতে পারলেই খুশি হবো।

ড্যান বললো, শোনো, এখানে একটা মিলিটারি বেইস আছে। কলার‍্যাডো স্প্রিংস হলো এ দেশের বিমানবাহিনী একাডেমির শহর। 'হয়ার দেয়ার ইজ মিলিটারি, দেয়ার মাস্ট বি প্রস্টিটিউশন।' যেখানেই মিলিটারী আছে, সেখানেই পতিতাবৃত্তি থাকতে বাধ্য।

পতিতাগমনে ইউএস আর্মির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সম্প্রতি যখন মার্কিন সেনা কর্তৃক জাপানি মেয়ে ধর্ষণ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, তখন *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে এক বিশাল খবর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর যখন সেখানে ইউএস আর্মি ঢুকে পড়ে, তখন জাপান সরকার এক গোপন সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জাপানি মেয়েদের আহ্বান জানায়– পুরো জাপানি নারী সমাজের সম্মান– সতীত্ব বাঁচাতে যেন কিছু জাপানি মেয়ে এগিয়ে আসে। এরপর সরকারের উদ্যোগে অনেকগুলো পতিতালয় বসানো হয়– যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন সৈন্যদের যৌনক্ষুধা নিবারণ।

ড্যানের সঙ্গে আমি ঘুরলাম মল-এ, মার্কেটে, দোকানে দোকানে। গেলাম বইয়ের দোকানে। এতো বড় বইয়ের দোকান কল্পনাতীত। আমাদের ঢাকা স্টেডিয়ামের মাঠের সমান। ভেতরে অবশ্য ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদিও বিক্রি হচ্ছে। বইয়ের দোকানে খুঁজে পেতে ড্যান নিয়ে এলো একটা ইংলিশ টু বেঙ্গলি

www.nagorikpathagar.com

ডিকশনারি। আমি তাকে বের করে দেখালাম গিন্সবার্গের কবিতার বই থেকে সেই বিখ্যাত কবিতা- *সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড*।

ড্যানের সঙ্গে গেলাম তার বাসায়। ড্যানের বউ গেছে বাপের বাড়িতে। ছেলেপুলে নেই। ফাঁকা বাসা।

ড্যানের দোতলার ব্যালকনিতে একটা ঝুড়িতে কিছু চীনাবাদাম রাখা। আমি একটা বাদাম তুলে নিয়ে খোসা ছাড়াচ্ছি। ড্যান হেসে বললো, এতো কাঠবিড়ালির জন্যে।

বাড়ির পেছনে গাছপালা ভর্তি। আমেরিকায় কাঠ বিড়ালির সংখ্যা আমাদের দেশের কাকের সংখ্যার সমান। কাঠবিড়ালি প্রতিদিন ড্যানের বারান্দায় আসে চীনাবাদাম খেতে। ড্যান বললো, জানো, কোনোদিন আমি যদি বাদাম রাখতে ভুলে যাই, ওরা এসে আমার দরজার কাচে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে।

কার্টুনিস্ট চক এসি

গেজেট টেলিগ্রাফ- অফিসে আমার ডেস্কের বাঁ পাশে বসেন চক এসি। আর্টিস্ট মানুষ। এই পত্রিকায় কার্টুন আঁকেন। তার আঁকা কার্টুন একযোগে আমেরিকার ৬০টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, তিনি খুব বিখ্যাত কার্টুনিস্ট। চক এসির বয়স ৫৫ থেকে ৬০ হবে। মাথায় টাক, মুখে দাড়ি। আর সমস্ত মুখমণ্ডলে ছড়ানো প্রশান্তির হাসি।

দুপুর বেলা লাঞ্চ করার সময় চক আমাকে সঙ্গে নেন। আমরা দুজন*গেজেট টেলিগ্রাফ* অফিসের উল্টো দিকে একটা হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় খেতে যাই। চক খাবার সামনে নিয়ে বলেন, আনিস, আমি কি প্রার্থনা করতে পারি?

আমি বলি, জি পারো।

তিনি তখন বলেন, থ্যাঙ্ক ইউ গড, ধন্যবাদ এই খাবারের জন্যে, এবং ধন্যবাদ আনিসকে পাশে পাবার জন্যে।

প্রথম দিন খেতে খেতে টিস্যু পেপারের ওপর চক আমার ছবি আঁকলেন। আমি ও ক্লিনটন খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছি। নিচে লিখলেন, ডিয়ার মেরিনা, আজ আমি ও ক্লিনটন এক সঙ্গে লাঞ্চ করেছি। সঙ্গে ছিল এক অদ্ভুত কার্টুনিস্ট। বললেন, এটা মেরিনাকে পাঠিয়ে দিও।

তার এই আদেশ পালন করেছিলাম।

রোজ অফিস ছুটি হলে চক তার গাড়িতে তুলে আমাকে মোটেলে পৌঁছে দিতেন। মাঝে মধ্যে সরাসরি না ফিরে আমরা চলে যেতাম এখানে-সেখানে, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে। পাশেই আরেকটা শহর আছে- মেনিটু স্প্রিংস। চক বললেন, চলো ওই শহরে যাই, তোমাকে পাহাড়ি ফোয়ারার পানি খাওয়াবো। তো চললাম, মেনিটুতে। আমাদের পথের ধারে যেমন ওয়াসার পানির ট্যাপ, তেমনি দু'তিনটা জায়গায় সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে পাইপের মুখ খুলে রাখা হয়েছে। ঝর ঝর করে পানি

www.nagorikpathagar.com

পড়ছে। এই পানি সাপ্লাইয়ের পানি নয়। প্রকৃতির পানি। পাহাড়ি ফোয়ারা এদিক দিয়ে পানি ঢালছে। সেই মুখটাই এরা যত্ন করে বেঁধে রেখেছে। অঞ্জলি ভরে পানি পান করলাম। একদম মিনারাল ওয়াটার।

গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকায়

গেজেট টেলিগ্রাফ এই শহরের পত্রিকা। প্রচার সংখ্যা প্রায় এক লাখ। রঙিন পত্রিকা। পাতার ডিজাইন খুবই সুন্দর। এদের প্রথম পাতা দেখতে এমনকি *ইউএসএ টুডে*'র চেয়েও সুন্দর। এই শহরে এদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। একটা পত্রিকা ছিল *দি ইনডিপেন্ডেন্ট*। এরা সেই পত্রিকা কিনে নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। আমেরিকানরা বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারে না। *গেজেট টেলিগ্রাফ* রক্ষণশীল পত্রিকা। এরা রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক। ডেমক্রেটদের এরা দেখতে পারে না। সারাক্ষণ এরা ক্লিনটন প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর। এরা সব সময়েই চায় স্মল গভর্নমেন্ট– ছোট সরকার। ব্যক্তি হলো স্বাধীন, যা কিছু করার, ব্যক্তি করবে নিজের উদ্যোগে, নিজের প্রতিভায় ও পরিশ্রমে– এই হলো এদের আদর্শ। সরকার কেন অন্যের পকেট কেটে ট্যাক্সের টাকা নিয়ে নিজের মনে করে খরচ করতে যাবে? আমেরিকার কোনো কোনো স্টেটে সমকামিতা বৈধ, এসব একদম অপছন্দ এদের।

এই পত্রিকায় এক মাস সংযুক্ত থেকে আমার মনে একটা মজার প্রশ্ন জেগেছে। গেজেট টেলিগ্রাফঅলারা ওদের মোটামুটি দুর্নীতিমুক্ত সরকারের বিরুদ্ধেই এতো সোচ্চার, ওরা যদি জানতে পারে এই পৃথিবীতে একটা দেশ আছে, যার ১২ হাত কাঁকুরের ১৩ হাত বিচির মতো সরকার হলো প্রচণ্ড বড়, আর সেই সরকারের কাজের মধ্যে পড়ে *নারীর* মতো বই নিষিদ্ধ করা, টেলিভিশন সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করা, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও নিউজপ্রিন্ট দলীয় স্বার্থ বজায় রেখে বণ্টন করা; আর সেই সরকারের কর্মচারীদের বেশির ভাগেরই কাজ হলো ঘুষ খাওয়া এবং ঘুষ খাওয়া, তা হলে ওরা কি মূর্ছা যাবে, পাগল হবে, নাকি আত্মহত্যা করবে?

আমাদের দেশে সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্র এতোটা অদক্ষ ও দুর্নীতিদুষ্ট যে, আমার মনে হয়, ব্যক্তিমালিকানা ব্যক্তিসম্পত্তি একেবারেই তুলে দিতে হবে, নইলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সরকারবিহীন রাষ্ট্র। দেশে যদি একেবারেই কোনো সরকার না থাকে, তা হলে কি দেশ এর চেয়েও খারাপ চলবে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা হাসবেন জানি, কিন্তু একটা রাষ্ট্র কি এর চেয়েও খারাপভাবে চলতে পারে?

সরকার ও সরকারি কর্মচারীরা এদেশে কি করছে?

ধরুন, একজন সরকারি কর্মচারীর কাজ হলো সচল ত্রুটিমুক্ত গাড়িকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়া। এই সার্টিফিকেটটা পেতে আগে গাড়িটাকে কর্মচারীটির সামনে হাজির করতে হয়, নাকি দরকার হয় কিছু টাকা? ত্রুটিমুক্ত যানবাহন রাস্তায় চলছে কিভাবে?

www.nagorikpathagar.com

এ দেশে চোর আছে বলে পুলিশ আছে, নাকি পুলিশ আছে বলে চোর আছে– এটা একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন তো দেখি। আমার এই ক্ষুদ্র-সরকার নীতি দেখে যে কেউ ভাবতে পারেন, অমি রিপাবলিকান বটিকা গিলে ফেলেছি। তা নয়। ডেমক্রেটদের ওদেশে বলা হয় বাম। আমি একটু বামঘেঁষা তো বটেই। আর মার্কিন জৌলুষ আমাকে কতোটা মগ্ন করেছে? আমি ড্যানকে বলেছি, দেখো, তোমার দেশ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল আর আমাদের ফাদার অফ দি নেশনকে হত্যার পেছনে তোমাদের সিআইএ-র হাত আছে– এটা খুব বিশ্বাস করা হয় বাংলাদেশে। শুনে ড্যান বলেছে, হতে পারে, হতে পারে। সিআইএ-কে কে সামলাবে? এ দেশে তো বিশ্বাস করা হয় যে জন এফ কেনেডিকে মেরেছে সিআইএ।

আমি এরপর আর কি বলবো? ঢাকার চেয়ে যেমন মিরপুর বড়, তেমনি রাষ্ট্রের চেয়েও কখনো কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে তার গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের সামলানো তখন সত্যি কঠিন।

নির্মলেন্দু গুণের একটা কবিতা আছে, 'আকাশ যেমন বিমানের চেয়ে বড়, তেমনি আমার বেদনা বক্ষ থেকে।'

বুকের চেয়ে কি বেদনা কখনো বড় হয়! সব সময় হয় না। কিন্তু ভাবুন, একজন গর্ভবতী নারীকে হত্যা করা হলো অকারণে। কাজের মেয়েকে হত্যা করা হলো অকারণে। দশ বছরের ছোট ভাইটিকে আপনার হত্যা করা হলো! কিন্তু সেই সব হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না। ঠাণ্ডা মাথায় একবার ভাবুন না! এখন বলুন, সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

www.nagorikpathagar.com

আমেরিকায় বিক্ষোভ দেখতে যাওয়া

কলারাডো স্প্রিংসে গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকার একজন সম্পাদক আমাকে ডেকে বললেন, আনিস, পাশের শহরে একটা বিক্ষোভ প্রতিবাদের ঘটনা ঘটছে, তুমি কি দেখতে যেতে চাও। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের দেশের মানুষ আমি। রাস্তায় মিছিল দেখলেই রক্তে সুর জাগে। আমি নেচে উঠলাম, নিশ্চয় যাবো, নিশ্চয়।

স্টুয়ার্ট নামের এক ফটোসংবাদিকের সঙ্গে তার গাড়িতে উঠলাম। পিকআপ ভ্যান। জাপানি টয়োটা। এদেশে জাপানি গাড়ি দেখলেই আমার ভালো লাগে। কেমন পরিচিত-পরিচিত মনে হয়। এদের বাজার কিন্তু বিদেশি পণ্যে ভরা। আমাদের দেশের মতো এদেরও বিদেশীপ্রীতি প্রবল। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় যে ট্যুরিস্ট দোতলা বাসগুলো চলে, সেগুলো যে লণ্ডন থেকে সরাসরি আমদানি করা– একথা বলতে পেরে এরা গর্বিত। তেমনি পাহাড়ে ওঠার জন্য বিশেষ ট্রেনটা আমদানি করা হয়েছে সুইডেন থেকে– সেটাও এদের জন্য শ্লাঘার বিষয়। সাধারণ দোকানগুলোয় 'মেড ইন ইউএসএ' লেখা জিনিসপাতি নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ টুকিটাকি জিনিস ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, চীন, তাইওয়ান, মেক্সিকো, পাকিস্তান, ভারত এমনকি বাংলাদেশের তৈরি। ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা ইত্যাদিতে জাপানি আধিপত্য। আর বিভিন্ন ধরনের মদ আসে বিভিন্ন দেশ থেকে। আমাদের সুরারসিকদের চোখ যেমন 'বিদেশী' শুনলেই চিকচিক করতে শুরু করে, তেমনটা করে ওদেরও।

গাড়ি ছুটে চলেছে। উদ্দেশ্য ৯০ মাইল দূরবর্তী শহর হার্টসেল। সেখানে একটা বিমানবন্দর বানানোর জন্য সরকার জমি অ্যাকয়ার করেছে। ফলে স্থানীয় লোকজন বিক্ষুব্ধ। তারা চায় না তাদের শান্ত শহরে এয়ারপোর্ট হোক– হৈ হল্লা হোক। তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। স্টুয়ার্ট যাচ্ছে প্রতিবাদী মানুষদের ছবি তুলতে। সঙ্গে তার ক্যামেরা।

আমি তার ডান পাশে বসে আছি। ওরা গাড়ি চালায় রাস্তার ডান দিক দিয়ে। গাড়ি ছুটে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। দু'দিকে খাড়া পাহাড়। পাথুরে পাহাড়। লাল পাথর, কালো পাথর। কোথাও কোথাও গোটা পাহাড়টাকে মনে হয় আস্ত

www.nagorikpathagar.com

কালো গ্রানাইটের তৈরি। পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কখনো কখনো যাচ্ছি পাহাড় কাটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে। বলা যায়- যাচ্ছি ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে, গিরিখাদ দিয়ে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও ঘন বন। মাঝে মধ্যে সরাইখানা। সে সব পান্থশালা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। যেন কোনো কাউবয় মার্কা ছবির দৃশ্য।

একটা উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামছি। সামনে বিশাল সমভূমি। এতো বিশাল সমভূমি এর আগে আমি কখনো দেখিনি। গাড়ি সেই সমভূমির দিকে নেমে যাচ্ছে। চারদিকে কোনো কিছু নেই। গাছ নেই, ফসল নেই, নদী নেই, ঘরবাড়ি নেই। বিশাল বিজন প্রান্তর। একেই বোধহয় বলা হয় তেপান্তরের মাঠ। সেই তেপান্তরের মাঠের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা সড়ক।

ঘন্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে আমরা পৌঁছলাম একটা দোকানে। কাঠের তৈরি একতলা দোকান। তাতে সব কিছু পাওয়া যায়। টি-শার্ট থেকে শুরু করে চাল-ডাল পর্যন্ত। দোকানী একজন মহিলা। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের এটা তো ছোট শহর। বড় শহর থেকে অনেক দূরে। তাই এক দোকানেই সব কিছু রাখতে হয়।

এই দোকানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা। এলেন আরেকজন মহিলা। তিনি বললেন, ও, আপনারা এসে গেছেন। চলুন, চলুন।

সেই মহিলা নিজেই একটা গাড়ি এনেছে। তার গাড়ি অনুসরণ করে স্টুয়ার্ট নিজের গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। এবার পিচঢালা পথ ছেড়ে আমরা চলতে শুরু করলাম কাঁচা সড়ক দিয়ে। নির্জন বিরান প্রান্তর। আমাদের সামনে একটা ফোরহুইল ড্রাইভ জিপ চলছে ধূলি উড়িয়ে। আমি স্টুয়ার্টকে বললাম, দেখো, দেখো, সামনের গাড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছে টেলিভিশনে গাড়ির বিজ্ঞাপন দেখছি।

আমরা এবার একটা আমেরিকান পল্লীগৃহে উপস্থিত হলাম। ফাঁকা মাঠ বৃক্ষহীন, জনবসতিশূন্য, ফসলরিক্ত। তার মধ্যে বড় বড় গাছের কাণ্ড দিয়ে বেড়া বানিয়ে বাড়ির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাড়ির পাশে আস্তাবল। দু'চারটে প্রমাণ সাইজ ঘোড়া। বাড়ির প্রবেশদ্বারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পাহাড়ি হরিণ, বাইসনের শিং, করোটি।

আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। গৃহস্থ ভদ্রলোক শ্মশ্রুমণ্ডিত। বাড়িতে গৃহকর্তা ছাড়াও আছেন কর্ত্রী আর তাদের একটা দশ-বারো বছরের ছেলে। আর আছে প্রায় আমার সমান উচ্চতার একটা কুকুর। গা-ভর্তি লোম। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর ধরতে হলে যে এই কুকুরটাকেই ধরতে হবে- সেটা বোঝা গেলো মুহূর্তেই। কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি কিন্তু আমাকে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে এলেন। লেজ নাড়তে নাড়তে জিভ বের করলেন, আমার পায়ে আদর করবেন বলে। আমি তো ভয়ে অস্থির।

এই গৃহ থেকে গৃহকর্তা ও কর্ত্রীকে আমরা তুলে নিলাম। এবার দুটো গাড়ি ছুটলো প্রস্তাবিত এয়ারপোর্টের নির্ধারিত স্থান অভিমুখে। মাইলচারেকের ড্রাইভের

www.nagorikpathagar.com

পর অকুস্থলে পৌঁছানো গেলো। কাঁটাতার ঘেরা এক বিশাল প্রান্তর। সেখানে আমরা নামলাম গাড়ি থেকে। এটাই 'সাইট ফর দি এয়ারপোর্ট'।

দূরে পাহাড়ের গায়ে তুষার দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠে বাতাস বইছে হুহু করে। হিমশীতল বাতাস। আমার হাড়ের ভেতরে গিয়ে বাতাস গান ধরেছে– শীতের হাওয়ায় লাগলো কাঁপন নন্দলালের হাড়ে হাড়ে।

তিন জন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত গৃহকর্তা, তার স্ত্রী আর দোকান থেকে ধরে আনা সেই মহিলা। স্টুয়ার্ট ছবি তুললেন। এই হচ্ছে প্রতিবাদের ছবি, বিক্ষোভের ছবি। এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। প্রায় ১০ বর্গমাইল জমি অধিগ্রহণের ফলে যে বিক্ষোভ, তার ছবি তোলার জন্য প্রায় ২০ মাইল গাড়ি দাবড়িয়ে তিনজন মানুষকে একত্র করতে হয়েছে! এখন এরা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভের পোজ দিচ্ছেন। আর আমাদের দেশে যদি এরকম একটা কাণ্ড ঘটতো, তাহলে কি হতো? হাজার হাজার নারীপুরুষের যে মিছিল বেরুতো, তার দৈর্ঘ হতো কমপক্ষে তিন মাইল। একটা জনপদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়তো, চাই কি টিয়ারগ্যাস-রাবার বুলেটের পুলিশী একশনও হয়ে যেতে পারতো একচোট।

বাংলাদেশ আর আমেরিকার তুলনার জায়গাটা এখানেই। আমাদের দেশে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব, সেই হারে যদি আমেরিকায় লোকবসতি স্থাপন করা যায়, তাহলে সারা পৃথিবীর লোককে শুধু আমেরিকাতেই জায়গা দেয়া যাবে। এরপরও আমেরিকার বহু জায়গা পড়ে থাকবে। তার মানে কি? সারা পৃথিবীর মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যদি আমেরিকার ওপরে পড়তো, তাহলে যে ভার পড়তো, বাংলাদেশের কৃষকেরা সেই পরিমাণ ভার কাঁধে নিয়েছেন এবং বলা যায়, প্রায় সার্থকভাবে তারা ১২ কোটি মানুষকে খাইয়ে চলেছেন।

হার্টসেলের সেই বিরান প্রান্তরে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি বাংলাদেশের কৃষকদের উদ্দেশে নিবেদন করলাম হাজার সালাম।

জোসেফ : অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্ব

আমি আর কার্টুনিস্ট চক এসি হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় বসে লাঞ্চ করছি। এমন সময় আমাদের পাশে এসে বসলেন একজন প্রৌঢ় সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক। চক পরিচয় করিয়ে দিলেন– ইনি হলেন জোসেফ– গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকার একাউন্টস বিভাগে কাজ করেন।

এর দু'দিন পর চক গেলেন ছুটিতে। পুরো দু'সপ্তাহের ছুটি। আমি প্রায় সঙ্গীহারা। রবীন্দ্রনাথের *ছুটি* গল্পে ফটিকের যে অবস্থা হয়েছিল, অনেকটা সে রকম হলো আমার হাল।

দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় জোসেফের সঙ্গে দেখা হয়। জোসেফ বললেন, আনিস, কালকে প্রস্তুত থেকো। তোমাকে একটা ইণ্ডিয়ান রেস্তরাঁয় নিয়ে যাবো।

www.nagorikpathagar.com

পরদিন গেলাম তার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান রেস্তরাঁয়। এ শহরের একমাত্র ভারতীয় রেস্তরাঁ। দেয়ালের গায়ে নানা ভারতীয় পোস্টার। তাজমহল থেকে শুরু করে কলকাতার রাস্তা। সেই রাস্তায় রিকশা।

জোসেফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?

আমি বললাম, না। তবে আমাদের দেশে ও ভারতে কেউ কেউ বিশ্বাস করে হয়তো। হিন্দুদের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে বলে শুনেছি।

জোসেফ বললো, সব হিন্দুই কি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী?

আমি বললাম, না, না, তা কেন হবে? ভারতে যেমন পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পাবার দাবি করে কেউ কেউ ব্যবসা করছে, তেমনি বিজ্ঞানমনস্ক আছে, যারা এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

আমার খুব করে মনে পড়লো, *অলৌকিক নয় লৌকিক*-এর লেখক প্রবীর ঘোষ-এর কথা।

জোসেফ বললেন, আচ্ছা, পরের জীবনে কোনো মানুষ কি ইঁদুর, সাপ, বিড়াল হয়ে জন্মাতে পারে?

আমি তো এতো কিছু জানি না। বিপদে পড়লাম। কি বলবো এ প্রশ্নের উত্তরে। কেবল জীবনানন্দ দাশের *আবার আসিব ফিরে* কবিতাটি মনে পড়ছে। শালিক, শঙ্খচিল হয়ে জন্মানোর কথা জীবনানন্দ কেন বললেন?

এ সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে পাছে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কেই ভুল ধারণা দিয়ে বসি– তাই অক্ষমতা প্রকাশ করে মাফ চেয়ে নিলাম।

এবার এলো রিকশা প্রসঙ্গ। কলকাতার রাস্তার ছবি দেখিয়ে জোসেফকে *চেনালাম রিকশা*। তাতেও দেখা দিলো আরেক বিপদ।

জোসেফ জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের দেশে মোটরগাড়ি আছে?

আমি মনে মনে রেগে গেলাম। বললাম, দেখো, তোমাদের এ শহরে ১০ তলার চেয়ে উঁচু বিল্ডিং নেই। আমাদের ঢাকার স্কাইলাইন মানে বিল্ডিং আর বিল্ডিং। সব আছে আমাদের। ট্রেন, বাস, উড়োজাহাজ– সব। এরকম গ্রামে আমার মতো রাজধানী শহর থেকে আসা বালকের খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

মনে পড়লো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *ছবির দেশে কবিতার দেশে*তে কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ সুনীলকে আইওয়া-তে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন, সুনীল, তুমি কলকাতার ছেলে, ওই গণ্ডগ্রামে থাকবে কি করে? ৭০ লাখ মানুষের প্রাণবন্ত শহর ঢাকা থেকে আসা আমার পক্ষেও কোনো নির্জন ছোট শহরে থাকা একই রকম কষ্টকর।

জোসেফ এর পরেরদিন আমাকে নিয়ে গেলো একটা আমেরিকান রেস্তরাঁয়। এটাতে ৮ ডলার খরচ করে যতো ইচ্ছা, যা ইচ্ছা খাওয়া যায়। এই রেস্তরাঁয় ঢুকে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়। কোনটা রেখে কোনটা খাবো। কতো পদের খাবার।

www.nagorikpathagar.com

জোসেফের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। পারিবারিক বন্ধুত্ব। আমি তাদের বাসায় গেলাম। তার বউ আর এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার।

ছেলের নাম ইরভিন। আট-নয় বছর বয়স। ইরভিনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইরভিন, তুমি কি টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখো?

ইরভিন বললো, না।

আমি আশ্চর্য হলাম। বলে কি? আমেরিকান বালক টিভি দেখে না। কেন?

ইরভিন বললো, আমাদের ধর্মে টিভি দেখা নিষেধ।

প্রিয় পাঠক, এ জায়গাটায় এসে আমি আপনাদের বলবো, দাঁড়াও পথিকবর! একটু দাঁড়ান, একটু ভাবুন। খোদ আমেরিকায় একটি ছোট্ট ছেলে টিভি দেখে না– কারণ টিভি দেখা ধর্মে নিষেধ। আর চিন্তা করুন আমাদের কারী মোহাম্মদ বেলালীর বাড়িতে পাওয়া যায় নানা ভিডিও ক্যাসেট। তা হলে মৌলবাদী কারা?

অথচ, জোসেফ পরিবার কিন্তু ক্যাথলিক নয়, প্রোটেস্টান্ট খৃস্টান। এই পরিবারটি টিভি দেখে না, তবে জোসেফ আমাকে ফিল্ম দেখতে নিয়ে গেলো। সঙ্গে জোসেফের বৃদ্ধ বাবা-মা। তারা অন্য বাসায় থাকেন। জোসেফের বাবা বললেন, আমার তেমন সঞ্চয় নেই বলে এখনো আমাকে কাজ করতে হয়। জোসেফের বাবা একজন গৃহনির্মাণ শ্রমিক। কাঠের ঘরবাড়ি বানানোর কাজ করেন।

ও ডারলিং, এই হচ্ছে আমেরিকা। বাবা বুড়ো হতে পারেন, কিন্তু ছেলের আয়ের ওপর নির্ভর করবেন না। নিজের সঞ্চয় ভাঙাবেন, না হলে নিজে কাজ করবেন। দেখে একটু মায়াই লাগলো।

ফিল্মটা হলো পাহাড়ি খরস্রোতা নদীতে এক অভিযাত্রী দলের নৌকা চালানোর ওপরে। প্রামাণ্য ছবি। অসাধারণ।

জোসেফের মা আমাকে বললেন, সম্প্রতি চীনে যে বিশ্ব নারী সম্মেলন হয়ে গেলো, তাতে আমেরিকা থেকে যে মেয়েরা গিয়েছিল তারা ভালো মেয়ে নয়। বেশির ভাগ আমেরিকান মহিলার মতো তারা নয়। তারা যা বলেছে, তা আমাদের কথা নয়।

এই বার আমার স্তম্ভিত হবার পালা! বেইজিং সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধিরা যা বলেছে, তা বেশির ভাগ মার্কিন নারীকে প্রতিনিধিত্ব করে না!

নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার এই পৃথিবীকে যে আরো বহুদূর যেতে হবে, বেশ বোঝা যাচ্ছে!

সানশাইন ল : হাতে-কলমে

কলার‍্যাডো স্প্রিংসে এক লোক খুন হয়েছেন। বিশাল খবর। গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকার ক্রাইম নিউজ রিপোর্টার এ বিষয়টা নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে বললেন, আনিস, কোর্ট বিল্ডিং-এ যাচ্ছি। যাবেন নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, যাবো।

www.nagorikpathagar.com

এই রিপোর্টারের কোর্ট বিল্ডিং-এ যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো- নিহত ব্যক্তির একটা ডিভোর্সের মামলার কাগজপত্র খতিয়ে দেখা। দু'বছর আগে এই ব্যক্তির বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। সেই মামলার কাগজপত্র সব কোর্ট বিল্ডিং-এ আছে। সে সব তিনি দেখবেন। জানতে চেষ্টা করবেন নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে নানা দরকারি তথ্য।

আমি ভাবলাম, খুব জটিল কাজ। ঘন্টাদুয়েক সময় তো শুধু এ রুম ও রুম, এ অফিসার সে অফিসার, এ ফাইল ও ফাইল করতেই যাবে।

কিন্তু ব্যাপারটি সময় নিল পাঁচ মিনিট। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে আমরা ঢুকে গেলাম কোর্ট বিল্ডিঙে। একটা লম্বা টেবিলের অপর পার্শ্বে তিনজন পুলিশ দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের সার্ভিস দিচ্ছেন। দর্শনার্থীরা সোফায় বসে আছে। আমাদের ডাক পড়লো। রিপোর্টারটি বললেন- এই ব্যক্তির বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার নথিপত্র দেখতে চাই। পুলিশটি বললো, এক মিনিট দাঁড়াও। এক মিনিট পরে ফাইলটি এনে দিল।

রুমের ভেতরেই ফটোকপিয়ার মেশিন। তিনি আরেক মিনিটে ফটোকপি করে নিলেন তার দরকারি অংশ। ফাইলটি ফেরত দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম কোর্ট বিল্ডিং থেকে।

রিপোর্টারটি আমাকে বললেন- দরকারি সব তথ্য আছে। নিহত মানুষটি কতো টাকা আয় করতেন, কোন একাউন্টে কতো টাকা আছে- সব।

এই যে মার্কিন দেশে সরকারি যে কোনো কাগজপত্র সাংবাদিকেরা 'চাহিবামাত্র' দেখতে পারে, তার মূলে আছে সানশাইন ল। শুধু কি ফাইল, যে কোনো সরকারি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে খোলাখুলিভাবে, যে কোনো সাংবাদিক তো বটেই, সাধারণ মানুষও যদি সেই বৈঠকে দেখতে-শুনতে চায়, তাকে তা করতে দিতে হবে। সব কিছুই করতে হবে সূর্যের আলোর নিচে- খোলাখুলিভাবে। কেবল অতি গোপন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক তথ্য গোপন করা যায়। সেই ক্যাটেগরিতে কোন তথ্য পড়ে- সেটা নিয়ে আবার সাংবাদিকেরা মামলা করেন। এসব মামলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার হেরে যায়- সংবাদপত্র জয়লাভ করে। এর মূলে আছে মার্কিন সংবিধানের একটা ছোট্ট লাইন। এটা প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে- এমন কোনো আইন কংগ্রেস পাস করবে না- এই হচ্ছে প্রথম সংশোধনীর মূলকথা। এই একটা কথা মার্কিন মুলুকে কেবল কথার কথায় হয়ে যায়নি। মানুষের চেতনার মধ্যে ঢুকে গেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে ক্ষুণ্ন করা যায়- এটা তারা কল্পনাও করতে পারে না। সত্য বটে, এই স্বাধীনতার সুফলের সঙ্গে কুফলও মার্কিনীরা খানিকটা ভোগ করে। সংবাদপত্র প্রায়ই ব্যক্তির গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করতে উদ্যত হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি মামলা করতে পারে সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে। পাবলিক ফিগারদের ব্যক্তিগত জীবন

www.nagorikpathagar.com

আমেরিকায় সংবাদ হিসেবে স্বীকৃত। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, টিভি ও ফিল্ম তারকা, ক্রীড়াব্যক্তিত্ব– এদের ব্যক্তিজীবন বলতে তেমন কিছু আছে বলে তারা মনে করে না।

সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে ওদের দেশে মামলা হয়– কিন্তু ফৌজদারী মামলা নয়, ক্ষতিপূরণের মামলা। আমাদের দেশের মতো ওরা সাংবাদিককে কোমরে দড়ি দিয়ে হাজতে পোরে না।

এমনকি, ওরা বলে, সংবাদপত্রের অধিকার আছে মিথ্যা বলার। অধিকার আছে অশ্লীল ছবি ছাপবার। ওরা এটা বলে, কারণ তা না হলে মিথ্যা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার অজুহাতে সরকারের হাতে খড়্গ তুলে দেয়া হবে। আর তা হবে শেয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেবার শামিল।

এই যে স্বাধীনতা– মার্কিন সমাজে তার সুফল দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার পত্রিকা, কোনোটায় নগ্ন ছবি, কোনোটায় উত্তেজক খবর– কিন্তু মানুষ পড়ছে নিউ ইয়র্ক টাইমস কিংবা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতো সিরিয়াস ভালো পত্রিকা।

সম্প্রতি ওদেশে আইন করা হয়েছে– জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো যাবে না। গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। কারণ তারা মনে করে– এতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। কেউ যদি জাতীয় পতাকা পোড়াতে চায়– রাষ্ট্র তাকে বাধা দেবার কে?

গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ। সরকারি কাজকর্মের স্বচ্ছতা। মিডিয়া ওদেশে ওয়াচডগ। পান থেকে চুনটি খসলে ওরা সরকারের বিরুদ্ধে হৈচৈ করে ওঠে।

আরেকটা বড় বিষয় ওদেশে– বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। ওয়াশিংটন ডিসির নগর পরিকল্পনায় কোর্ট আর সিনেট বিল্ডিংকে দুটো আলাদা জায়গায় রাখা হয়– মধ্যখানে রাখা হয় বিরাট ফারাক। এই প্রতীক ফারাকের অর্থ বিচার বিভাগ আর আইন পরিষদ যেন সব সময়ই আলাদা থাকে। আর আমাদের দেশে? নিম্নস্তরে প্রশাসন আর বিচার বিভাগ এক। সংবাদপত্রে কিছু লেখার জন্য কোনো মন্ত্রী যদি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেন, জামিন নিতে আমাকে যেতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। মন্ত্রী সাহেবকে সামনে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

যে দেশে সরকার এক হাজার উপায়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, রেডিও-টিভির মালিকানা যে দেশে সরকারের হাতে, যে দেশে সরকার নিউজপ্রিন্টের মালিক, নিউজপ্রিন্টের হাড্ডি মাংসের সামনে সংবাদপত্রগুলো যেখানে পথের কুকুর মাত্র, যে দেশে সরকারি বিজ্ঞাপন ব্যবহৃত হয় সংবাদপত্রকে ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণ করতে, যে দেশে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আনা হয় ক্রিমিনাল কেইস, তাদেরকে চোর-ডাকাতের মতো গ্রেফতার করা হয়– এবং

www.nagorikpathagar.com

যে দেশে বিচার বিভাগ স্বাধীন নয়, যে দেশে বিচারক নিয়োজিত হয় রাজনৈতিক পরিচয় বিচার করে, যে দেশে বিচারের রায়কে নানাভাবে নিজের মনের মতো করে আদায় করা যায়–

সে দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি অধিকাংশের সমর্থনপুষ্ট সরকারও রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে, তবু যা প্রতিষ্ঠা পাবে– তার নাম গণতন্ত্র নয়, তা এক দুর্বিষহ নিপীড়নতন্ত্র, দলতন্ত্র, গোষ্ঠী স্বৈরাচার।

বস্তুত বাংলাদেশে তাই চলছে, সম্ভবত তাই চলবে। মানুষ বিরক্ত হয়ে বলছে– এর চেয়ে তো স্বৈরাচারই ভালো ছিল। গণতন্ত্রের চেয়ে স্বৈরতন্ত্রের ভালো হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গণতন্ত্র মানে বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সহ গণতন্ত্র। এখন মাথা কেটে, হাত-পা কেটে একটা শরীর ফেলে রেখে বলা হচ্ছে– দেখো দেখো, এতো পশুরও অধম। এটা যে মানবদেহ নয়– এটা মানবদেহের সব সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাকে ধারণ করে না– সেই কথাটা আজ জোরেশোরে বলার সময় এসেছে। বলার সময় এসেছে– এই কবন্ধ দেহাংশে মস্তক দাও, হাত পা দাও– সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দাও, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দাও।

www.nagorikpathagar.com

আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন...

১৬ অক্টোবর ১৯৯৫ ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলের পশ্চিমের মলে নিযুত কালো মানুষ সমবেত হয় নেশন অফ ইসলাম নেতা লুই ফারাখানের ডাকে। আমেরিকার ইতিহাসে এটা ছিল তৃতীয় বৃহত্তম সমাবেশ। এ সময় আমি ছিলাম ওয়াশিংটন থেকে অনেক দূরে কলার‍্যাডো স্প্রিংসে। কিন্তু আগের দিন থেকেই টেলিভিশনে সার্বক্ষণিক সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয় এ সমাবেশের নানা দিক নিয়ে। মোটেল কক্ষে টিভি ছেড়ে দিয়ে আমি কালো নেতাদের বক্তৃতা শুনি আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠি।

কলার‍্যাডো স্প্রিংসে সেই সমাবেশের ঢেউ তেমন করে লাগেনি। জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। এ শহর থেকে প্রতিনিধিরা অবশ্য গিয়েছিল মহাসমাবেশে যোগ দিতে।

হঠাৎ একদিন *গেজেট টেলিগ্রাফ* পত্রিকার সহব্যবস্থাপনা সম্পাদক টড আমাকে বললেন, নেশন অফ ইসলামের এক নেতা স্থানীয় হাইস্কুলে বক্তৃতা করবে, তুমি কি শুনতে আগ্রহী?

অমি সাগ্রহে রাজি হলাম। আমাকে জুড়ে দেয়া হলো পত্রিকার রিপোর্টার তেরেসার সঙ্গে।

তেরেসা দেখতে সুন্দর, বয়স আমার মতোই হবে, গাড়িতে তার পাশে আমাকে বসিয়ে সে ছুটলো স্কুল অভিমুখে।

আমি বললাম, তোমার পুরো নাম কি মাদার তেরেসা?

সে হেসে বললো, আমার বন্ধুরা আমাকে মাদার বলে মাঝে মধ্যে ডাকে বই কি!

হাইস্কুল মানে কিন্তু আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। স্কুলটির নাম দি কলার‍্যাডো স্প্রিংস স্কুল।

প্রি কিন্ডার গার্টেন থেকে শুরু করে আপার স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে স্কুলটিতে। স্কুলটি তাদের ফিলোসফি হিসেবে প্রচার করে থাকে এ বাক্যটি– *শিক্ষার সঙ্গে যদি অভিজ্ঞতাকে জুড়ে দেয়া যায় জ্ঞান তাহলে হয় দীর্ঘস্থায়ী।* এই দর্শন যে শুধু মুখে মুখে প্রচার করে এরা, তা নয়। প্রমাণ হাতে হাতে। সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে

www.nagorikpathagar.com

এরা ছাত্রছাত্রীদের সামনে সরাসরি হাজির করে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের প্রতিনিধিদের– বক্তৃতা করার জন্য। আজ যেমন বক্তৃতা করবেন নেশন অফ ইসলামের প্রতিনিধি ব্রাদার এরিক।

স্কুলটিতে সব ধর্মের, সব বর্ণের, দেশী-বিদেশী ছেলে-মেয়ে সবাই ভর্তি হতে পারে। টিউশন ফি বার্ষিক নিচের ক্লাসে ৩০০০ মার্কিন ডলার থেকে শুরু করে উঁচু ক্লাসে ৯০০০ ডলার পর্যন্ত। হোস্টেলে থাকলে অবশ্য সর্বোচ্চ খরচ ১৮৫০০ ডলার। টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ফি দেখা যাচ্ছে সাড়ে সাত লাখ টাকা মাত্র। আমাদের দেশের ঘুষখোর কর্মকর্তা, ঋণ খেলাপি ধনী, কর ফাঁকি দেয়া ব্যবসায়ী আর চোরাকারবারীদের জন্য এটা কোনো টাকাই নয়।

আমি ও তেরেসা ক্লাস রুমে ঢুকলাম। ২০ / ৩০ জন ছেলেমেয়ের একটা ক্লাস। ব্রাদার এরিকের বয়স ৪০। তিনি এ শহরের নেশন অফ ইসলাম তথ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

আসসালামো আলায়কুম। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। একমাত্র আমিই তার সম্ভাষণের উত্তরটা জানি এবং তা অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম– ওয়ালাইকুম আসসালাম।

ব্রাদার এরিক তার বক্তৃতার ১৬ অক্টোবরের মিলিয়ন ম্যান মার্চের সাফল্য বর্ণনা করলেন। তাদের দাবি, সমাবেশে ১০ লাখেরও বেশি লোকের সমাগম হয়েছিল। তিনি জানালেন- এই সমাবেশের প্রচারে তারা প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমগুলোর সাহায্য পাননি, চানওনি; তারা নিজেরাই এক বছর ধরে পরিশ্রম করে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে সমবেত করতে পেরেছেন এতো বিপুলসংখ্যক কালো মানুষকে। লুই ফারাখানের বিরুদ্ধে যে হিংসা ও ইহুদি বিদ্বেষের অভিযোগ– তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানালেন তিনি। তিনি বললেন, আমাদের আন্দোলন কারো বিরুদ্ধে নয়, কালো মানুষদের জীবনকে উন্নত করার জন্য। মিলিয়ন ম্যান মার্চে ফারাখান কালো মানুষদের শপথ নিতে বলেছেন যেন তারা তাদের ভাইকে ভালোবাসে; যেন তারা নিজেদের আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করে গড়ে তোলে; যেন তারা ব্যবসা; গৃহ, হাসপাতাল, কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের উন্নয়নের জন্য; যেন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরে, যেন কোনো কালো পুরুষ তার স্ত্রী পরিবারকে ফেলে না যায়, অসম্মান না করে, সন্তানদের দায়িত্ব নেয়; যেন কোনো কালো মানুষের হাতে কোনো নারী অসম্মানিত না হয়; যেন তারা কালো সংবাদপত্র, কালো রেডিও, কালো টেলিভিশন, কালো শিল্পীদের সমর্থন করে।

বক্তৃতা শেষ হলো। এতোক্ষণ ছেলেমেয়েরা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ব্রাদার এরিকের কথা। এ ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাঁচ ছয় জন কালো আছে, বাদামিও আছে দুতিনজন। এবার প্রশ্নোত্তরের পালা। একটা চমৎকার-দর্শন মেয়ে প্রশ্ন করলো– আচ্ছা, তোমাদের কর্মসূচি নেগেটিভ কেন, কেন তোমরা সবাইকে ভালবাসার কথা না বলে শুধু নিজেদের কথা বলছো?

www.nagorikpathagar.com

ব্রাদার এরিক বললেন, না, আমাদের কর্মসূচি নেগেটিভ নয়। দেখো, ইহুদিদের আলাদা হাসপাতাল আছে, হিস্পানিকদের আলাদা স্কুল আছে, ক্যাথলিকদের আলাদা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে– তাহলে আমাদের কেন থাকবে না? আমরাই তো সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ।

ছেলেমেয়েরা আরো কিছু প্রশ্ন করলো। ওদের প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা গেলো– ওরা সত্যি বক্তৃতাটা মন দিয়ে শুনেছে এবং বিষয়টা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়নি। সমাজের নানা অংশ, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা তাদের কাছে আর কেবল থিয়োরি নয়। ফলে বিদ্যা জিনিসটা কেবল অন্ধের মতো মুখস্থ করার বিষয় হয়ে থাকছে না তাদের কাছে। ছোটবেলায় কতো কিছু না বুঝে মুখস্থ করেছি। লিখেছি– গরু গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। ইহার চারিটি পা আছে। চতুষ্পদ মানেই যে চারপা বিশিষ্ট কেউ বলে দেয়নি। এখনো তো বিশ্ববিদ্যালয় পেরুনো শিক্ষিত লোকজনের দরখাস্ত চোখে পড়ে। দেখি তারা লিখেছেন– অতএব বিধায় প্রার্থনা এই যে... হুজুরের সমীপে...।

বক্তৃতা শেষ হলে ব্রাদার এরিকের সঙ্গে কথা বললাম। তাকে জানালাম, ভাইটি, আমিও মুসলমান। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ইয়াসির আরাফাতের মতো সে আবার আমাকে চুমু খাবে না তো? আমি কোলাকুলি করার কায়দায় এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে যে কি পদ্ধতিতে আলিঙ্গন করবে, আর আমি কি পদ্ধতিতে– দুটো ঠিক ম্যাচ করলো না। ফলে আলিঙ্গন জমলো না।

আমি বললাম, জনাব, আপনারা নাকি লিবিয়ার গাদ্দাফির কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়েছেন? নিউ ইয়র্ক টাইমসে দেখলাম।

এরিক বললেন, ডাহা মিথ্যা কথা। এসবই শাদা প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার।

আমি বললাম, তোমরা নিজেদের মুসলিম না বলে ব্লাক মুসলিম বলো কেন? এটা আবার কোন ধর্ম?

তিনি বললেন, না না, আমরা মুসলিম। আমরা বিশ্ব মুসলিমেরই অংশ।

আমি শুধালাম, তা ভাইটি, মুসলমান হিসেবে তোমাদের কি কি আচার এবাদত করতে হয়? এরিক বললো, যেমন ধরো, আমরা উপবাস করি। প্রত্যেক মাসের পয়লা রোববার।

আমি বললাম, সেটা কেমন?

এরিক উৎসাহ পেয়ে বললেন, প্রত্যেক মাসের প্রথম রোববার এক সূর্যাস্ত থেকে পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা আমরা না খেয়ে থাকি শুধু পানি খাওয়া চলে। অন্য কোনো কঠিন খাবার নয়। এতে আত্মা পবিত্র হয়।

রমজান মাস বা রোজার নাম শুনেছো?

তিনি চুপ করে গেলেন। শোনেননি।

www.nagorikpathagar.com

আমি বললাম, ইসলামে তো শাদাকালো বিভেদ নেই। একজন শ্বেতাঙ্গ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা তাকে নেশন অফ ইসলামে নেবে?

তিনি বললেন, না আমাদের নেশন কেবল কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য।

শিশুদের স্কুলে

এরপর তেরেসা আমাকে নিয়ে গেলো একটা শিশুদের স্কুলে। সেই স্কুলে সেদিন হ্যালুইন উৎসব। সব ছেলেমেয়ে বিচিত্র সাজে সেজে এসেছে। স্কুলে যেন রঙের উৎসব। হ্যালুইন আমেরিকানদের হেমন্ত উৎসব। এই দিনে তারা ডাইনি ভূত পেত্নীর সাজে সাজতে ভালবাসে। সে জন্যই উৎসবটা ভয়ংকরও হয়। আনন্দের আতিশয্যে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। হয়তো এমন ভয়ংকর ফাঁদ বানিয়ে রাখা হয়- লোকে মারা পড়ে। কলার‍্যাডো স্প্রিংস শহরে একটা সামাজিক আন্দোলন চলছে- চাই সুন্দর নিরাপদ হ্যালুইন। যেন কেউ কারো ক্ষতির কারণ না হয়। যেন শিশুরা বেশি ভয় পেয়ে না যায়। আমেরিকায় কুমড়ার যে কি কদর! মিষ্টি কুমড়া। হ্যালুইন ও হেমন্তের প্রতীক এই কমলারঙা কুমড়া। *গেজেট টেলিগ্রাফ* পত্রিকা অফিসের টেবিলে টেবিলে শোভা পাচ্ছে কুমড়া। অনেকের বাড়ির গেটে নাকমুখ চোখ আঁকা কুমড়া সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর আমার বন্ধু জোসেফ বলেছে, আনিস, আমি একটা সত্যিকারের বাদুড়ের দেহ সংরক্ষণ করে রেখেছি। হ্যালুইনের রাতে পরে অফিসে আসবো। আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললাম- মাথা খারাপ, জলাতঙ্কের জীবাণু থাকে বাদুড়ের দেহে। তুমি মরবে। এই দিন বাচ্চারা হ্যালুইনের উদ্ভট সাজে সেজে বাড়ি বাড়ি যায়- গৃহকর্তা-কর্ত্রী তাদের দেন ক্যান্ডি বা চকলেট।

স্কুলে ছেলেমেয়েদের সাজ মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। সেরা সাজের জন্য পুরস্কারও দেয়া হবে স্কুলের পক্ষ থেকে।

এইসব হৈ-হল্লা ঠেলে ফেলে আমরা গেলাম স্কুল ভবনের পেছনে একটা মাঠে। সেখানে ফায়ার সার্ভিস, পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপালিটির জরুরী সার্ভিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গাড়ি ও ইউনিফর্ম পরা কর্মচারী। একেবারে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এরা শেখাচ্ছে রাস্তায় বিপদে পড়লে কিভাবে এই ধরনের গাড়ির কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

নগর কর্তৃপক্ষ এ ধরনের গাড়ি চালক ও কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে- পথে কোনো শিশু সাহায্য চাইলে সবার আগে ওই শিশুকে সাহায্য করতে হবে। কোনো শিশু দুই হাত মাথার ওপরে তুলে নাড়তে থাকলে বুঝতে হবে যে সে সাহায্য চায়।

এরপর আমরা গেলাম আরেকটা হল রুমে। সেখানে এসেছে পুলিশের প্রতিনিধিরা। স্কুলের বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে কিভাবে ড্রাগ বর্জন করতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

পুলিশের ইউনিফর্ম পরে প্রমাণ সাইজ মিকিমাউসও উপস্থিত সেখানে। এসব কার্টুনের কাণ্ডকারখানা দেখে বাচ্চারা হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কেবল পরীক্ষার খাতা ভরে, 'আলোচ্য অংশটুকু... ' লেখার নামই যে শিক্ষা নয়, সেটা এই স্কুলগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

রিপোর্টার-সম্পাদক দ্বন্দ্ব

সারা পৃথিবীতেই সংবাদপত্র অফিসে রিপোর্টারদের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের সম্পর্ক দা কুমড়োর। রিপোর্টাররা ভাবেন সাব এডিটর, এসিস্ট্যান্ট এডিটররা তো কেরানী। ওরা সারাক্ষণ অফিসে বসে থাকে। দিন দুনিয়ার খবর রাখে না। কাগজের অপ্রয়োজনীয় অংশ লিখে থাকে। আর আমরা করি কতো জরুরী কাজ। আমাদের রিপোর্টের কারণেই পত্রিকা বিক্রি হয়। কতো মন্ত্রী মিনিস্টারের সঙ্গে আমাদের ওঠবোস।

আর সম্পাদকীয় বিভাগের লোকেরা ভাবেন– প্রতিবেদকেরা তো গাড়ল শ্রেণীর। তারা পড়াশোনা করে না। সারাক্ষণ রোদে রোদে ঘুরে বেড়িয়ে তাদের মগজ গেছে শুকিয়ে। ওরা কামলা বই তো নয়।

এই দ্বন্দ্ব যেমন বাংলাদেশে সত্য, তেমনই সত্য আমেরিকায়। একদিন বিকেলে মোটেলের রুমে টিভি অন করেছি, দেখি বক্তৃতা করছেন নোয়াম চমস্কি। ইনি আসলে একজন ভাষাবিজ্ঞানী। কিন্তু খ্যাতিমান হয়েছেন রাজনৈতিক চিন্তার জন্য। বিশেষ করে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে তুলোধুনো করে বক্তৃতা দিতে তার কোনো জুড়ি নেই। নিজের দেশে তেমন একটা আলোচিত না হলেও এই অধ্যাপক ইউরোপে প্রচণ্ডভাবে সমাদৃত। নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভাষ্য মতে তিনি জীবিত দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পৃথিবীর সর্বকালের সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত ব্যক্তি বা গ্রন্থের যে শীর্ষদশ তালিকা– তাতেও তার স্থান চার নম্বরে। তার ওপরে আছে কার্ল মার্কস, বাইবেলের মতো দুএকটা গ্রন্থ / লেখক।

আমি মনোযোগ দিয়ে চমস্কির বক্তৃতা শুনলাম। তিনি বলছেন, আমেরিকা কি করে? বলে– অমুক দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। তাদের কাছে বেচে এফ-সিক্সটিন। এরপর তার পাশের দেশকে বলে– তোমরা তো বিপন্ন। তাদেরকে দেয়া হয় আরো শক্তিশালী অস্ত্র। তারপর আবার অস্ত্র বিক্রি করা হয় প্রথম দেশটির কাছে। চমস্কি লোকটা দেখতে ছোটখাটো। একটা টিশার্ট পরে খুব শাদাসিধে পোশাকে উপস্থিত হয়েছেন দর্শকদের সামনে। কিন্তু কথা বলছে প্রচণ্ড আস্থার সঙ্গে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো একবার হাসছে, একবার গম্ভীর হচ্ছে।

আমি পরদিন গেলাম গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। সম্পাদকীয় বিভাগের ড্যানকে বললাম চমস্কির বক্তৃতার কথা। ড্যান বললো, তুমি চমস্কির বক্তৃতা শুনেছো? হা হা হা। তুমি তার বক্তৃতার শ্রোতার সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিয়েছো। এ

www.nagorikpathagar.com

দেশে চমস্কির নাম কি বেশি লোক জানে নাকি? আমি অবশ্য জানি। কারণ আমি সম্পাদকীয় বিভাগের লোক। কিন্তু তুমি যাও দেয়ালের ওই পারে, রিপোর্টারদের কাছে– একজন রিপোর্টারও যদি চমস্কির নাম এর আগে শুনে থাকে! অসম্ভব, কেউ জানে না। আসলে রিপোর্টাররা পড়াশোনা করে না তো।

আমি মজা পেলাম। সেই দা-কুমড়া দ্বন্দ্ব।

কী সুন্দর লাইব্রেরি

চমস্কি সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেড়ে গেলো। গত বিকেলে চমস্কির বক্তৃতা শুনেছি। তার একটু পরে টেলিফোন পেয়েছি আজফার ভাইয়ের। আজফার হোসেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক। এখন আছেন ওয়াশিংটনে, বৃত্তি নিয়ে এসেছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। চমস্কির পর পরই আজফার ভাইয়ের কণ্ঠ– কি অপূর্ব যোগাযোগ! দেশে আজফার ভাইদের কল্যাণেই চমস্কি, গ্রামসি, জ্যাক দেরিদার নামধাম আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

আমি *গেজেট টেলিগ্রাফ* পত্রিকার লাইব্রেরিতে গেলাম। লাইব্রেরিয়ান তিনজন– একজন তানিয়া। ছটফটে চমৎকার এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী।

তানিয়াকে বললাম, আপুমণি, তুমি কি আমার একটু উপহার করতে পারো? আমি চমস্কি সম্পর্কে জানতে চাই।

তানিয়া বললো, তুমি তোমার ডেস্কে গিয়ে বসো। দেখি খুঁজে পাই কিনা।

লাইব্রেরি মানে কম্পিউটার লাইব্রেরি। ওরা নিজেদের পত্রিকার সব ম্যাটার সাজিয়ে রেখে দিয়েছে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে। এ ছাড়াও *নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ওয়াশিংটন পোস্ট* ইত্যাদি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ খবর, আর্টিকেল সংরক্ষিত আছে কম্পিউটারে।

আমি নিজের ডেস্কে এসে বসেছি ৫ মিনিটও হয়নি। তানিয়া প্রায় ২০ পৃষ্ঠা প্রিন্ট আউট নিয়ে হাজির আমার কাছে। নোয়াম চমস্কি সম্পর্কে *নিউ ইয়র্ক টাইমসে* এ পর্যন্ত তিনটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে– এ হচ্ছে তার কপি। কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক থেকে প্রিন্ট আউট নিয়ে সে গরম গরম পরিবেশন করতে এসেছে।

আমি অপার বিস্ময়ে তানিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এমন লাইব্রেরি আছে তাদের আলোকচিত্রেরও। কম্পিউটারে সংরক্ষিত। এমনিতেই তারা ফটো এডিটিং করতে পারে কম্পিউটার দিয়ে। ধরা যাক, একটা ছবিতে একজন পোস্টার নিয়ে যাচ্ছে। পোস্টারে লেখা– স্বৈরাচার নিপাত যাক। কম্পিউটার এডিটিং টুল ব্যবহার করে একই কালিতে একই টেক্সচার দিয়ে সেটি লিখে দেয়া যাবে– গণতন্ত্র নিপাত যাক। আবার মোহামেডানের খেলোয়াড় রেফারিকে পেটাচ্ছে– এই ছবি তুলে এনে জার্সির জায়গায় আবাহনীর জার্সি বসিয়ে দিয়ে বানানো যাবে– আবাহনীর খেলোয়াড় রেফারিকে ধোলাই দিচ্ছে। এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে দিব্যি ম্যাডোনার নগ্ন

www.nagorikpathagar.com

দেহের ওপরে হিলারির মাথা বসিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায়। ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো হরদম সে সব করেও। কিন্তু সিরিয়াস পত্রিকাগুলো এই কাজকে নিজের সন্তানকে খুন করার মতোই গর্হিত বলে মনে করে।

যা হোক, ফটো লাইব্রেরিতেও বহু ছবি জমা করা আছে কম্পিউটারের সাহায্যে। আমাকে ওরা বললো, দেখি বাংলাদেশের কোনো ছবি আছে কিনা। মাত্র একটা ছবি পাওয়া গেলো। তসলিমা নাসরিন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে আদালতে যাচ্ছেন জামিন নিতে।

আর আছে ইন্টারনেট। কম্পিউটারের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে তথ্যের আদান প্রদান। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কেও জানা যায়। আমাকে সেই সব দেখাতে গিয়ে ওদের একজন সম্পাদক বললো, চলো, আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানি।

বাংলাদেশ লেখা ফাইলে মাউস চাপতেই কম্পিউটারের রঙিন পর্দায় ভেসে উঠলো বাংলাদেশের সবুজ লাল পতাকা। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো সেই বাঙালিটির প্রতি যে তার দেশের পরিচিতি ইন্টারনেটে ইনপুট করেছে।

তারপর দেখতে পেলাম, জ্বলজ্বল করছে এক সৌন্দর্যবান বাঙালির রঙিন ছবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের কথা বলতে হলে তো শেখ মুজিবের কথা বলতেই হবে।

দেশে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে মুজিবের নাম বলি না।

কি আশ্চর্য, দিনের পর দিন আমরা কতো মিথ্যা, কতো আত্মপ্রতারণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। অকৃতজ্ঞ, মিথ্যুক, সত্য গোপনকারী, সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশ্রণকারী– এই তো আমাদের পরিচয়। নিজের ইতিহাসকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে একটা জাতি সামনে এগুতে চায় কি করে? মিথ্যার ওপরে কি দাঁড়িয়ে থাকবে জাতির ভবিষ্যৎ?

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে...

কলার‍্যাডো স্প্রিংসে আমি ছিলাম চার সপ্তাহ। ওখানে দুপুরের খাবার খেতাম সকাল সাড়ে এগারোটায়। রাতের খাবার সন্ধ্যা ছয়টায়। তারপর আর কোনো কাজ থাকতো না। মোটেলে এসে টিভি ছাড়তাম। টিভি দেখে আর কতোক্ষণ থাকা যায়। অবশ্য ড্যান আমাকে বলেছে, তোমার রুমে টিভি আছে? তাহলে আর তুমি নিঃসঙ্গ নও। আমেরিকার বেশির ভাগ লোকেরই সর্বোত্তম সঙ্গী হচ্ছে টেলিভিশন।

টিভি দেখে মজা পাই না। নারী পুরুষ চুমু খেতে উদ্যত হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঘোলা করে দেয়া হয়। সেন্সর। অথচ বাংলাদেশে বসে স্যাটেলাইটে দূরদর্শনের অ্যাডাল্ট ছবিগুলোতে কত কিছু দেখা যায়! আমি আসলে এক মহারক্ষণশীল রাজ্যে এসে পড়েছি। আমেরিকায় সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠির জন্য চাকরিতে আলাদা কোটা আছে। সেই সুবিধা সমকামীদেরও পাবার কথা। কলার‍্যাডো রাজ্য সরকার সেই

www.nagorikpathagar.com

আইনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তারা সমকামীদের আলাদা সংখ্যালঘু গোষ্ঠি বলে স্বীকার করতে চায় না।

বাইরে খুব ঠাণ্ডা! সন্ধ্যার পর পাবলিক বাস বন্ধ হয়ে যায়। আমি কোথায় যাবো? বোকার মতো একা একা এদিকওদিক ঘুরে বেড়াই। মোটেলের পাশে একটা ঝর্না আছে। সেই ঝর্নার পাশে ঘন জঙ্গল গেছে পাহাড় অবধি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলার পথ। বিকেলে সেই পথে একা একা হাঁটি। নগর কর্তৃপক্ষ ঝর্নার ধারে ধারে পাখি দেখার পয়েন্ট বানিয়ে রেখেছে। কোন মাসে কি কি জলচর পাখি আসে সে সব লেখা। আমার খুব মুখস্থ। আমি একাকী সেই পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি।

নিঃসঙ্গতা খুব গাঢ় হয়ে দেখা দিল, আমার মেয়ে পদ্যকে রেখে এসেছি দুমাস বয়সী। এখন বয়স তিন মাস। হোম সিকনেস কাকে বলে, কয় প্রকার– সব বুঝতে শুরু করেছি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যসংগ্রহ নিয়ে এসেছি। পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। পূজা সংখ্যা দেশ। ফিকশন পড়তে ভাল্লাগে না। জয়ের দীর্ঘ পদ্যটা ভরসা। আর নীরদ সি চৌধুরী। রাত ন'টা দশটায় ঘুমিয়ে পড়ি মধ্য রাতে ঘুম ভেঙে যায়।

ছেঁড়াখোঁড়া ঘুম।

এলোমেলো স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন। সবচেয়ে ভয়ংকরটা হলো বুয়েটের পরীক্ষা হলে বসেছি। ঘুম ভেঙে গেলে ভালো লাগে। এ জীবনে আর পরীক্ষার হলে যাচ্ছি না। আর মনে হয় কতো কথা। শৈশবের কথা মনে পড়ে! স্বপ্নে আব্বা-আম্মাকে দেখি। এই সব গভীর বন, গম্ভীর পাহাড় আর পথের ধারে ছোট ছোট টাউন হোম দেখে মনে হয়– মানুষ কতো বিচিত্রভাবে, কেমন করে সাধ্যমতো বাস করছে। মানুষ এইভাবে বেঁচে থাকে– খায়দায় ঘুমোয় মরে যায় ঘর বানায় কেন? অনন্ত মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। নিজের মৃত্যুর চেয়ে বেশি মনে হয় কতো পরিচিত, কতো আত্মীয়, কতো জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মারা যাবে, তাদের কবরে শুইয়ে ঘরে ফিরতে হবে। প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা কল্পনা করাও কতো কষ্টকর!

নির্জনে এসেছি বলে কতো ভয়, কতো জিজ্ঞাসা!

একদিন সকালবেলা। মোটেলের রিসেপশন রুমে বসে আছি। একটু পরে টড আসবে তার গাড়ি নিয়ে, আমাকে নিয়ে যাবে পত্রিকা অফিসে! মোটেলের ভারতীয় কর্মচারী অচেনা ভাষায় গুনগুন করে গান গাইছে। ভাষা অপরিচিত, কিন্তু সুরটা অতি চেনা। ধনধান্য পুষ্প ভরা গানের সুর।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি গানটা গাইছো, সেই যে– আমাদের দেশ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ।

সে বললো, না, আমি বলছি প্রভু তোমায় নমস্কার।

www.nagorikpathagar.com

আমি বললাম, শোনো, ঠিক একই সুরে একটা বাঙলা গান আছে। দি ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ ওয়েলথ বাট মাই কান্ট্রি ইজ দি মোস্ট বিউটিফুল কান্ট্রি ইন দি ওয়ার্ল্ড। সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভারতীয় কর্মচারীটি হাসলো। তাচ্ছিল্যের হাসি। তোমার দেশ মানে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কি পৃথিবীর সেরা দেশ হতে পারে! তুমি তো লাস ভেগাস যাওনি। তাই তোমার এ কথা মনে হচ্ছে। লাস ভেগাস হচ্ছে পৃথিবীর সেরা জায়গা।

লাস ভেগাস বিখ্যাত জুয়ার জন্য। এই ব্যাটা গর্দভ তার সঙ্গে তুলনা করছে বাংলাদেশের!

আমার মনে পড়তে লাগলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *আমার জন্মভূতি* নামের গানটি।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক-সকল দেশের সেরা;
ওযে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে- আমার জন্মভূমি।

বিশেষ করে ওই লাইনগুলো :

ভায়ের মায়ের এতো স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

সত্যি তো, আমার দেশের মতো আমার সমাজের মতো এমন স্নেহময় শুশ্রূষাময় সমাজ আর কোথায় পাওয়া যাবে? একজনের কষ্টের দিনে গোটা পরিবার আর কোথায় তার পাশে এসে দাঁড়াবে? মনে পড়ে, দেশে থাকতে ড. আতিউর রহমানের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আতিউর ভাই বলেছিলেন, আমাদের সমাজের এই শেয়ারিং আর কেয়ারিং একটা বড়ো দিক। সামাজিক উন্নয়নের নামে এই বন্ধনটুকু আমরা যেন ভেঙে না ফেলি। অতি খাঁটি কথা।

মোটেলের রিসেপশনে সকাল বেলাতেই আমার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে শুরু করলো। হু হু করে কান্না শুরু হলো। আমি কিছুতেই সেই কান্না থামাতে পারছি না। অশ্রুর সঙ্গে শুরু হলো শব্দ। যতোই মনে হয় *ভায়ের মায়ের এতো স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ–* ততোই উথলে ওঠে কান্না।

আমি কান্না গোপন করার চেষ্টা বাদ দিলাম। শুধু মনে মনে পুনর্বার বললাম– *আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।*

www.nagorikpathagar.com

জীবনের প্রথম বরফ

কলোর‍্যাডো স্প্রিংসে ঘর থেকে বেরিয়ে যদি তাকাতাম চারপাশে. চোখ ভরে উঠতো রঙে আর রঙে। এতো রঙ চারদিকে গাছে গাছে, পাতায় পাতায়। সবুজপাতা, হলুদ পাতা, লাল পাতা, কমলাপাতা– মনে হতো, কোনো আনন্দিত শিল্পী পরিকল্পনা করে রঙের বিচিত্র বিন্যাসে সাজিয়েছেন প্রকৃতিকে। ওক আর মেপল– কাব্যখ্যাত দুই গাছের রঙদার পাতা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দিগন্তে। প্রকৃতি ইউরোপ– আমেরিকাকে সম্পদশালীই কেবল করেনি, রূপের ঐশ্বর্যেও সাজিয়েছে ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো করে। কিন্তু এই আফসোস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ও ভাই আগুন লেগেছে বনে বনে– এ রকম বর্ণাঢ্য আয়োজন অল্প কিছুদিনই স্থায়ী হয় ওখানে। এ সব কিছুই fall-এর জন্য, পাতা ঝরার পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র।

পাতা ঝরে, ঝরতে থাকে; যেমন লিখেছেন রাইনের মারিয়া রিলকে– তার *হেমন্ত* কবিতায় :

পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, শূন্য থেকে ঝরে পড়ে যায়,
যেন দূর আকাশে বিশীর্ণ হলো অনেক বাগান;
এমন ভঙ্গিতে ঝরে, প্রত্যাখ্যানে যেন প্রতিশ্রুত।
আমরাও ঝরে যাই। এই হাত– তাও পড়ে ঝরে
দ্যাখো অন্য সকলেরে : সকলেই এর অংশীদার।

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

তখন পথ জুড়ে পাতা, ফুটপাথ জুড়ে পাতা, বাগান জুড়ে পাতা– ঝরা পাতা। এমন পতন দেখে সত্যি ভয় লাগে, মনে হয়– হাতের পাতা, পায়ের পাতাও ঝরে যাবে না তো! আর লেখার পাতা, বইয়ের পাতা, খাতার পাতা– সেসব তো ঝরবেই। ভয়ংকর সেই পাতা ঝরার আয়োজন!

তারপর একদিন বিকেল বেলা আকাশ ঘোলা; তাপমাত্রা কমে নেমে এসেছে হিমাঙ্কেরও নিচে– মোটেলের কক্ষে বেজে উঠলো টেলিফোন, ওপাড়ে জোসেফ– হ্যালো, আনিস, প্রস্তুত থেকো, আজ বরফ ঝরবে।

www.nagorikpathagar.com

বরফ! আকাশ থেকে! ঝরে ঝরে পড়বে! তুষারে ঢেকে যাবে চারদিক– শাদা বরফের বিস্তারে ডুবে যাবে সমস্ত চরাচর– ভাবতেই রোমাঞ্চ জাগলো।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দরজা খুলে তাকালাম বাইরে– বরফ ঝরছে, জীবনের প্রথম বরফ। ঠিক তুলোর মতো নয়, পেজা তুলোর যে বর্ণনা শুনে এসেছি বরফ প্রসঙ্গে, তেমন নয়– শিমুল তুলোর ঝরে পড়া এ জীবনে কম তো দেখিনি; তুলোর চেয়ে আরেকটু ছোট আকারে, আরেকটু কম ঘনবদ্ধ, বরফ নেমে আসছে আকাশ থেকে– অঝোরে।

সামনের সবুজ মাঠ শাদা হয়ে গেছে, দিগন্তের পাহাড় শাদা হয়ে গেছে, তবে আশ্চর্য, পিচঢালা সড়কটা এখনো কালো।

টড এলো গাড়ি নিয়ে, হাতে কফির পেয়ালা। গাড়ির বনেটে মাথায় বরফ জমে ঘন হয়ে আছে। *গেজেট টেলিগ্রাফ* অফিসে গেলাম। গাড়ি পার্কিং করে রেখে খোলা আকাশের নিচে বরফ মাথায় মাখতে মাখতে হেঁটে হেঁটে গেলাম অফিস ভবনে।

অফিসে মন বসে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরে। বরফ ঝরছে, ঝরছে।

সমস্ত রঙের উৎসব ঢেকে গেলো শাদা হিম শীতল বরফের চাদরে– যেন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শেষ, সম্পন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানও– কনে চলে গেছে শ্বশুরবাড়িতে, রিক্ত নিঃস্ব হয়ে পড়ে আছে বিয়ের বাড়ি; কেবল কেঁদে চলেছেন কনের মা।

আমেরিকান ফুটবল!

খেলাধুলো বিষয়টা বিনোদনের জন্য, অবসর কাটানোর জন্য। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– কেউ কেউ আছে, খেলে খায়, অর্থাৎ খেলাটাই তাদের জীবিকা, তাদের পেশা। তারো চেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো– কেউ কেউ বেঁচে থাকে খেলার ওপরে লিখে; ক্রীড়া সাংবাদিকতা হলো তাদের পেশা।

এ কথা বলে দেশে আমি আমার ক্রীড়ালেখক বন্ধু উৎপল শুভ্রকে ঘায়েল করার চেষ্টা করতাম।

কিন্তু তাই বলে ক্রীড়া বিষয়টা তো আর সত্যি সত্যি উপেক্ষা করার মতো কিছু নয়।

কলারাডো স্প্রিংসে এসে তাই আমি ঠিক করলাম স্টেডিয়ামে যাবো, ফুটবল খেলা দেখতে। ফুটবল বলতে আমেরিকানরা বোঝে অমেরিকান ফুটবল; আর আমাদের ফুটবলকে ওরা বলে সকার।

গেজেট টেলিগ্রামের স্পোর্টস রিপোর্টার স্টিভকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম স্টেডিয়াম অভিমুখে, উদ্দেশ্য আমেরিকান ফুটবল দেখা। সন্ধ্যার পরে খেলা। তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। স্টেডিয়াম উন্মুক্ত। শুধু প্রেসবক্স ছাদের নিচে। আমরা নিরাপদে প্রেসবক্সের কাচের আড়ালে বসে পড়লাম।

www.nagorikpathagar.com

ওটা ওদের হাইস্কুল টুর্নামেন্ট। হাইস্কুল মানে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। দুটো নামকরা স্কুলের খেলা হচ্ছে। ছেলেরা সব রাগবির সেই বিতিকিচ্ছিরি পোশাক পরে মাঠে নেমেছে। যেন নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন ই অলড্রিন চাঁদে নামছেন- এমনি পোশাক। মাথায় হেলমেট। ঘাড়ে মোটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ। একেকজনকে দেখাচ্ছে ষাঁড়ের মতো।

এদিকে খোলা আকাশের নিচে দুই দিকের গ্যালারিতে বসেছে দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। নিজেদের টিমকে প্রাণ খুলে সমর্থন দিচ্ছে তারা। স্টেডিয়াম এলাকা তামাক ও অ্যালকোহলমুক্ত। ছেলেমেয়েরা এই হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে নিতান্তই খালিমুখে খেলা দেখছে। কিন্তু তাদের উৎসাহের বিরাম নেই।

খেলা শুরু হলো। ডাবের মতো মোচাকৃতি বলটি ছুঁড়ে দিয়ে, কিংবা হাতে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। কার হাতে বল আছে, সেটা ওরা বুঝতে দিতে চায় না। একই দলের চার পাঁচজন এমন ভাব করে দৌড়াতে শুরু করে যেন প্রত্যেকের হাতেই আছে মহামূল্যবান বলটি। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা একে জড়িয়ে ধরছে, ওকে তাড়া করছে। খানিক পরে টের পাওয়া যায় কার কাছে বল। সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার দেহে। কি যে ভয়ংকর মারামারি, পাড়াপাড়ি।

খেলার নিয়মটা আসলে কি? স্টিভকে জিজ্ঞাসা করলাম। স্টিভ আমাকে খুব করে বোঝাতে লাগলো। জটিল বলে মনে হলো নিয়ম কানুন। আমি সেটা বোঝার চেষ্টা বাদ দিলাম।

আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল দুই দলের চিয়ার লিডারেরা। উভয় টিমের পক্ষ থেকে দুদল মেয়ে সুন্দর ইউনিফর্ম পরে মাঠের পার্শ্বরেখার পাশে নাচানাচি করছে। এদের কাজ হচ্ছে নিজেদের দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেয়া। তাদের হাতে রঙিন ঝালর। তারা গান গাইছে আর পুচ্ছ দুলিয়ে পিডি প্যারেড করছে। সেই নৃত্যপরা তরুণীদের সঙ্গে আছে বিশাল সাইজের দুটো করে কার্টুন। আমাদের কাছের দলটিতে কার্টুন দুটি বাঘের পোশাক পরা। দূরের দলে কার্টুন দুটি পরেছে পেঙ্গুইনের পোশাক। মানুষই পোশাক পরে সেজেছে কার্টুন।

আমি খেলা বাদ দিয়ে নাচ গান উপভোগ করতে শুরু করলাম। ব্যান্ড বাজছে। মেয়েরা নাচছে। কি মজা। এই চিয়ারলিডার দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারা এদেশে খুবই সম্মানের ব্যাপার। পলা আবদুল উঠে এসেছিলেন এমনি চিয়ারলিডার দল থেকে।

খেলার মেয়াদ আড়াই ঘণ্টা। আড়াই ঘণ্টা কি পুনরাবৃত্তিময় নৃত্য-গীত দেখে কাটানো যায়?

আমার হাই উঠতে লাগলো। এ দিকে স্টিভ লেকচার দিচ্ছে- সকার কোনো খেলা হলো? বেটাছেলের খেলা হলো ফুটবল।

অতিকষ্টে খেলা শেষ করলাম। স্টিভ এবার ছুটলো মাঠের দিকে দুদলের অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া জানতে। আমিও ছুটলাম তার পিছু পিছু। কি যে ঠাণ্ডা, বলে বোঝানো যাবে না। আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জমে যাবার যোগাড়!

www.nagorikpathagar.com

এই সুতীব্র শীতের মধ্যে বসে এতোগুলো ছেলেমেয়ে এই খেলা দেখলো কি করে!

অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টারে

কলার‍্যাডো স্প্রিংস মফস্বল শহর। এমনকি এটা রাজ্য-রাজধানী পর্যন্ত নয়। কিন্তু আমেরিকার দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এ শহরেই। এক. ইউএস এয়ারফোর্স একাডেমি। কলার‍্যাডো স্প্রিংসে গেলে কেউ না কেউ একটা পাহাড় দেখিয়ে ফিসফিস করে আপনার কানে কানে বলবেই, জানো, এই পাহাড়টার ভেতরে আছে একটা গোপন ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে খাবার-দাবার সব মজুত আছে। পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে আমেরিকার সামরিক নেতারা সেই পাহাড়ের নিচে আশ্রয় নেবেন। বাইরে এটম বোমা পড়লেও তারা থাকবেন অক্ষত। আর আমেরিকার এটম বোমাগুলো সব সাজিয়ে রাখা আছে ওখানে। বোতাম টিপলেই সেগুলো ছুটবে শত্রু- দেশ লক্ষ্য করে। এসব কথা সত্যি কিনা, আমি জানি না; কারণ আমার সুযোগ হয়নি সেই পাহাড়ি গুহায় ঢুকে সব কিছু চাক্ষুষ করা।

দ্বিতীয় যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে কলার‍্যাডো স্প্রিংসবাসী গর্ব করে, তা হলো অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টার। আমেরিকায় অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টার আছে চারটি- নিউ ইয়র্কের লেক প্লাসিডে, ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়োগেতে (গ্রীষ্মকালীন), মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কলার‍্যাডো স্প্রিংসে। এর মধ্যে হেডকোয়ার্টারটা কলার‍্যাডো স্প্রিংসে- আর ওই ট্রেনিং সেন্টারটি সব সময়ের জন্য, সব খেলার জন্য উপযুক্ত। এটাই আদি, এটাই বড়, এটাই আসল। কলার‍্যাডোবাসী গর্ব করবে না কেন? অলিম্পিক স্বপ্ন যে সমস্ত আমেরিকার দুচোখ ভরা স্বপ্ন। এথলিটরা তাদের স্বপ্নের নায়ক।

কলার‍্যাডো স্প্রিংস শহরটা সমুদ্রতল থেকে ৭০০০ ফুট উঁচুতে। বায়ুর চাপ কম। এখানে দম রাখতে পারলে অন্য জায়গায় দম রাখা সহজ হবে- সম্ভবত এই শহরে অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টার বানানোর এটাও একটা কারণ।

এতো দূরে এসে এটম বোমার সুইচ যদি নাও দেখতে পাই, অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টার কি দেখতে পাবো না? কোনো ব্যাপারই নয়, কারণ আমেরিকার এ ধরনের যেকোনো প্রতিষ্ঠানই দর্শনার্থীদের জন্য সপ্তাহে সাত দিন খোলা থাকে। আমি শুধু মুখ দিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, আর *গেজেট টেলিগ্রাফ* পত্রিকার এক স্পোর্টস রিপোর্টার আমাকে নিয়ে ছুটলো অলিম্পিক সেন্টারের দিকে।

সেদিন খুব করে বরফ পড়ছে। পুরো অলিম্পিক সেন্টার তুষারে ছেয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে একজন গাইড দেয়া হলো। একটা ২০ / ২২ বছরের ছেলে। সে এখানে এসেছে ফিনল্যান্ড থেকে। অলিম্পিক জার্নালিজম বিষয়ে ছয় মাসের ট্রেনিং

www.nagorikpathagar.com

নিতে। সে বললো, আমি এসেছি উত্তর গোলার্ধ থেকে– মেরুর দেশ থেকে; এই সব তুষার আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। চলো।

বরফপড়া তুচ্ছ করে আমরা এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিংয়ে ঢুঁ মারতে লাগলাম।

এই ট্রেনিং সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে। এক সঙ্গে ৬০০ এথলিট ও কোচের থাকা-খাওয়া-বিনোদনের ব্যবস্থা আছে এখানে।

আমরা ঢুকলাম আন্তর্জাতিক সাঁতার কেন্দ্রে। এখানে পানি নিয়ে গবেষণাও হয়। এদের সুইমিং পুলে যেমন নিঃস্পন্দ পানির ব্যবস্থা আছে, তেমনি ২.৫ মিটার / সেঃ গতিপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। একইভাবে বায়ুর চাপের বদল ঘটানো যায়– সমুদ্রতল থেকে শুরু করে ৭০০০ ফুট উঁচুতে বায়ুর চাপ যেভাবে বদলে যাবে, তেমনি। আমি যখন এই সুইমিংপুলে ঢুকলাম, তখন এলাকাটা ফাঁকা, নীল পানি স্থির! গেলাম অলিম্পিক শুটিং সেন্টারে। এটি পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে বড়ো শুটিং সেন্টার।

জিমন্যাশিয়ামে ঢুকলাম। ভারোত্তলনের কক্ষে বিপুল বপু লোকজন প্র্যাকটিস করছে। একটা ফাঁকা ঘরে গেলাম। ওজন নেবার মেশিনের কাছে দুজন লোক। একজন অবলীলায় সব কাপড়চোপড় খুলে ওজন নিতে উঠে গেলো। যেন কিছুই দেখিনি এমনি ভাব করে কক্ষ ত্যাগ করলাম।

বাইরে দৌড়ের ট্র্যাক। বরফে সবকিছু ঢেকে আছে।

কলারাড়ো স্প্রিংসের এই ট্রেনিং সেন্টারে এথলিটদের ক্রীড়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ ছাড়াও দেয়া হয় স্বাস্থ্য সেবা– এদের জন্য আছে দৃষ্টিশক্তি কর্মসূচি, দন্তস্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি, পুষ্টিসেবা কর্মসূচি, আছে স্বাস্থ্য গবেষণা কর্মসূচি, শরীরচর্চা শিক্ষা, মানসিক প্রশিক্ষণ, কৌশল মূল্যায়ন আর প্রযুক্তিগত সব ধরনের সুবিধা।

সব কিছু সব ধরনের সুবিধা।

সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখে আমরা ফিরলাম রিসেপশন বিল্ডিঙে। সেখানে একটা ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহে আমাদের দেখানো হলো একটা ভিডিও ছবি। এই ছবিটা মূলত ইউএস অলিম্পিক কমিটির জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দাতাদের মন গলানোর লক্ষ্য থেকে তৈরি। যে কোনো দর্শকের মন এ ছবি দেখলে গলবেই। খুব সাধারণভাবে বলা ঘটনা। এই যেমন– একজন এথলিটের দৌড়ে সোনা পাবার কথা। কিন্তু দৌড়াতে গিয়ে রগে টান পড়লো– তিনি উল্টে পড়ে গেলেন। তার বাবা বললেন, এবার পাওনি, তাতে কি– পরের বছর পাবে।

চার বছর অপেক্ষা। না, এবার হিটেই আউট। বাবা মারা গেলেন। আরো চার বছর পর এই এথলিটটি হিটে টিকলেন।

ফাইনাল প্রতিযোগিতা। গ্যালারিতে বসে আছেন এথলিটের মা। তার হাতে তার মৃত স্বামীর ছবি। এথলিটটি দৌড়াবার আগে একবার তাকিয়ে নিল বাবার ছবির দিকে। দৌড় শুরু হলো। দৌড়। দৌড়। দৌড়। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা।

www.nagorikpathagar.com

প্রথম হলেন তিনি। ৮ বছর পর। দুলে উঠলো জাতীয় পতাকা। বেজে উঠলো জাতীয় সঙ্গীত। মায়ের চোখে অশ্রু।

সেন্টিমেন্টাল বিষয়। এই সব সংক্রামক আবেগ সহজেই কাতর করে ফেলে দাতাদের। তারা টাকার থলে নিয়ে এগিয়ে আসে ইউএস অলিম্পিক কমিটিকে সাহায্য করতে। ছবিটা শেষ হবার পর আমার ফিনল্যান্ডিয়ান গাইড বললো– এই ছবি আমি যতোবার দেখি, ততোবার কাঁদি।

ইউ এস অলিম্পিক কমিটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ড. টি ওয়াকার। তার বয়স ৭৭ বছর। ৩০ বছর ধরে তিনি জড়িত অলিম্পিক আন্দোলনে। ১৯৯২ সালে ৪ বছরের জন্য এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর ভোটে। আটলান্টা অলিম্পিক শেষ হলে তার মেয়াদ ফুরাবে।

ত্রিশ বছর ধরে অলিম্পিকের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেছেন তিনি, পালন করেছেন নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তার আগে ছিলেন কোচ। ৭৭ জন আমেরিকান এথলিটকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি, যার মধ্যে ৪০ জন ছিল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। এই লোক যখন অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে ভোটে নির্বাচিত হন, তখন সেটা যথার্থ বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে যখন সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীকে বসানো হয়, তখন তাকে কি বলা যাবে? তাকে বলতে হবে দলীয়করণ। বলতে হবে– শুন হ মানুষ ভাই, সবার ওপরে তৈল সত্য তাহার উপরে নাই।

এক মাস পরে বাঙালির মুখ!

কলার‍্যাডো স্প্রিংসে ছিলাম চার সপ্তাহ। প্রথম ২৫ দিনে আমি কোনো বাঙালির দেখা পাইনি। কি যে কাতর ছিলাম একটা বাঙালির মুখ দেখার জন্য। কানাডা থেকে টেলিফোনে বড়ো ভাই পরামর্শ দিলেন, টেলিফোন গাইড খুলে বাঙালি নাম খোঁজ। পাবি। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম। একটা দুটো নাম বাঙালি বাঙালি ঠেকে, ফোন করি, দুয়ে দুয়ে চার আর মেলে না।

বাঙলা ভাষায় কথা অবশ্য তবু বলা হয়। সেটা হয় টেলিফোনে। আমার বন্ধুরা যে যেখানে আছে, ফোন করে। ফোনে তারা জানতে চায় দেশের খবর। একেক জন চার পাঁচ বছর হলো দেশ ছাড়া। কারো কারো বিশাল দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনের রিসিভারে তীব্রভাবে আছড়ে পড়ে। দেশ! দেশ!

একটা বাঙালি মুখ দেখার জন্য আমি যখন ব্যাকুল প্রায়, ঠিক তখনই আমি একই সঙ্গে পেয়ে গেলাম দুটি খবর। আমাদের মোটেলের ভারতীয় কর্মচারী জানালো, একজন বাঙালি বন্ধু আছে আমাদের। সে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, তার নাম রানা। আমি তাকে তোমার কথা বলেছি, সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

www.nagorikpathagar.com

অন্যদিকে আমার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু জসীম ভুঁইয়ার কাছ থেকে ফোনে জানতে পেলাম আমাদের আরেক ক্লাসমেট মিতুল থাকে ডেনভারে- এই শহর থেকে ৭০ মাইল দূরে। গাড়িতে গেলে এক ঘণ্টা সোয়া ঘণ্টার পথ।

প্রথমে বলি রানার কথা। রাত্রিবেলা মোটেলে ফোন এলো, হ্যালো, ভাই, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন নাকি, আমার নাম রানা। থাকেন, আমি আসছি।

রাত্রি নটার দিকে একটা চমৎকার শাদা গাড়ি নিয়ে রানা হাজির হলেন। প্রথম দেখায় তাকে খুব ইমপ্রেসিভ মনে হলো না। তার মাথার চুল কমে যাচ্ছে, চুল রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে সম্ভবত তিনি ন্যাড়া করেছিলেন- সেই চুল এখনো বড়ো হয়ে সারতে পারেনি। পরনের কাপড়চোপড়ে বঙ্গবাজার বঙ্গবাজার ভাব।

স্বাস্থ্যের মধ্যে আলগা লাবণ্য থাকলে ত্বক কিছুটা মসৃণ দেখায়। তার চেহারায় সেটাও খুব যে আছে বলা যায় না।

রাত্রি নয়টা কিন্তু কলারাড্যাডো স্প্রিংসের জন্য মধ্যরাত। রানা বললেন, চলুন, আমার এক বাঙালি বন্ধু থাকে এখানে- সপত্নীক, তার বাসায় যাই।

আমি অসংকোচে অবলীলায় এক অপরিচিত লোকের গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি শহর ছেড়ে অন্ধকার রাস্তায় নেমে পড়লো। রানা বললেন, রাস্তা ভুল করেছি। তিনি চক্কর খেতে লাগলেন।

সেই অন্ধকার দূর অপরিচিত পথেও আমার বিন্দুমাত্র ভয় হলো না। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। আমার এই ভরসার উৎস আমার পাশে যিনি আছেন তিনি বাঙালি।

রানা সাহেব এই দেশে পরিচিত মোহাম্মদ বলে। তার বর্তমান কর্মস্থল ক্যালিফোর্নিয়া। ভ্যাগাবন্ড ইনস নামে এক হোটেলের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার তিনি। চাকরি বোধহয় ভালোই করেন, কারণ তার গাড়িটা খুবই দামি বলে মনে হলো। রানার বাড়ি বগুড়ার শেরপুরে।

এই লোক, প্রথম দর্শনে যাকে আমার অসাধারণ মনে হয়নি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে তিনি তেমন সাধারণ নন।

প্রথম কথা, তার পোশাকের বঙ্গবাজার ভাবের কারণ ওগুলো বাংলাদেশী গার্মেন্টসের তৈরি। তিনি কিনেছেন আমেরিকার মার্কেট চষে। যখন তিনি কোনো কিছু কেনেন, চেষ্টা করেন যেন মেড ইন বাংলাদেশ হয়। তাতে যদি দাম বেশিও পড়ে, তবু কোনো ক্ষতি নেই। ডলারের একটা অংশ তো বাংলাদেশে গেছে। তার মুখ থেকে এই তথ্য পেয়ে আমি অভিভূত হতে শুরু করলাম।

দ্বিতীয় কথা, ঢাকা কৃষি কলেজে পড়তো তার ছোট ভাই। কিছুদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় ভাইটি মারা গেছে। ভাইয়ের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তিনি বেশ কিছু কাজ করছেন।

এর মধ্যে একটা হলো- শেরপুরে তিনি একটা লাইব্রেরি করেছেন ভাইয়ের নামে আরেকটা কাজ করছেন- গরিব মানুষ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সে জন্য

www.nagorikpathagar.com

তিনি তাদের রিকশা কিনে দেন। সেটা একেবারে দান নয়, দিনে দিনে রিকশাচালক আয় থেকে দায় শোধ করে দেবে, এরপরে রিকশাটা হবে তার।

রানার সঙ্গে গেলাম এক বাঙালি দম্পতির বাসায়। লিও ব্রিজিতা দুজনেই বাঙালি, খ্রিস্টান। ব্রিজিতা গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে মাস্টার্স পাস করেছেন। লিও এ দেশে এসেছেন অনেক দিন হলো। এখন কাজ করেন ইউএস আর্মিতে। গ্রীনকার্ড থাকলে মার্কিন দেশে সৈনিকের কাজও করা যায়।

লিও ছটফটে স্বভাবের। কথা বলেন বেশি, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে। অস্থির আর প্রাণবন্ত। বললেন, ভাই, এখানে এসে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। এখন মোটামুটি ভালো আছি। ব্রিজিত সন্তান-সম্ভবা, ডিসেম্বরে তাদের বাচ্চা হবার কথা। (এতো দিনে নিশ্চয়ই তারা পেয়েছেন এক ফুটফুটে সন্তান)।

ব্রিজিতার দেখাশোনার জন্য লিওর মা আমেরিকা আসছেন।

এই এক সাধারণ রূপ আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের– স্বামী কাজ করে, স্ত্রীকে একা ঘরে থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুজনেই কাজ করে। তারপর স্ত্রীর কোলে আসে সন্তান। ওই সময়টায় দেশে থাকলে একটা মেয়ে মায়ের-শ্বাশুড়ির-বোনের কতো সেবা শুশ্রূষা-যত্ন পেতো, সে সব থেকে বঞ্চিত থাকে প্রবাসী মেয়েরা। অনেক সময়, মা বা শাশুড়ি নাতি-নাতনির মুখ দেখার জন্য কাছে আসে বটে, সেও দুতিন মাসের জন্য।

ব্রিজিতা বললেন, কি খাবেন, ভাত না পোলাও?

আমি বললাম, কতো দিন ভাতের মুখি দেখি না। ভাত খাবো। কিন্তু একটা শর্ত। আমাকে হাত দিয়ে মেখে ডাল ভাত খেতে দিতে হবে।

তাই হলো। অমন শরীর নিয়েও ব্রিজিতা ভাত রাঁধলেন। লিও বানালেন শশার সালাদ। গরুর মাংস, ডাল, কাবাব, শাক আর গরম গরম ভাত। অন্য তিনজন খেলো চামচ দিয়ে, আমি হাত দিয়ে। সেই খাওয়া আমার জীবনে স্মরণীয় ডিনার হয়ে থাকবে। এক অচেনা পরিবারে গিয়ে প্রথম পরিচয়ের শেষেই খাওয়া। কিন্তু কি আন্তরিকতা!

লিও কিন্তু মনমানসিকতায় রানার উল্টো। লিও দেশে ফিরতে চান না। দেশের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই– এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চিত। রানা আবার দেশে ফিরতে বদ্ধপরিকর। আর কয়েক বছর পরেই দেশে ফিরবেন।

খেতে খেতে মনে পড়লো, ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা একটা ক্যাফেটেরিয়ায় দুপুরে খেতে গিয়েছিলাম সবাই মিলে। থরে থরে খাবার সাজানো, নিজে তুলে নিয়ে খেতে হবে। এটা ওটা খাবারের ফাঁকে দেখলাম ভাত।

প্লেট ভরে তুলে নিলাম। ওজন করে দাম দিয়ে খেতে গেছি– মুখে খানিকটা ভাত দিতেই কান্না চলে এলো। ভাতের ভেতরে মদ দেয়া। এমন বিতিকিচ্ছিরি স্বাদ। অভুক্ত পেটে উঠে আসতে হলো।

www.nagorikpathagar.com

আজ ব্রিজিতার কল্যাণে প্রায় একমাস পর ভাত খেতে পাচ্ছি। নিজের শরীরের কষ্টকে কষ্ট মনে না করে হাসিমুখে আতিথেয়তা করতে সম্ভবত কেবল বাঙালি মেয়েরাই পারে!

আর ভাত! ভাতের বন্দনা করে একটা মহাকাব্য বোধ করি লেখা যায়। বাংলা কবিতায় মাতৃভাষার বন্দনা আছে, মা ও মাতৃভূমির বন্দনা আছে; কিন্তু ভাতের বিকল্পহীনতা নিয়ে তেমন কোনো কাব্য হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। ভাতকে জুঁইফুলের চেয়েও সুন্দর বলেছেন মহাদেব সাহা, সে ক্ষুধিত ও খাদ্যের রাজনীতি বোঝাতে। দুধভাতের কথা বলা হয়েছে বহুবার, সেও ভালো থাকা বোঝাতে। নিরেট ভেতো বাঙালির ভাত নিয়ে একটা কবিতা অন্তত লিখিত হওয়া উচিত। আল মাহমুদের *ভাতের গন্ধ নাকে এসে লাগে ভাতের গন্ধ, চোখ মেলতেই চারদিকে দেখি দুয়ার বন্ধ* দিয়েও তো আমি আমার বর্তমান অনুভূতি বোঝাতে পারছি না।

আহা অন্ন, আহা মাতৃস্তন্য আমার!

www.nagorikpathagar.com

ও জে সিম্পসন, কালো-সাদা এবং ড. ইউনূস

হোয়াইট হাউসের উত্তর গেটে পুলিশ পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর ১টা। ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার। কাঁচের ঘর থেকে পুলিশ অনুরোধ করলো ১টা মিনিট দাঁড়াতে। অধীর আগ্রহে রেডিও শুনছে তারা। এই সেই মাহেন্দ্র (!) ক্ষণ। ও জে সিম্পসন জোড়াখুনের বিচারের রায় ঘোষণার মুহূর্ত। এখন তারা আর অন্য কোনো কিছু করতেই রাজি নয়। শুধু কি পুলিশ! সম্ভবত ঐ মুহূর্তটিতে গোটা আমেরিকার অন্য কোনো কাজ ছিল না।

দুপুর পৌনে ২টার দিকে হোয়াইট হাউসের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিঙে প্রেসিডেন্টের নানা কাজের বর্ণনা দিলেন একজন মুখপাত্র। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাংবাদিক এলেন পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরি (!) বিষয়টি নিয়ে।

: প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কি সিম্পসন মামলার রায় শুনেছেন?

: হ্যাঁ, শুনেছেন।

: তিনি কি নিজে টিভিতে রায় শুনেছেন?

: হ্যাঁ, তিনি ১টা বাজার ২ মিনিট আগে আসেন। টিভিতে রায় ঘোষণা হয়। তিনি শোনেন।

: তিনি আশ্চর্য হয়েছেন?

: না, তিনি আশ্চর্য হননি।

: তিনি কি তখন বসেছিলেন, নাকি দাঁড়িয়েছিলেন। (এ প্রশ্ন করার পেছনে উদ্দেশ্য সম্ভবত বিল ক্লিনটন টেনশনে ছিলেন কিনা)

: তিনি কি কোনো মন্তব্য করেছেন?

: হ্যাঁ, তিনি একটা মেসেজ দিয়েছেন। এতে তিনি বলেন, বিচারকে তার নিজের মতো চলতে দিতে হবে তবে নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য আমি দুঃখিত।' (সার্থক ব্যালান্স!) মুখপাত্রটি এ সময় একটা কাগজ দেখিয়ে বলেন– এই যে প্রেসিডেন্টের নিজ হাতে লেখা বাণী।

এই হচ্ছে আমেরিকায় সিম্পসন মামলা নিয়ে হুজুগের নমুনা। প্রেসিডেন্টকে নিজ হাতে বাণী লিখতে হয়েছে! অফিস-আদালতে কাজ হয়নি।

www.nagorikpathagar.com

সবাই কাজ ফেলে টিভির সামনে দাঁড়িয়েছে। এমনকি প্রেসিডেন্টও। একটা রাজ্যে সাইক্লোনে ২৫ জন নিঁখোজ তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, একটা বিচার নিয়ে সর্বস্বপণ।

মামলার রায়ে ও জে সিম্পসনকে নির্দোষ ঘোষণা করার পরও এই নিয়ে নাটক শেষ হয়নি। ক্লাইমেক্স পার হয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালের ১২ জুন স্ত্রী নিকোল ব্রাউন সিম্পসন ও তার বন্ধু রোনাল্ড এল, গোল্ডম্যানকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হলেও এখানকার টিভিগুলো ফুটবল বাদ দিয়ে আমেরিকান ফুটবল তারকা ও জে সিম্পসনের গ্রেপ্তারের দৃশ্য সরাসরি প্রচার করে। এরপর শুরু হয় নিত্যদিনের বিচার দৃশ্য প্রচার। বাংলাদেশের দর্শকও সিএনএনের বদৌলতে তা দেখেছেন।

ভার্জিনিয়ার 'সেন্টার ফর ফরেন জার্নালিস্টস'-এ কর্মরত তরুণী স্কাটে'র মতে, আমেরিকানরা সেক্স স্ক্যান্ডাল, ক্রাইম আর ফুটবল (আমেরিকান ফুটবল) নিয়ে মত্ত সিম্পসন মামলায় এ সবই ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি প্রসঙ্গ– বর্ণ ও বর্ণবৈষম্য।

২ তারিখে যখন জুরিরা ঐকমত্যে পৌঁছেন এবং পরদিন বেলা ১টায় ঘোষণার জন্য রায় খামবন্দি করেন, তার আগে থেকেই কথা উঠেছে। মার্কিন মিডিয়া ধারণা করেছিল– সিম্পসনকে দোষী বলে রায় দেওয়া হবে। ওয়াশিংটন পোস্ট মন্তব্য করে– তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য জুরিরা তড়িঘড়ি একমত হয়েছেন। লস এঞ্জেলসে দাঙ্গার আশঙ্কায় পুলিশি প্রহরা বাড়ানো হয়। ইতিপূর্বে জরিপে দেখা গিয়েছিল, বেশিরভাগ সাদা সিম্পসনকে দোষী মনে করে, বেশির ভাগ কালো মনে করে সিম্পসন নির্দোষ। বিচারের রায় ঘোষিত হওয়ার পরও একই প্রতিক্রিয়া– সাদারা অখুশি, কালোরা খুশি। উল্লেখ্য, ওয়াশিংটন পোস্ট ৩ তারিখে ১২ সদস্যের জুরি বোর্ডের পরিচয় দিয়েছে– ৯ জন কালো, ২ জন সাদা, ১ জন হিস্পানি। ওয়াশিংটন পোস্ট ৩ তারিখ বিকেলে টেলিগ্রাম বের করেছে রায় নিয়ে।

সংবাদভিত্তিক টিভিগুলো এখন ২৪ ঘণ্টা ও জে সিম্পসন মামলার রায় নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। প্রচার করছে মন্তব্য। বেরিয়ে আসছে আমেরিকানদের বর্ণবিভক্তি। ক্লিনটন যদিও তার বাণীতে বলেছেন, 'আমরা সবাই এক থাকতে চাই'– তবু সত্য এই যে সভ্যতা এখনো ততোটা সভ্য হয়ে ওঠেনি।

লুই ফারাখানের মিলিয়ন ম্যান মার্চ

প্রায় ৪ লাখ কালো মানুষের পদচারণায় জেগে উঠেছিল ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল হিলের সবুজ চত্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বড়ো কৃষ্ণ সমাবেশে যোগ দিয়েছিল কালো মানুষেরা, সোমবার,১৬ অক্টোবর। 'নেশন অফ ইসলাম' নেতা লুই ফারাখানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় এ নিযুত মানব

www.nagorikpathagar.com

সমাবেশ– 'মিলিয়ন ম্যান মার্চ'। প্রায় এক বছর ধরে প্রচারণার মাধ্যমে ১৬ অক্টোবরের এ দিনটিতে আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত ও দায়িত্বের পবিত্র দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়। এ দিনটিকে ঘোষণা করা হয় নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য দায়িত্ববান হওয়ার প্রতিজ্ঞা করার দিন বলে। প্রথমে এ কর্মসূচির সাফল্য নিয়ে দ্বিধা ছিল। কারণ বেশিরভাগ আমেরিকানের কাছে ফারাখান ও 'নেশন অফ ইসলাম' বিতর্কিত। ফারাখান মার্কিন সমাজে শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষী, ইহুদিবিদ্বেষী বলে সাধারণভাবে নিন্দিত। এ মাসের শুরুতেই মার্কিন সিনেট ৯৭.০ ভোটে ফারাখানের এক শিষ্যের ইহুদিবিদ্বেষী উক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছে। কংগ্রেসের কালো সদস্যদের অনানুষ্ঠানিক গ্রুপটিও কালো মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছে। 'কালো মুসলিম' ও মুসলিমদের মধ্যেও পার্থক্য মেলা। 'কালো মুসলিমরা' আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাস করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বিশ্বাস করে যে, শ্বেতাঙ্গ মাত্রই পাপী। চিরাচরিত মুসলমানরা ইসলামের সাম্যের নীতি থেকে সরে আসার জন্য 'কালো মুসলিম'দের সমালোচনা করে থাকে। 'নেশন অফ ইসলাম' ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এর বর্তমান নেতা ফারাখান (৬২) প্রায় কুড়ি বছর আগে এ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে চলে আসেন এবং নিজস্ব ধরনের ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে এটিকে পরিণত করেন। নিজস্ব কায়দায় ধর্ম পালনের বাইরে মাদক মুক্তি, অপরাধ মুক্তি ধরনের সামাজিক কর্মসূচির কারণে 'নেশন অফ ইসলাম' কালো সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এ সংগঠনটি আর্থিকভাবে খুবই স্বচ্ছল, আয়ের নিজস্ব বাণিজ্যিক উৎস আছে এদের; আছে রেস্তরাঁ, কাপড়, সাবান, প্রসাধন ব্যবসা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, লিবিয়ার গাদ্দাফী এদের ৫০ লাখ ডলার সুদমুক্ত ঋণ দিয়েছে রেস্তরাঁ কমপ্লেক্স তৈরির জন্য। বর্তমানে এদের সদস্য সংখ্যা ২ লাখের মতো।

রোববার রাত থেকেই ট্রেনে-বাসে-প্লেনে-গাড়িতে করে মানুষ আসতে শুরু করে ওয়াশিংটনে। 'আল্লাহু আকবার' 'ঈশ্বর মহান' স্লোগানে কম্পিত হতে থাকে বাতাস। সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান নৃত্য-গীত পাশেই ব্যানার জেসাস ইজ লর্ড– 'যিশুই প্রভু'। বহু শীর্ষস্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠনের বয়কট সত্ত্বেও সাধারণভাবে কালোরা আসতে থাকে এ মহাসমাবেশে। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর মন্তব্য ছিল– আমরা ফারাখানের জন্য আসিনি, এসেছি মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কালো মানুষদের ভালোর আশায়।

এদিকে সোমবার সকালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণসমস্যা নিয়ে এক বক্তৃতায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বলেন, "জাতিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার আগেই সাদা-কালো উভয়কেই বর্ণবিদ্বেষ ঝেড়েমুছে ফেলতে হবে।" তিনি কৃষ্ণাঙ্গ মহাসমাবেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, "তাদেরকে পরিবারের জন্য ও নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।" ফারাখানের নাম না নিয়ে ক্লিনটন বলেন, "নিযুত মানুষ ব্যক্তিগত দায়িত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছে– এটা সঠিক, তারা কোনো ব্যক্তি মানুষের বিভেদ ও বিদ্বেষপরায়ণতার পক্ষে দাঁড়ায়নি।" এর জবাব দেন ফারাখান লাখো মানুষের সামনে

www.nagorikpathagar.com

তাঁর ২ ঘণ্টার বক্তৃতায়। তিনি বলেন, "আমেরিকাকে আমরা ছিন্নভিন্ন করছি না, আমেরিকা নিজেই নিজেকে টুকরা টুকরা করছে। আমি আপনাকে বলছি, মি. প্রেসিডেন্ট, আমি বিদ্বেষ ভরা ব্যক্তি নই।" তিনি কালোদের উদ্দেশ্যে বলেন, "নিজেদের ঠিক করুন, কালো মানুষেরা, জগৎ আপনাদের সম্মান করবে।"

ওজে সিম্পসন বিচারপর্বের মধ্য দিয়ে কালো-সাদা বিভক্তিটা মার্কিন সমাজে খুব দগদগে হয়ে দেখা দিয়েছে। সবাই এটাকে এখন অগোপন ক্ষত হিসেবে দেখছে।

একজন 'কালো মুসলিম'নেতার ডাকে এ সমাবেশে লাখ লাখ মানুষের যোগদানের পেছনে আছে সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্দশা। পরিসংখ্যানে দেখা যায় : কৃষ্ণাঙ্গরা আমেরিকার জনসংখ্যার ৮ ভাগের একভাগ, কিন্তু যেখানে এক জন সাদা খুন হয়, সেখানে কালো খুন হয় ৮ জন। কলেজে যখন পড়ে মাত্র একজন কৃষ্ণাঙ্গ, তখন কারাগারে আছে হাজার জন। ২০ বছরের মধ্যেই এক-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণাঙ্গ জেলে যায় বা হুলিয়াপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য কালো পুরুষের তুলনায় কালো নারীদের অবস্থা কিছুটা ভালো। এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের প্রতি নিজেদের আবেদন জোরদার করতেই আসলে দলে দলে কালোরা সমবেত হয়েছে ওয়াশিংটনে। অবশ্য শুধু পুরুষদের জন্য এ সমাবেশ হওয়ায় অনেক মেয়ে ক্ষুব্ধ।

কলার‍্যাডো স্প্রিংস-এর মিডিয়া রিসার্চ সেন্টারের কৃষ্ণাঙ্গী তানিয়া বেরের মতে– একদিকে যেমন এটাকে কালো বর্ণবাদী ও লিঙ্গবিদ্বেষী সমাবেশ মনে হয়, অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের দুর্দশা দেখলে এ ধরনের সমাবেশের আয়োজনকে সঠিক বলেও মনে হয়।

'ড. ইউনূস : সেইন্ট ফর দ্য পুওর'

ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের সম্মেলন

৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে ওয়াশিংটন ডিসি ডালাস বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন স্বজনহীন মনে হচ্ছিল, হঠাৎ পাশে আরেকটা নন-ইউএস লাইনের সামনে দেখি- সেই বিখ্যাত গ্রামীণ চেকের ফতুয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূস দাঁড়িয়ে।

সেদিন থেকে পরবর্তী একটা সপ্তাহ তৃতীয় বার্ষিক বিশ্বব্যাংক কনফারেন্স নগরী ওয়াশিংটন ডিসিতে কতোবার ড. ইউনূস ও তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের কথা শুনতে হয়েছে, ইয়ত্তা নেই। পোল্যান্ড থেকে আসা সাংবাদিক সংগঠক লেজবিয়েটা ক্রজনভস্কার ভাষায়, 'ওহ, ড. ইউনূস? শুনেছি তিনি নাকি সেইন্ট ফর দ্য পুওর' অ্যাসোসিয়েশন ফর ফরেন করসপনডেন্টসের সভাপতি আব্দুস সালাম। তিনি লেবাননি। তাঁর স্ত্রীও ও পুরুষের আমেরিকান, এসেছেন লেবানন থেকে। গেনেট বিল্ডিংয়ের ২৪ তলার ছাদে ফ্রিডম ফোরামের পার্টিতে পরিচয় এই দম্পতির সঙ্গে। মিসেস সালাম বললেন হ্যাঁ, ইউনূস, কি যে ভালো তার আইডিয়া। সর্বত্র হওয়া

www.nagorikpathagar.com

প্রয়োজন এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। আর দেখো, কি সিম্পল লোকটা, কতো সাধারণ।

অক্টোবর ৪ থেকে ৬ বিশ্বব্যাংক সম্মেলন হলো এখানে ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে। আমাদের পরিদর্শক বিদেশী সাংবাদিক দলটির দায়িত্ব পড়েছিল বিশ্বব্যাংকের বহির্সম্পর্ক অফিসার সারওয়াত হোসেন-এর ওপরে। সারওয়াত হায়দ্রাবাদের ছেলে। জানতে চাইলেন, ড. ইউনূস আছেন, দেখা হয়েছে? ৪ অক্টোবর বিশ্বব্যাংক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে সমাধানের জন্য প্রাইভেট সেক্টর নেতৃত্ব শীর্ষক আলোচনায় অন্যতম বক্তা ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ৫ অক্টোবর সকালে বিশ্বব্যাংক ভবন কক্ষ নং ডিসি-১-৮০০ তে অনুষ্ঠিত হলো-আঞ্চলিক প্রবণতা ও অগ্রাধিকার : ,এশিয়া ও প্যাসিফিক শীর্ষক আলোচনা। আলোচকদের মধ্যে একজন ছিলেন কাজী জালাল, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের। জালাল তার বক্তব্য শেষ করলেন তার স্বদেশী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। ৫ অক্টোবর ছিল সফররত সাংবাদিকদের দুটো দলের জন্য বিশ্বব্যাংকের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিদের ঘরোয়া বৈঠক। এতে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট অফিসের সিনিয়র কর্মকর্তা এলকিন চাপাররো এ কথা সে কথা বলতে বলতে এলেন গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গে। জানালেন ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে উপকৃত হচ্ছে গরিবেরা। ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া পাবলিক এফেয়ার্স কর্মকর্তা পল মিচেল তার আলোচনায় বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের নিম্নগতি ইত্যাদি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক চিন্তিত কিনা– এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, আবার না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো থাকুক– এটা আমরা চাই। কিন্তু আমাদের সেখানে করার তেমন কিছু নেই।' এই তাঁর মূল কথা। প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট করতেই জানালেন সোমবারে (৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ নিয়ে আলাদা আলোচনা হবে। এবার বিশ্বব্যাংক সম্মেলনের স্লোগান ছিল পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের সহযোগিতায় বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সিজিএপি বা কনসাল্টেনসি গ্রুপ এসিস্ট দ্য পুরেস্টস। এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ড. ইউনূস। নানা সূত্র থেকে এই গ্রুপ ইতিমধ্যে আড়াইশ মিলিয়ন ডলারের তহবিল যোগাড় করেছে।

৭ অক্টোবর ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ডিসি ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে তাঁর মন্তব্য চাইলে ড. ইউনূস বলেন : আমরা বহুদিন থেকে বলেছি, সারা বিশ্বের দারিদ্র্যের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দায়ী, তার পরিবর্তন করতে হবে। এতোদিন কেউ আমাদের কথা শুনতো না, এখন শুনছে। সিজিএপি করেছে। আনন্দ লাগছে। তবে এবার সময় হয়েছে বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরেই পরিবর্তনের। বিশ্বঅর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হবে যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বদল করি।

www.nagorikpathagar.com

১৪ হাজার ফুট পর্বতে আরোহণ

ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউএসএটুডে পত্রিকা আমাদের জন্য একটা ডিনার পার্টির আয়োজন করেছিল। আগেই বলেছি, ওই ডিনার পার্টিতে আমার ডানপাশে বসেছিল ইউএস টুডের তরুণী রিপোর্টার লিণ্ডা। আমরা ১২ জন আমেরিকার ১২টি অঞ্চলে যাচ্ছি সংবাদপত্র কার্যালয় পরিদর্শনে। কেউ যাচ্ছে নিউঅরলিন্স, কেউ টেক্সাস, কেউ নিউ জার্সি। কে কোথায় যাচ্ছে জানার পর লিণ্ডা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?' 'কলার‍্যাডো স্প্রিংস'– বললাম জায়গার নাম। 'ওহ। ইউ আর দি লাকিয়েস্ট'। 'তুমিই সবচেয়ে ভাগ্যবান, তুমিই সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় যাচ্ছো। তুমি নিশ্চয় ওই জায়গার প্রেমে পড়ে যাবে।' শত মুখে কলকল করতে করতে বললো লিণ্ডা। ওর হাত ওর টিশার্টের বুকে। একটা বোতাম সে খুঁজে পাচ্ছে না। আমেরিকান মেয়ের বক্ষলজ্জা! ব্যাঙের সর্দি! খোলা বুক আড়াল করতে লিণ্ডা বাথরুমে গেলো।

কলার‍্যাডোর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উদ্দেশ্যে টুরিস্ট ট্রেনে উঠে দুপাশের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো লিণ্ডার কথা– 'ওহ, ইউ আর দি লাকিয়েস্ট। ইউ উইল বি সিয়োরলি ইন লাভ উইথ কলার‍্যাডো।'

কলার‍্যাডো স্প্রিংস নামে সুন্দর শহরে আছে একটা দৈনিক পত্রিকা– দি গেজেট টেলিগ্রাফ। আমি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ৪ সপ্তাহের জন্য। শনি, রবি দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি। কি করবো? এই উইকএন্ডে আমার ভার নিলেন পত্রিকার একাউন্ট বিভাগের জোসেফ। অক্টোবর ২১, ১৯৯৫। সকাল ১১টায় জোসেফ তার জিপ গাড়ি নিয়ে হাজির।

প্রথমে যেতে হলো পাশের শহর ম্যানিটু স্প্রিংসে। এখানে গিয়ে গাড়ি ছেড়ে আমরা টিকিট কিনলাম। প্রতি টিকিট ৪২ ডলার। (১৭০০ টাকা! সর্বনাশ। যে কোনো অঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে ৪০ দিয়ে গুণন করা আমার বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এক কাপ কফি দুই ডলার! ৮০ টাকা! আমি প্রায় আঁতকে উঠি।) এক্ষেত্রে অবশ্য চিন্তা নাই। আমি মহামান্য অতিথি। আমার যাবতীয় খরচের ভার ওদের ওপর। জোসেফ নিজের ক্রেডিট কার্ড থেকে দাম দিয়ে দিলেন।

www.nagorikpathagar.com

বিকেল দুটো চল্লিশ মিনিটে ট্রেনে উঠলাম। দুটো বগির ট্রেন। বাসের মতো ড্রাইভার বসেছে যাত্রীদের বগিতেই। এই ট্রেনটা সুইজারল্যাণ্ডে তৈরি। আমেরিকায় বেশিরভাগ জিনিসই আমি দেখি বাইরে থেকে আমদানি করা। যেমন আমার মাথার ক্যাপটা। এই ক্যাপটা বারান্দাঅলা, শাদা ক্যাপ, আমাদের জেনারেল জিয়া যেটা পরে কোদাল হাতে পোজ দিয়েছিলেন। এই টুপিটা আমাকে দিয়েছে 'দৈনিক গেজেট টেলিগ্রাফ'অলারা। ক্যাপের কপালে বড়ো বড়ো করে লেখা পত্রিকার নাম। ট্রেনের ভিতরে আমি ক্যাপটা হাতে নিয়ে বসে আছি। হঠাৎ চোখ পড়লো ক্যাপের ভিতরে। দেখি লেখা– মেড ইন বাংলাদেশ। দেখালাম জোসেফকে, জোসেফ হাসতে লাগলেন। এরপর ট্রেনের সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাতে শুরু করলেন– এই ভদ্রলোক এসেছেন বাংলাদেশ থেকে, আমরা একে আমাদের পত্রিকার একটা ক্যাপ দিয়েছি, দেখুন ক্যাপটি। এখন দেখুন ক্যাপটি কোথায় তৈরি– বাংলাদেশে। সবাই বেশ মজা পেয়ে গেলো। আমিও। মনে মনে বললাম, হে ক্যাপ, তুমি যোগ্য মাথা খুঁজে পেয়েছো, আমরা উভয়েই এখন জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির।

ওয়াশিংটন ডিসিতে অন্তত দুই ডজন আমেরিকানের কাছে কলার‍্যাডোর প্রশংসা শুনেছি। এমন কি শুনেছি বাংলাদেশে 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রের নির্মাতা তারেক মাসুদের কাছেও। এটা আমেরিকার সবচেয়ে দর্শনীয় এলাকার একটি। এর কারণ এর পাহাড়। কলার‍্যাডো স্প্রিংস সমুদ্রতল থেকে ৬০০০ / ৭০০০ ফুট উঁচুতে। তার অপর পাশেই আছে এক বিশাল পর্বতমালা। মোটেলের জানালা দিয়ে তাকালেই পাহাড়। অফিসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছবির মতো পাহাড় দেখতে পেয়ে প্রথম দিন আমি ভুল করেছিলাম– আরে এটা ছবি নাকি সত্যি! আমাদের দেশে চাইনিজ রেস্তরাঁর দেয়ালে যেমন প্রমাণ সাইজ ছবি থাকে, আমি ভেবেছিলাম এটা তাই।

'পাহাড় ভালো লাগে নাকি সমুদ্র?' পাক্ষিক 'সানন্দা'র শেষ পাতায় মাঝারি খ্যাতিমানদের জিজ্ঞাসা করা হয়। আমাকে এ প্রশ্ন করা হলে আমি বলবো– পাহাড়, পাহাড়। কক্সবাজারে পাশাপাশি পাহাড় ও সমুদ্র পেয়ে আমি সমুদ্র দেখে হতাশ হয়েছিলাম। আমাকে টানছিল পাহাড়। পাহাড় দেখলেই আমার মনে হয়– আহা, আমি যদি ওই পাহাড়টার চূড়ায় উঠতে পারতাম! কেন মনে হয় কে জানে?

আমেরিকার কোনো কিছুই আমাকে মুগ্ধ করেনি। আমি বলেছি, দেখো মুগ্ধ হতে অন্তত দুজন লাগে। একা একা মুগ্ধ হওয়া যায়?

আমাদের টুরিস্ট ট্রেন যাত্রা শুরু করলো। এটা বিশেষ ধরনের ট্রেন। একে বলা হয় 'র‍্যাক রেইলওয়ে' বা 'কগ রেইলওয়ে'। পাহাড়ের খাড়া ঢালে উঠতে গিয়ে ট্রেন যেন পিছলে না পড়ে, সেজন্য দুই রেল লাইনের মাঝখানে আরেকটা লাইন আছে, খাঁজকাটা। সেটার সঙ্গে রেলগাড়িকে আটকে রাখা হয়।

ট্রেন চলছে পাইক্স পিকের উদ্দেশ্যে। পাইক সাহেবের চূড়া। ১৮০৬ সালে লেফটেন্যান্ট জেবুলন পাইক সাহেব এই চূড়ায় ওঠার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু ১০ হাজার ফুট উঠে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করেন– নাহ্, সম্ভব না বলে। তখনো আরও ৪

www.nagorikpathagar.com

হাজার ফুট বাকি। পাইকস পিকের উচ্চতা ১৪ হাজার ১১০ ফুট। আমাদের (!) এভারেস্টের অর্ধেক। অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন মাইল উঁচুতে এই শৃঙ্গ। আর আমি যে শহরে থাকি সে শহর থেকে এই পাহাড় চূড়ার উচ্চতা প্রায় দেড় মাইল। আমাদের ট্রেন চলছে। এই দেড় মাইল উঁচু পাহাড়ে উঠতে ট্রেনটাকে ২০ মাইল পথ যেতে হবে। সময় লাগবে এক ঘণ্টা।

আমি জানালার ধারে বসলাম। ২০ মাইল পাহাড়ি পথ দুধারে, যা তা কথা! প্রথমে শুরু হলো ঘন সবুজ বন। উঁচু গাছ। পাহাড়ে কোনো মাটি নেই। সবটাই পাথর। বিশাল বিশাল আগ্নেয়শিলার পাহাড়। লাল। হাতির চেয়ে বড়ো একেকটা পাথরখণ্ড। এই নিখাদ পাথরের গায়ে এসব গাছ জন্মালো কিভাবে? বড়ো গাছ। এই বনে হরিণ, ভালুক, লম্বাশিং ভেড়া ইত্যাদি আছে। আসার সময়ে দুটো পাহাড়ি হরিণ দেখেওছি। বনের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ি ঝরনা। তারপর পাহাড় কোথাও খাড়া, ন্যাড়া, ভয়ংকর। চারদিক নির্জন। মনে হয় কোনো অজানা গ্রহের মধ্যে এসে পড়েছি। অনেক সময় সিনেমায় ভিন্ন গ্রহ দেখাতে যে রকম নির্জন বৃক্ষহীন লাল পাথুরে পাহাড়, গুহা দেখানো হয়- সে রকম। কোথাও কোথাও রেলপথ একবারে খাড়া। ঘণ্টাখানেকের এই বিপুল বিশাল আশ্চর্য রহস্যময় ভৌতিক বুনো পাহাড়ি পথ পেরিয়ে আমরা এলাম সর্বোচ্চ শৃঙ্গে- পাইকস পিকে। সমুদ্রতল থেকে তিন মাইল উঁচুতে, আর কলারাড্যাডো স্প্রিংস শহর থেকে দেড় মাইল উঁচুতে। দূরে নিচুতে শহর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়েই আবার বিলের মতো জলাধার। বিচিত্র। বিচিত্র।

আমি ট্রেন থেকে নামলাম। কঠিন ঠাণ্ডা! হিমাঙ্কের ১০ ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রা। জ্যাকেট, সোয়েটার, মাফলার, ক্যাপ। জোসেফ আমাকে দিলেন এক জোড়া গ্লাভস। হাতে মোজা পরলাম। মাটিতে অল্প অল্প বরফে জমে আছে। বরফ হাতে নিলাম। সামান্য একটু ছোটাছুটি করছি বরফ নিয়ে, শ্বাসকষ্ট হতে লাগলো। জান বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়। এতো ওপরে বাতাসের চাপ কম। খারাপ লাগা স্বাভাবিক। খানিকটা দাঁড়িয়ে ধাতস্থ হয়ে চারপাশে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের দিকে তাকালাম। এতো ওপরে কোনো গাছ নেই, প্রাণী নেই। শুধু ছোট ঘাস আছে, যা প্রতি ১০০ বছরে বাড়ে ১ ইঞ্চি পরিমাণ। ৪০ মিনিট পর ট্রেনে এসে ফের উঠলাম, ট্রেন ফেরার জন্য রওয়ানা দিলো।

ট্রেনের কামরায় একটু দূরে একটা চমৎকার তরুণী বসে আছে। তার দিকে চোখ পড়তেই আটকে গেলো দৃষ্টি। পুরুষের চোখে নারীমুখের চেয়েও সুন্দর কিছু আর আছে কি? অমন সৌন্দর্য তুমি জীবনে আরো অনেক বার দেখবে, কিন্তু এই প্রকৃতি আর কখনো নয়- নিজেকে বললাম।

সুতরাং ফের বাইরে তাকানো। এই বিচিত্র পাথুরে পাহাড়, তার অন্ধকার খাদ, রূপার মতো পাহাড়ি গাছ- সব কিছু দেখে মনে হলো, আহা, বাংলাদেশের সবাইকে যদি এখানে এনে এই দৃশ্য দেখানো যেতো! অথবা এই পুরো ব্যাপারটা যদি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো বাংলাদেশে!

www.nagorikpathagar.com

তা তো আর হওয়ার নয়। সে কারণেই এই লেখা। আমার ভালো লাগাটুকু আমি আরো অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। কিন্তু যাকে বলে মুগ্ধ হওয়া, তা আমি এখনো হইনি। বলেইছিতো, মুগ্ধ হতে অন্তত দুজন লাগে। একা একা মুগ্ধ হওয়া যায়!

www.nagorikpathagar.com

আমেরিকার সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে খারাপ

আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর পর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বলতেন, আমেরিকার গল্প করো। আমি বলি, 'কি গল্প করবো?'

'বলো, ওদেশে সবচেয়ে ভালো কি দেখলে, আর সবচেয়ে খারাপ কি?'

আমার চোখে ওদের যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে, তা হলো বৃদ্ধ, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি ওদের সামাজিক দায়বোধ।

প্রতিবন্ধীদের কথাই ধরা যাক। যে কোনো অফিসে চাকরির বেলায় শাদা-কালো, এশীয়-হিস্পানিক, বৃদ্ধ-প্রতিবন্ধী, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করা যাবে না। বরং সব সংখ্যালঘু সামাজিক গোষ্ঠীর জন্যে চাকরিতে রয়েছে বিশেষ কোটা। এসব কোটার মধ্যে কোনো কোনো রাজ্যে সমকামীদের জন্যও আছে বিশেষ সংরক্ষিত আসন। বয়োবৃদ্ধ কিংবা ল্যাংড়া-খোঁড়া মানুষ বিছানায় পড়ে থাকবে– এটাও যেন ওরা মেনে নিতে চায় না। ফলে প্রায়ই দেখা যায়, হুইল চেয়ারে চড়ে বৃদ্ধরা বা নিম্নাঙ্গ-অবশেরা শহরের পথে চলাচল করছে। নিম্নাঙ্গ অবশ, তাই বলে হাত তো অবশ নয়, হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছে হুইল চেয়ারের চাকা।

হুইল চেয়ার এবং শিশুদের প্যারাম্বুলেটর নিয়ে যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেজন্যে ফুটপাতে আছে বিশেষ ঢাল, রাস্তার মাঝখানের ডিভাইডার কাটা। আর যে কোনো বিল্ডিংয়ের নিচের তলায় ওঠার সিঁড়ির পাশেই আছে ঢালুপথ, অন্যান্য তলায় ওঠার জন্যে লিফট তো আছেই। ট্রেনগুলো প্লাটফরমের সঙ্গে একই তলে দাঁড়ায় যেন সহজেই চাকা ঘুরিয়ে উঠতে পারে হুইল চেয়ারঅলারা। আর বাসগুলো যখন বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়ায়, সমস্ত বডিটা নিচে নেমে যায়, সিঁড়িটা লেগে যায় প্রায় রাস্তার গায়ে।

ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম ডেনভার যাবার পথে। ডেনভারে আমার বুয়েট সহপাঠী মিতুল থাকে, মাইন ইঞ্জিনিয়ার স্বামী আর দুটো শিশুসন্তান নিয়ে।

'টেলিফোনে মিতুল বললো, উইকএণ্ড হলে আমি নিজেই চলে আসতাম; কিন্তু পরের শনিবারেই তুমি কলার‍্যাডো স্প্রিংস ছাড়ছো; এতো কাছে থেকেও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আনিস, আসো না।

www.nagorikpathagar.com

আমার হাতে সময় আছে মাত্র দু'দিন। এরপর আমি যাবো নিউ ইয়র্ক। আগামীকাল আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকার সার্কুলেশন বিভাগের সঙ্গে।

সেসব ছাপিয়ে আমার কানে বাজতে লাগলো পাঁচ বছর আগে শেষবার দেখা সহপাঠিনীর মুখ আর তার বাংলা অনুনায়ক ধ্বনি, 'আনিস, আসো না।'

আমি বললাম, আমি যাবো। কালই। বাসটার্মিনালে ফোন করে জানলাম বাসের সময়সূচি। পরদিন সকাল নটায় বাস ছাড়বে। ডেনভার পৌঁছবে সাড়ে ১০টায়।

মিতুলের সঙ্গে কথা হলো। পরদিন সকালে ও থাকবে ডেনভার বাস টার্মিনালে।

আমি ডেনভারের বাসে চেপে বসলাম। আমাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধা যাবেন, তিনি আছেন হুইল চেয়ারে। গাড়ির ড্রাইভার নিজে মহিলা সমেত হুইল চেয়ারটাকে ধরে গাড়িতে তুললো। পাবলিক বাসে গেটের কাছে প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধদের আসন।

বাস ছেড়ে দিলো। দেড়ঘন্টায় আমরা ডেনভারে পৌঁছে গেলাম। বৃদ্ধা ডেনভার থেকে আবার আরেকটা শহরে যাবেন। তাকে সেই শহরগামী বাসে উঠতে হবে। আমাদের বাস সরাসরি নির্ধারিত টার্মিনালে না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরলো।

উদ্দেশ্য, ওই বৃদ্ধাকে কানেকটিং বাস ধরিয়ে দেয়া। তারপর অন্য কোম্পানির বাস টার্মিনালে গিয়ে দাঁড়ালো আমাদের বাস। ড্রাইভার হুইল চেয়ারসহ বৃদ্ধাকে নিজে নামালেন। তারপর কাঙ্ক্ষিত বাসে তাকে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। এবার আমাদের বাস চললো তার নিজস্ব টার্মিনালে। এই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ড্রাইভার আমাদের ১৫ মিনিট দেরি করিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, একজন যাত্রীও বিরক্ত হলো না।

প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি মার্কিনীদের এই সম্মানবোধই আমার কাছে ঐ সমাজের সবচেয়ে ভালো জিনিস বলে মনে হয়েছে। আর খারাপ বিষয়? সেটাও একই। আমাদের সমাজ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীর প্রতি দায়িত্ব পালন করে না, কিন্তু ব্যক্তি নিজে করে থাকে। আমাদের সমাজে কি কোনো পঙ্গু বৃদ্ধাকে একাকি দূরপথে ছেড়ে দেয়া হতো? বৃদ্ধ মাত্রই আমেরিকায় নিঃসঙ্গ।

ডেনভার টার্মিনালে নেমে দেখি কোথাও মিতুল নেই। মিতুলরা থাকে ডেনভার থেকে ১০ মাইল দূরে গোল্ডেনে। ওর ঠিকানা আছে আমার কাছে, টেলিফোন নাম্বারও আছে। কিন্তু অচেনা শহরে শেষতক একা একা ওদের বাসা খুঁজে বের করতে পারবো এমন ভরসা হলো না। বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় মিতুল এসে হাজির। পরনে অকৃত্রিম বাঙালি সালোয়ার কামিজ। হাতে একটা ব্যাগ, কোলে একটা বাচ্চা। ব্যাগ ধরবে না বাচ্চা ধরবে।

মিতুল গাড়ি এনেছে, নিজে ড্রাইভ করে। পার্কিং প্লেসে ওর গাড়িতে উঠতে গেলাম। বাচ্চাটার খুব সর্দি লেগেছে, খক খক করে কাশি দিচ্ছে। ডেনভারের আবহাওয়া আজ খুবই খারাপ– ঝির ঝির করে পড়ছে বরফ। মিতুল গাড়ির দরজা খুলছে এক হাত দিয়ে, অন্য হাতে ব্যাগ। ওর বছরতিনেকের বাচ্চাটার পা পড়লো ফ্লোরে জমে থাকা হিমশীতল পানিতে। আমি আঁতকে উঠলাম। মিতুলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

www.nagorikpathagar.com

মেয়েকে পেছনের বেবি-সিটে বসিয়ে আমাকে পাশে নিয়ে মিতুল গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

মিতুল ড্রাইভার হিসেবে মহাআনাড়ি। গাড়ি কাঁপছে থরথর করে। তারওপর এই ওর প্রথম আসা ডাউন টাউনে। ডেনভার বড়ো শহর। কলার‍্যাডো রাজ্যের রাজধানী। তেলকুবেরদের শহর। আকাশ ছোঁয়া সব সুউচ্চ ভবন। রাস্তা সব ওয়ান-ওয়ে। মিতুল বললো, চলে এলাম সোজাসুজি, এখন তো আর বেরুতে পারছি না। মিতুল শুধু পাক খেতে লাগলো। ওর ভাষায় গুল্লি খাওয়া। আবার রাস্তার মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ও যে ম্যাপটা ভালোমতো দেখে নেবে, তারও উপায় নেই। কারণ যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করানোর নিয়ম নেই। মিতুল ঘন্টা আধেক এ-রাস্তা, ও-রাস্তায় অকারণে ঘুর-পাক করে অবশেষে একটা বসতবাড়ির গ্যারাজে ঢুকে পড়লো। সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গভীর মনোযোগে ম্যাপ দেখলো। তারপর রাস্তা খুঁজে পেতে সে পড়লো তার পরিচিত ফেরার সড়কে।

মিতুলের এই পথ হারানো ঘুরপাকে আমি খুব মজা পেয়ে গেলাম। কারণ ডেনভার শহরটা আমার দেখা হয়ে যাচ্ছে। মিতুল আমাকে চেনাতে লাগলো কোনটা কোন ভবন। রাজ্য পার্লামেন্ট ভবনের স্থাপত্যরীতি দেখলাম ওয়াশিংটন ডিসি ক্যাপিটল হিলের মতোই।

মিতুলের বাসায় পৌঁছলাম দুপুর ১২টার দিকে।

মিতুল বললো, আধঘন্টা পর ফের বেরুতে হবে।

ওর বরের নাম শামীম। শামীমভাই পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং পিএইচডি করে এখন চাকরি করছেন। গবেষণা ধরনের কাজ। মিতুল এই আধঘন্টা সময় রান্নাঘরেই খুটখাট করে কাটালো। আমি ডাইনিং টেবিলে বসে ওর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

সাড়ে বারোটায় আবার গাড়ি নিয়ে আগের মতোই আমরা বেরুলাম শামীম ভাইয়ের কর্মস্থল মাইন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অভিমুখে। শামীম ভাই গাড়ি দেখে ভবন থেকে নেমে এলেন। বাড়ির কাছেই কর্মস্থল। ফিরতে সময় লাগলো না।

এবার অপেক্ষা মিতুলের নার্সারি ক্লাস পড়ুয়া ছেলের জন্যে। বেলা একটায় স্কুলের গাড়ি বাচ্চাকে দিয়ে যাবে। উৎকর্ণ হয়ে রইলো মিতুল-দম্পতি, স্কুলগাড়ির হর্ন শোনার জন্যে।

বাইরে ঝিরঝির করে বরফ ঝরেই পড়েছে। ঘরের ভেতরেও আমার ঠাণ্ডা লাগছে। এর কারণ আমার জুতা জোড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আরো ঠাণ্ডার ভয়ে জুতা খুলছি না। পরে যখন জুতা খুললাম, দেখি ঠাণ্ডা কমই লাগছে পায়ে। আসলে বরফে জুতা জমে নিজেই বরফশীতল হয়ে পড়েছিলো।

মিতুলের ছেলে স্কুল থেকে ফিরলো। তার সমস্ত মুখে রঙ লাগানো। স্কুলে আজ এই কর্মটি হয়েছে। বাচ্চাদের ফেস-পেইন্টিং করে দেয়া হয়েছে। বীরশিশু বাসায় ফিরেও রঙ তুলবে না। ও অমন করেই রইলো।

www.nagorikpathagar.com

মিতুল টেবিলে খাবার সাজালো। নুডল্‌স আর ডালপুরির। ও আশা করে আছে, আমাকে সন্ধ্যার সময় ভাত খাওয়াবে। ফেরার সর্বশেষ বাস সাড়ে ছয়টায়। পাঁচটার দিকে নৈশভোজ করিয়ে সে আমাকে বিদায় দেবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমি বললাম, আমি এক্ষুনি ফিরবো। সাড়ে তিনটার বাসে।

মিতুল কিছুতেই আসতে দেবে না। ভাত না খেয়ে বাঙালির বাসা থেকে চলে আসা? কিছুতেই না।

আমার রাতে দাওয়াত আছে। লিও, ব্রিজিতা আর আমাকে নিয়ে রানাভাই যাবেন বাইরে রেস্তরাঁয় খাওয়াতে।

আমার জিদই জয়লাভ করলো। ঠিক হলো সাড়ে তিনটার বাসেই ফিরবো।

হাতে সময় আছে আর আধঘণ্টা। আধঘণ্টায় আর কতো গল্প করা যায়? তবু কতো গল্প।

আড়াইটার দিকে সবাই মিলে ফের গাড়িতে উঠলাম। শামীমভাই ড্রাইভিং সিটে। দুই বাচ্চা, মিতুল আর আমি। গোল্ডেন থেকে ডেনভার। বাসটার্মিনালে যখন পৌঁছলাম তখন ৩টা ২৫। বাস ছাড়ি ছাড়ি। আবহাওয়া খুবই দুর্যোগপূর্ণ- গাড়ি আগে ভাগেই ছেড়ে দিচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো। খুবই ধীরগতিতে। প্রথম কথা বরফ-বৃষ্টি হওয়ায় পথ হয়ে গেছে পিচ্ছিল। সব গাড়ি চলছে ধীরে। দ্বিতীয় কথা হলো সব গাড়ি ধীরে চলায় রাস্তায় বেধে গেছে ট্রাফিম জ্যাম। এবং তিন নম্বর কথা হলো ডেনভার টু কলার‍্যাডো স্প্রিংসের ৭০ মাইল পথে অন্তত ৫টা গাড়ি উল্টে গেছে রাস্তা পিচ্ছিল হওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী গাড়ি এসে গেছে, পৌঁছে গেছে পুলিশ। পথ পরিষ্কার করতে যে সময়টুকু লাগছে, তাতে রাস্তায় যানজট আরো বেড়ে যাচ্ছে। বাসের জানালা দিয়ে দেখা গেলো ওল্টানো গাড়ির পাশে টিভিক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকেরা লেগে গেছে স্পট রিপোর্টিং করতে।

সন্ধ্যার বাসে না ফিরে বিকেলের বাসে ফেরার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সঠিক বলেই প্রমাণিত হলো। বাসে দেড় ঘণ্টার পথ। গাড়িতে গেলে ৫০ মিনিট। সাড়ে তিনটার বাস পৌঁছার কথা পাঁচটায়। কিন্তু পৌঁছতে পৌঁছতে বেজে গেলো আটটা। সাড়ে চার ঘণ্টা! প্রকৃতির ওপরে আমাদের হাত নেই, মার্কিনীদের আছে। কিন্তু সেই হাত অসীম লম্বা নয়, তার নাগালে সব কিছু পড়ে না।

আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি

বাসে একাকি বসে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলাম। মিতুল বুয়েট থেকে ফার্স্টক্লাস পেয়ে বের হওয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় এসে এমএস করেছে। এখনও চাকরি বাকরি করা হয়ে ওঠেনি। দু দুটো বাচ্চা। বাংলাদেশে ওর মতো মেয়ে মা হলে

www.nagorikpathagar.com

কতোজন পাশে এসে দাঁড়াতো। বাচ্চার দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-ফুপু ঘিরে থাকতো সারাদিন। তিনটা / চারটা কাজের মেয়ে থাকতো। কিন্তু আমেরিকায় সে সব সে পাবে কোথায়। মিতুলের মা, শামীম ভাইয়ের মা অবশ্য নাতীদের দেখতে মাঝে মধ্যে এসেছেন। একমাস দু'মাস থেকেছেন। কিন্তু তাই কি সব?

আমেরিকায় বাঙালি মাত্রকেই প্রচণ্ড কষ্টের মুখে পড়তে হয়। দিনে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা কাজ। এরপর রান্না-বান্না, কাপড় কাচা, সব করতে হয় নিজেদেরই। সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে বোধহয় বাঙালি মেয়েরা। কারণ তাদের বেশির ভাগই বাইরের কাজও করে, ঘরের কাজও করে, বাঙালি পুরুষ ঘরণীকে গৃহকর্মে সহযোগিতা করবেন বলে নিয়ত করলেও কতোটা আর করবেন? পেঁয়াজটা কেটে দেবেন, বা শাড়িটা ইস্ত্রী করে দেবেন– এই তো! বাকি সব কাজ বাঙালি নারীটি একাই করে। এরওপর আছে সন্তানধারণ। সন্তানের পরিচর্যা। বাঙালি মেয়েরা আমেরিকায় এসে সর্বাগ্রে যে কাজটিকে জরুরি বলে মনে করে তা হলো বাচ্চা নিয়ে নেয়া। সেটা এক ধরনের নিরাপত্তা দেয়– আমরা এখন জন্মগত আমেরিকানের মা-বাবা।

এসব বিষয়ে মিতুলের বক্তব্য– আসলে আমাদের কষ্ট তেমন কষ্ট নয়; কিন্তু সবচেয়ে বেশি মিস করে বাচ্চারা। দাদী-নানীর আদরটা যে কি জিনিস-সেটা ওরা কোনোদিন বুঝবে না। তেমনি দাদী-নানীরাও বঞ্চিত হন তাদের নাতী-নাতনীদের সঙ্গ থেকে। স্নেহ পাওয়া যেমন আনন্দের, স্নেহ দিতে পারাও তেমনি আনন্দের! এই আনন্দ থেকে উভয় পক্ষ বঞ্চিত হয়। আমার আবার মনে পড়ে যায় সেই গান– ভাইয়ের মায়ের এতো স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ।

এই বিচারে অন্য যুক্তিও বিবেচ্য। এই বাচ্চারা একদিন বড়ো হবে, হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ আমেরিকান। তাদের বাবা-মা'রা একদিন যতো কষ্ট করেছিলেন অভিবাসনের জন্যে, সেই কষ্ট তাদের কোনো দিনও স্বীকার করতে হবে না। বাংলাদেশের মতো দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ দেশের নানা সংকট তাদের স্পর্শ করবে না, তেমনি গরিব দেশ থেকে আসার দাগও মুছে যাবে তাদের গা থেকে। গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখক ড্যানের কথাই বিবেচনা করা যায়। ওর বাবা এসেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়া থেকে। আর ড্যানের জন্ম আমেরিকায়। ড্যান নিজেকে আমেরিকান ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। ভাবতে পারে না।

বাংলাদেশী বাবা-মা'র মার্কিন শিশুরাও ৮ / ১০ বছর বয়সেই আমেরিকাকে ভালোবাসতে শিখে যায়!

ওদের বাবা-মা যখন জিজ্ঞেস করে, বাংলাদেশে যাবে, ওরা জবাব দেয়, না, কেন যাবো, আমার সব ফ্রেণ্ড তো এখানে।

অবশ্য মিতুলের মতো প্রকৌশলী-দম্পতির সামনের দিনগুলো হয়তো খুবই স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। দুজনেই চাকরি করলে ওরা হয়ে উঠবে আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। স্বচ্ছলতা সারা পৃথিবীতে সুখকর, আমেরিকায় সে কথা আরো বেশি সত্য।

www.nagorikpathagar.com

পড়াশুনার সময়টাই এদের জন্য বেশি কষ্টের।

আমাদের আরেক সহপাঠী নাসরিন খান। বুয়েটের বন্ধু। নাসরিন খানের বাবা সালাম খান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রধান আইনজীবী। এদেশের জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে তাই জড়িয়ে আছে সালাম খানের নাম। ফয়েজ আহমদের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ওপরে লেখা বইটি পড়ে আমি এই কথাটা পরে জেনেছি।

নাসরিন খান এখন আমেরিকায়। ওর বর আমাদের শিক্ষক, রউফুন স্যার। স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে এসে স্যার পিএইচডি করেছেন। এখন চাকরি করছেন। ওরা গ্রীনকার্ড পেয়ে গেছে। নাসরিনও বুয়েট থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আমেরিকায় এসে সে আর পড়াশুনা করতে পারেনি। প্রধান কারণ– বর পড়াশুনা করছে, নিজের দুটো বাচ্চা হয়েছে– এ অবস্থায় নিজে সে পড়বে বা চাকরি করবে কি করে?

নাসরিনের সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে। নাসরিন বলেছে, ভাই, সব ঠিক আছে; কিন্তু একটা কথা– তোমার অসুখ হোক, বিসুখ হোক, নিজের কাজ তো তোমার নিজেকেই করতে হবে।

কোনো মাফ নেই। ক্যাজুয়াল লিভ নেই, অর্জিত ছুটি নেই, সিকলিভ নেই। এ হলো সংসার। এ হলো আমেরিকায় সংসার। নিজের ভাত এখানে তোমার নিজেকেই ফুটিয়ে খেতে হবে।

গুলশানে গাড়ি-বাড়িঅলা পরিবারের মেয়ে নাসরিন বলেছে, আমেরিকায় বড়লোক কারা, ধনী কারা, তারা কিভাবে থাকে– আমরা কেউ দেখিনি। যারা পড়তে আসে, স্কলারশিপ নিয়ে আসে, তাদের কেউই এদেশের ধনীদের দেখে না, তাদের জীবন কেমন জানে না। বেশি করে লটারির টিকেট কিনি। যদি সহসাই বড়লোক হয়ে যেতে পারি, এই আশায়।

নিতান্তই বন্ধু বলে নাসরিন আমাকে এই কথা বলেছে অকপটে। ওর অনুমতি না নিয়েই সেই দ্বিপাক্ষিক ভাষ্য আমি বহুজনকে জানানোর অপরাধ করছি। ও আমার বন্ধু, এটা অপরাধ বলে ও গণ্য করবে না– এই ভরসা নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আমার আরেক বন্ধুর কথা বলি। তার নামটা গোপনই রাখি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম ফোনে, কেমন আছো?

সে বললো, নারে, ভালো নেই।

সে এদেশে এসেছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চশিক্ষা নিতে। নিজের খরচে এসেছে। এদেশে টিউশন ফি বেশি। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে– সেই কথাটা সারাক্ষণ তার মনে খচখচ করে।

রাত্রি আটটায় ফোনে বললো, এখনই ফোন রাখতে হবে, আমাকে এখন কাজে বেরুতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

কাজ বলতে ছাত্রাবাসে রুমে রুমে পিজা পৌঁছে দেয়া। এই কাজ করে সে দিনে পাবে মাত্র ৪ ডলার। তবু সে এই কাজ করে। কারণ মাসে ১২০ ডলার, সেটা বা আসে কোত্থেকে?

শুনে আমার খুব খারাপ লাগলো। কারণ ৪ ডলারে এদেশে একটা বার্গার হয় না।

আমার ভাই কানাডায় থেকে পড়াশুনা করছেন। ওদেশে তিনি মোটেও থাকতে চান না। একবার দেশে এসেছিলেন বেড়াতে– ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমি আর যাবো না কানাডায়। আম্মা প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আশরাফ ভাই বলেন, দেশে সবাই ভালো থাকে।

একই কথা বলেছে নাসরিনও, দেশে সবাই ভালো থাকে। নাসরিন গত বছর দেশে এসেছিলো বেড়াতে, সে নাকি তখন দেখেছে– দেশে তার বন্ধুদের সবাই ভালো আছে।

মিতুল বলে, দেশে থাকতে পারলে কেউ কি বলো বিদেশে আসে? না পেয়ে মানুষ আসে বিদেশে।

ওর এই কথায় যুক্তি আছে। অন্য কোনো পেশার কথা জানি না, দেশে প্রকৌশলীদের আর কিই বা করার আছে। সরকারি চাকরিকে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য মনে করা হয় মোক্ষ। কিন্তু সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা কি ভালো আছে?

শামীম ভাই দেশে সরকারি চাকরি করতেন। মিতুল বলে, যে বেতন তিনি পেতেন, তাতে ওদের বাসা ভাড়া উঠতো না।

আমার এক বন্ধু সহকারী প্রকৌশলী, দেশে ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডে। অত্যন্ত মেধাবী ও সৎ ছেলে। সাকুল্যে বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকা। তিন হাজার টাকা বাসা ভাড়া দেয় ও প্রতিমাসে অফিস যাতায়াতে ব্যয় হয় বারোশ টাকা। আর আটশ টাকায় ও কি খাবে, কি পরবে? বউ আছে, বাচ্চা আছে। বাড়ি থেকে টাকা আনতে হয়, যেমন আনতে হতো ছাত্রাবস্থায়।

আমি নিজে বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম। বেতন ছিলো সর্বসাকুল্যে চার হাজার চারশ টাকা। এই টাকা দিয়ে তো ভালো একটা বাসা হয় না। এরপরেও কেন লোকে প্রকৌশলী হতে চায়? এর উত্তর : ঘুষ খেয়ে বড়লোক হবার জন্যে।

আর যারা চায় না ঘুষ খেতে, তাদের জন্যে বাকি থাকে একটাই পথ– দেশত্যাগ করা। পালাও। যে যেখানে পারো পালাও।

আপনার আশেপাশে সরকারি চাকরি করা যাকেই দেখবেন গাড়ি চড়ছে, বাড়ি করেছে, নিশ্চিত জানুন, ঐ লোক চোর। স্রেফ চোর। চারদিকে চোরের মাহাত্ম্য। চারদিকে চোরের সাম্রাজ্য। এর আগে 'ফ্যান্টাসি' কলামে আমি একবার হিসাব করে দেখিয়েছিলাম, একজন সেক্রেটারির ২০ বছরের চাকরির বেতন পুরোটা যোগ করলে একটা নিশান প্যাট্রল গাড়ির দাম হয় না।

www.nagorikpathagar.com

অসৎ ব্যবসায়ী, ঋণখেলাপী বণিকনেতা, দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা, কমিশন-ভোগী রাজনীতিবিদ– এরাই তো আমাদের নেতা, আমাদের পথপ্রদর্শক।

এরপরে যদি কেউ আমেরিকায় যেতে চায়, তাকে আমি কি বলবো?

আমি বলবো, খুব ভালো করেছো। যারা এখনো দেশে আছেন, তারাও যান। গিয়ে দেশে টাকা পাঠান। দেশের অর্থনীতিটা কিছুটা সাহায্যপুষ্ট হোক।

দুটো কথা এ প্রসঙ্গে বলে রাখি– এক. আমেরিকা ইজ গুড ফর আমেরিকানস। দুই. আমেরিকা হলো অভিবাসীদের দেশ। আপনি যদি দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকেন, তাহলে আমেরিকার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

কারণ আমেরিকা হলো একটা মানব চিড়িয়াখানা। সবাই এসেছে বাইরে থেকে (আদিবাসীরা ছাড়া)। কে যে কোন দেশ থেকে এসেছে কে তার খোঁজ রাখে। আপনি সহজেই ওই জনারণ্যে মিশে যেতে পারেন।

দুটো কথার অতিরিক্ত এবার তৃতীয় আরেকটা কথা বলি। ধরা যাক বাংলাদেশের একজন ঝাড়ুদার। দেশে সে খেতে পেতো না। আমেরিকায় ঝাড়ু-দারের কাজই করছে। আর ডলার কামাচ্ছে। বাড়িতে টেলিফোন আছে, টিভি আছে। দুবেলা পেট পুরে খাচ্ছে আর সঞ্চয় করছে। বলা উচিত, সে এখন স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

ওই সুখী মানুষটির কাছে যান, তাকে জিজ্ঞেস করুন, দেশ সম্পর্কে তোমার কি মত? সে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, তারপর গভীর মমতার সঙ্গে উচ্চারণ করবে, দেশ হচ্ছে দেশ। পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা সে মিশিয়ে দেবে একটা ছোট শব্দের সঙ্গে– দেশ।

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত সেই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে-চিত্রপটে চিত্রকরে
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

www.nagorikpathagar.com

চার্চে

জোসেফ আমাকে ঘোরাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, নানা উপহার কিনে দিচ্ছে। সে কাজ করে পত্রিকার হিসাব বিভাগে, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবারই কোনো কারণ ছিলো না। অথচ হয়ে গেলো গভীর বন্ধুত্ব।

শুধুই কি বন্ধুত্ব?

জোসেফ একদিন আমাকে বললো, আনিস, তুমি যদি ইচ্ছা করো, তোমাকে আগামী রোববার গীর্জায় নিয়ে যাবো। তুমি কি যাবে?

আমি শুকনো মুখে বললাম, যাবো, কোনো অসুবিধা নেই।

বুঝলাম পুণ্যার্থী খ্রিস্টানের এ হচ্ছে মধুর ষড়যন্ত্র। আমাকে চার্চে নিয়ে গিয়ে সে কিছু সওয়াব হাসিল করতে চায়। তার বহু ঋণ এমন নিখরচায় শোধ করে দেবার এ সুযোগ গ্রহণে আমি সম্মত হলাম।

রোববার সকাল নটায় জোসেফ চলে এলো গাড়ি নিয়ে। আমি তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। জোসেফ বললো, তোমাকে যে চার্চে নিয়ে যাবো, সেখানে গান-বাজনা হবে। তুমি যেন বোর ফিল না করো, সে জন্যে আমার স্থানীয় চার্চ ছেড়ে তোমাকে অন্য চার্চে নিয়ে যাচ্ছি।

চার্চে ঢুকলাম। চার্চটির হলরুমটা আমাদের হাউজ বা মহিলা সমিতির অডিটরিয়ামের মতো। সারি করে চেয়ার পাতা। মঞ্চে যাজক, মাইকে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি বাইবেলের অংশবিশেষ পাঠ করলেন। মাঝে যীশুর এবং জগৎপিতার প্রশংসা করে গান হচ্ছে।

একদল শিশু মঞ্চে উঠে বেশ ক'টা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলো। মঞ্চের ওপরে পিয়ানো আছে। যেসব গান গাওয়া হচ্ছে সে সবের কথা স্বরলিপিসমেত একটা বইয়ে ছাপা আছে। প্রতিটি সিটের সামনে এ সব বই ও বাইবেল রাখা। গান শুনে, গানের কথা পড়ে আমার মনে হলো– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রার্থনা সঙ্গীত রচনার আইডিয়া এ ধরনের গান থেকেই পেয়েছেন। উপনিষদের ঋষির মনে লেগেছে পিয়ানোর তুলতুল টুকটুক দোলা। গান শেষে একজন বক্তা উঠলেন বক্তৃতা করতে।

www.nagorikpathagar.com

তাঁর বক্তৃতার বিষয় পারিবারিক বন্ধুত্বের গুরুত্ব। পশ্চিমের বহু দুর্দশার মূলে যে ভাঙা পরিবার, দায়িত্বহীন পরিবার– এই হলো তার বক্তব্যবিষয়। বক্তা কথা বলছেন চিৎকার করে, আমাদের অনলবর্ষী মধুকণ্ঠী যুক্তিবাদীদের মতো। মাথা ধরে গেলো। তবু তাঁর বক্তৃতা মন দিয়ে শুনলাম। রাষ্ট্র যে সমকামিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এসব বিষয়ে তিনি বেশ গরম হয়ে উঠলেন। আর শ্রোতাদের আহ্বান জানালেন পরিবার অটুট রাখতে, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব পালন করতে।

একই রকম আহ্বান কিন্তু উচ্চারিত হয়েছে লুই ফারাখান আহূত কৃষ্ণাঙ্গ মহাসমাবেশ 'মিলিয়ন ম্যান মার্চ' থেকে।

এদিকে পৃথিবীব্যাপী বছরের একটি দিন পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব পরিবার দিবস' বলে।

আমরা যখন অর্থনৈতিক কারণে ও নারীমুক্তির লক্ষ্যে সনাতন পরিবারগুলো ভেঙে ঘরের দুয়ার খুলে বেরুতে চাইছি, পশ্চিমে কিন্তু তার উল্টো একটা প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে। তিনটা পরস্পরবিরোধী সূত্র একত্র করে তাই আমার মনে হলো।

জোসেফকে বললাম, তোমাদের ধর্মীয় নেতারা দেখি বেশ মুখর রাষ্ট্রীয় নীতির সমালোচনায়। এ ব্যাপারে আমাদের ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে তাদের বেশ মিল। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের পার্থক্য দুস্তর। তোমাদের ধর্মীয় নেতারা কখনোই রাজনৈতিক দল গঠন করবে না, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট চাইবে না; কিংবা ষড়যন্ত্র করে হত্যা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চাইবে না। ধর্ম আর রাজনীতি তোমাদের দেশে মোটামুটি চিরদিনের মতো আলাদা হয়ে গেছে। তুমি কি একথা চিন্তা করতে পারো, চার্চ থেকে পাদ্রীরা বের হয়ে বলছে, আমাদের ভোট দাও, আমরা তোমাদের স্বর্গের টিকেট দেবো।

জোসেফ বললো, না।

জোসেফের মতো ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানও এমনটা কল্পনা করতে পারে না।

মার্কিন সংগঠনের প্রথম সংশোধনী, যা ওদেশে বাক ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার রাক্ষকবচ তা হলো–

Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise therfore; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petiton the government for a redress grievances.

কংগ্রেস কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে কিংবা কোনো ধর্মের মুক্তচর্চা নিষিদ্ধ করে কোনো আইন করবে না।

আর আমরা! ধর্ম তো ধর্ম, একেবারে রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠা করে ফেললাম!

ধর্ম ও রাজনীতিকে একই সঙ্গে কলুষিত করার এই হচ্ছে সহজপথ– রাজনীতেকে ধর্মের সঙ্গে, কিংবা ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দেয়া।

চার্চে কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে দেখলাম না। জোসেফ বললো, এটা শ্বেতাঙ্গদের চার্চ, কৃষ্ণাঙ্গদের চার্চ আলাদা।

আমি বললাম, তাহলে আমাকে ব্ল্যাক চার্চ দেখাতে নিয়ে চলো।

www.nagorikpathagar.com

ঠিক হলো, সন্ধ্যায় কালো গীর্জায় যাওয়া হবে। কিন্তু সন্ধ্যার পর যতোটা কালো গীর্জায় আমরা গেলাম, সবগুলো পাওয়া গেলো বন্ধ অবস্থায়। ওদেশে কালো মুসলিমরা কেন নিজেদের জন্যে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যেখানে সাদা মুসলিমদের জায়গা নেই– একটা যোগসূত্র পাওয়া গেলো।

গুডবাই কলার‍্যাডো স্প্রিংস

কলার‍্যাডো স্প্রিংসের চার সপ্তাহ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। এরপর যাবো নিউ ইয়র্ক। যেখানে আবার বারো দেশের বারো সাংবাদিক একত্র হবো। নিউ ইয়র্কে বাঙালি প্রচুর, সময়টা কাটবে ভালো, এই আশায় আমি বুক বাঁধতে শুরু করলাম।

আমার বিদায় উপলক্ষে চক এসি'র বাসায় আমার দাওয়াত। চক আর তাঁর স্ত্রী দুই বুড়োবুড়ি একা একা বাসায় থাকে। এক মেয়ে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। চকের নাতী-নাতনী আছে। চক তার মেয়ে ও জামাইকেও নেমন্তন্ন করেছে, কিন্তু তারা এলেন না। আমি, গেজেট টেলিগ্রাফ পত্রিকার কলাম লেখিকা ন্যান্সি, তার স্বামী আর চক দম্পতি সাকুল্যে পাঁচ জন। পত্রিকা অফিস থেকে চকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম অফিস ছুটির পর। বিকাল পাঁচটা। চক গাড়ি থামালেন মদের দোকানে। নিজের জন্যে কেসভরে মদের বোতল কিনলেন। আমার জন্যে কিনলেন ওয়াইন লিকুইডার। বাসায় পৌঁছলে প্রথম কাজ হলো কোট খুলে রাখা। বিদেশী ছবিতে এ দৃশ্য আমরা অনেক দেখেছি। এরপর চক নিয়ে গেলেন তার টিভিরুম কাম স্টুডিওতে। টিভি অন্ করে খানিকক্ষণ খবর দেখলেন তিনি। এদিকে বোতল খুলে সাবাড় করা শুরু হয়ে গেছে। আমার জন্য খোলা হলো ওয়াইন লিকুইডারের ছিপি। এ তরল আমি জীবনে প্রথম মুখে দিলাম। আহ! পুরো আঙুরের রস। ছোটবেলায় একটা লাল রঙের আঙুরের জুসের বোতল ছিলো বাসায়। সেটা থেকে হতের তালুতে ঢেলে জিভ দিয়ে চেটে খেতে কি যে ভালো লাগতো। অবিকল সেই স্বাদ। চক এসির বউ রাঁধতে লেগে গেছেন। একটু পরে ন্যান্সি দম্পতি এলেন। তারা সঙ্গে আনলেন একটা ঘরে বাননো কেক।

সন্ধ্যা সাতটার দিকেই টেবিলে খাবার দেয়া হয়ে গেলো।

চকের বউ রেঁধেছেন আলু সেদ্ধর সঙ্গে ডিম সেদ্ধ মিশিয়ে একটা পদ। আমার জন্যে স্পেশাল পদ ভাত। গোরুমাংস ভাজা। আলু-ডিম সেদ্ধর মিশেলটা ওদের দেশে সালাদ বলে গণ্য। গল্প করতে করতে খাওয়া চললো। আমি এই প্রথম এবং এই শেষবারের মতো মার্কিনীদের বাড়িতে বানানো খাবার খাচ্ছি। ওদের হোটেল রেস্তরাঁয় মার্কিনী খাবার খেতে হয়েছে এত দিন; ও খাদ্য আমার আছে গরুর ভূসির মতো লেগেছে। শেষের দিকে একটা দোকানে চিকেন ফ্রাইয়ের স্বাদু সন্ধান মিলেছিলো। রাতের পর রাত আমি ওই মুরগীর মশলা দেয়া ঠ্যাং ভাজা খেয়েছি। বার্গার, প্যাটিস, স্যাণ্ডউইচের চেয়ে ওই মুরগীভাজা অনেক উপাদেয়।

www.nagorikpathagar.com

আজ আমেরিকান খাবার খেয়ে মনে হলো– অপূর্ব। আমি বিস্মিত কণ্ঠে মিসেস চককে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আমার জন্যে বাংলাদেশী পদ্ধতিতে রেঁধেছো? তিনি বললেন, না তো। এ তো পুরোদস্তুর আমেরিকান রান্না।

আমি বললাম, এ তো আমার কাছে বাংলদেশী খাবারের মতোই সুস্বাদু লাগছে। ব্যাপার কি?

চকের বউ ব্যাপার বলতে পারলেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম ঘটনা কোথায়। বাসায় বানানো খাবার সারা পৃথিবীতেই দোকানের খাবারের চেয়ে ভালো। দোকানের খাবার একদিন দুদিন ভালো লাগতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন নয়।

খাবার শেষ চক আমাকে খুঁজে পেতে এনে দিলেন একটা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকা। ১৯৭২ সালের একটা ইস্যু। প্রচ্ছদ কাহিনী বাংলাদেশ। একটা নতুন জাতির জন্ম। জিওগ্রাফিকের সাংবাদিক বাংলাদেশে এসেছেন। দেখে গেছেন আশায় প্রেরণায় উদ্বেল একটা নতুন স্বাধীন দেশ। গেছেন ময়মনসিংহে, বঙ্গবন্ধুর জনসভা দেখতে। কথা বলেছেন নীলিমা ইব্রাহিমের মতো নারী নেত্রীদের সঙ্গে, দেখেছেন পাকিস্তানী বাহিনীদের হাতে নিগৃহীতা নারীদের দুর্দশা ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া। রিকশায় চড়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া– বাংলাদেশের মানুষ আকারে ছোটখাটো ও দুর্বল, কিন্তু এতো পরিশ্রমের কাজ তারা করছে কি করে? আর নিস্পৃহ নিরাসক্ত সাংবাদিক দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছেন আসন্ন দুর্ভিক্ষের পায়ের ছাপ, উদ্বিগ্ন হয়ে ভেবেছেন– এতো ছোট দেশে এতো মানুষ, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, মানুষ খাবার পাবে কোথায়? তবু সর্বত্র তিনি দেখেছেন আশার আর সংকল্পের আলো।

'৭৪-এর দুর্ভিক্ষের বীজ যে ৭১-এই উপ্ত ও ৭২-এই অংকুরিত হয়েছিলো, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের এই সংখ্যাটি পড়লে বোঝা যায়। বাংলাদেশের অনেকগুলো চমৎকার রঙিন ছবি আছে পত্রিকাটির এই সংখ্যায়। পত্রিকাটি আমি চক এসির কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে ধার নিলাম।

আমেরিকার ছ'সপ্তাহে আমি বাংলাদেশী, ভারতীয়, চাইনিজ, জাপানী, ইতালিয়ান, মেক্সিকান, গ্রীক আর আমেরিকান খাবার খেয়েছি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যদি ফরাসি খাবার হয়, তবে বোধ হয় ফরাসি খাবারও খেয়েছি। এর মধ্যে গ্রীক খাবারের দোকানে তালিকা পড়ে আমি সবচেয়ে মজা পেয়েছি। কারণ শিক কাবাব পাওয়া যায়। তার নাম শামি কাবাব কি সুতি কাবাব। এটা কিভাবে সম্ভব হলো, আমি জানি না। পৃথিবীটা গোল বলেই বোধহয় যেখান থেকে রওনা দেয়া যায়, সেখানেই পৌঁছা যায়। সেই কাবাবের সঙ্গে আবার সাদা ভাত দেয়া হয়। কলার‍্যাডো স্প্রিংসে আমি বারদুয়েক ইতালিয়ান রেস্তরাঁয় গেছি, ঠাণ্ডা ও গরম সামুদ্রিক মাছ খেয়েছি। তেমন মজা পাইনি। কিন্তু নিউ ইয়র্কের রাস্তায় অসংখ্য ইতালিয়ান পিজার দোকান। এবং কতো বিচিত্র কম্বিনেশনের পিজা যে পাওয়া যায় সেসব দোকানে। এবং সবগুলোই খেতে অপূর্ব।

www.nagorikpathagar.com

খাবার নিয়ে কলারাডো স্প্রিংসের শেষ গল্পটা করি। দুপুর বেলা ওয়াইন হেলম্যান আমাকে নিয়ে চললো লাঞ্চ করাতে। সে আগের দিন বলে রেখেছিলো। আনিস, চলেই তো যাচ্ছো, শেষদিনটা এক সঙ্গে দুপুরে খাবো। ফলে আমি চক এসি ও জোসেফকে ফেলে রেখে চললাম ওয়াইনের সঙ্গে। আরো একজন রিপোর্টার যোগ দিলো আমাদের দলে। তিনজনে একটা ইতালিয়ান রেস্তরাঁয় গেলাম ওয়াইনের গাড়িতে। ড্রিংকস হিসাবে প্রতিদিন বরফ ছাড়া কোক খাই। আজ ওয়াইনের দেখাদেখি নিলাম কোল্ড টি, শীতল চা। ভয়ংকর স্বাদ। চাপাতা মনে হয় পানিতে ধুয়ে সেই পানি বরফ যোগে খেতে দিয়েছে। তিন জনে নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে খাবার বাছাই করলাম। খাওয়া শেষ হলো। ওয়েট্রেস বিল দিয়ে গেলো। ওয়াইন হেলম্যান নিজের খাবারের দাম পকেট থেকে বের করে দিয়ে তার সহকর্মী রিপোর্টারকে বললো, তোমার হয়েছে সাত ডলার। তারপর আমাকে বললো, আনিস, তোমার ছয় ডলার বিল হয়েছে, তুমি কি দেবে?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মনে মনে বললাম, এই যদি ব্যাটা তোমার মনে ছিলো, তবে আগের দিন আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছিলে কেন। চক এসি আর জোসেফ আজ আমাকে তাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার টেবিলে না পেয়ে কতো মন খারাপই না করেছে।

তবে এ নিয়ে আমার মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ, আমরা তো দেশে যখন যার যার তার তার ভিত্তিতে হোটেল রেস্তরাঁয় খাই, তখন বলি, আজ খাওয়া হবে আমেরিকান স্টাইলে।

শেষদিনে গেজেট টেলিগ্রাফ অফিসে বিদায় নিতে গিয়ে বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। বিশেষ করে ড্যান, জোসেফ, আর চক এসির জন্যে খারাপ লাগতে লাগলো। মামার বাড়িতে এসে রবিবাবুর ফটিকের যে অবস্থা হয়েছিলো, এখানে আমার অবস্থা হয়ে পড়েছিলো তেমনি। ড্যান, জোসেফ আর চকের অপ্রত্যাশিত স্নেহ বন্ধুত্ব আমার কাছে ছিলো এক উজ্জ্বল উদ্ধার। যে কলারাডো স্প্রিংস ছাড়তে পারলেই আমি বেঁচে যাই, সেই কলারাডো স্প্রিংসের তিনটি মানুষের জন্যে আমার মন কাঁদতে লাগলো। হায়, পৃথিবী কতো বিচিত্র। কতো অপ্রত্যাশিত ভালোবাসা আমরা এ পৃথিবীতে পেয়ে যাই।

দেশী পণ্য কিছুটা বিপদ

৪ নভেম্বর। সকাল ৭টা চক এসি এলেন সস্ত্রীক। সঙ্গে চমৎকার গাড়ি। আগের রাতেই বাঁধাছাদা সব করে রেখেছি। একটা বড় সুটকেস, আরেকটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ, মালপত্র সব গাড়িতে তুলে আমরা রওনা হলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে।

এয়ারপোর্টে এসে সুটকেসটা গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে বিপদ ঘটলো। হাতল গেলো ভেঙে। সেটাও কোনো মতে সামলানো যেতো। কিন্তু চেইন গেলো খুলে।

www.nagorikpathagar.com

ভেতর থেকে আমার গোপন অগোপন যতো টুকরা-টাকরা জিনিস, বাজারের ব্যাগ ছিঁড়ে পড়া পেঁয়াজ রসুন ছোটমাছের মতো বেরিয়ে পড়তে লাগলো।

চক এসি অবশ্য ততক্ষণে বিদায় নিয়েছেন। এয়ারপোর্টের রিপোর্টিং কাউন্টারে আমি আমার ছিন্নভিন্ন সংসার নিয়ে হয়ে পড়লাম মহাবোকা।

কাউন্টারে বিমান কোম্পানির কর্মচারী বললেন, কোত্থেকে এই কোরিয়ান সুটকেস কিনেছেন, এতো ১০ ডলারের সস্তা সুটকেস।

একে তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, তার ওপর সস্তার খোটা। আমি নিতান্তই মাথা-ঠাণ্ডা নীতি নিয়ে কান্না ও রাগ চেপে গেলাম।

অথচ সুটকেসটা মোটেও ১০ ডলারের নয়, এবং কোরিয়ান নয়, আদি অকৃত্রিম বাংলাদেশী। দাম ১২০০ টাকা। মানে ৩০ ডলার।

এই সুটকেসটা কিনেছি ঢাকার নিউমার্কেট থেকে। প্রথমে একটা চীনা সুটকেস দেখলাম, দাম চাইল ১২০০ টাকা। তারপর এই বাংলাদেশীটা। এটার দাম দোকানী দাবী করলো ১৪০০। সুটকেসটা দেখতে খুব সুন্দর। বিক্রেতা পণ্যের গুণগান করতে শুরু করলো। বিশাল বিশাল আছাড় মেরে দেখালো এই সুটকেস তারা নিজেরা বানিয়েছে, এর শক্তি পাঁচটনী ট্রাকের মতো, কিছুতেই এটা নষ্ট হবে না। আমার সঙ্গে ছিলো মেরিনা। ও বললো, ১২০০ টাকায় দেবেন? আমি প্রমাদ গুনলাম। কিন্তু ভদ্রলোক, দাম বলে তো চলে আসতে পারি না। দোকানী পরম আগ্রহে সুটকেসটা আমাদের গছিয়ে দিলো। কেনার পর থেকেই মনের ভেতরে শুরু খচ্ খচ্। বাংলাদেশী সুটকেস কি কেনা উচিত হলো? থাক, যা হবার হয়ে গেছে। স্বদেশী পণ্য, কিনে হও ধন্য।

কাউন্টারের কর্মচারী বললো, আমার কাছে একটা ব্যাগ আছে। ৪০ ডলার দিলে তোমার কাছে বেচতে পারি। তখন আমার কূল নাই কিনার নাই অবস্থা। নগদ নগদ কিনে নিলাম। সুটকেস থেকে খানিক জিনিসপাতি বের করে ব্যাগে ভরলাম। তারপর সুটকেসের চেইনটা লাগানোর চেষ্টা করে দেখলাম- লাগলো। আল্লাহ বাঁচালেন। এ যাত্রা ইজ্জত রক্ষা। যেন কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেলো।

www.nagorikpathagar.com

মফস্বল থেকে নিউইয়র্কে

কলারাডো স্প্রিংস থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে বিমানে চড়ে বসে আছি। সন্ধ্যার দিকে পৌঁছাবো নিউ ইয়র্কের লাগরডিয়া এয়ারপোর্টে। বেশ ভয় ভয় লাগছে। কারণ এই প্রথম আমেরিকার কোনো এয়ারপোর্টে আমাকে কেউ নিতে আসবে না। একা একা এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যেতে হবে ট্যাক্সি নিয়ে। এদিকে কলারাডো স্প্রিংসে যেই শুনেছে আমি শেষ সপ্তাহটা কাটাবো নিউ ইয়র্কে, সেই আঁতকে উঠেছে। সর্বনাশ, নিউ ইয়র্ক, ও তো অপরাধের নগরী। জোসেফের মা, চক এসির বউ বার বার করে বলে দিয়েছেন- নিউ ইয়র্কে কখনো একা একা চলাফেরা করবে না; রাতে বাইরে যাবে না। ওয়াশিংটন ডিসিতে এলজবিয়েটা বলে দিয়েছে, এয়ারপোর্টে অনেকেই কিন্তু তোমাকে লিফট দিতে চাইবে, প্রাইভেট গাড়ি করে পৌঁছে দিতে চাইবে, ইয়েলো ক্যাব ছাড়া উঠবে না।

আমেরিকায় পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেলো, কোনো বিপদআপদ হলো না, সুতরাং নিউ ইয়র্কে গিয়ে যে বিপদে পড়বো, আমি সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত। এ ছাড়াও সবাই বলেছে, নিউ ইয়র্ক নোংরা শহর, ফুটপাতে হকারের ভিড়- সব মিলিয়ে ওটা আমার ভালো লাগবে না মোটেও।

আমি এ নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেছিলাম নিউ অরলিন্সে থাকা আমাদের বন্ধু তাজুলের সঙ্গে। তাজুল হেসে বলেছিলো, শোনো, তুমি যখন রংপুর থেকে ঢাকায় প্রথমবার যাচ্ছো, তোমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন তোমাকে সাবধান করে দেয়নি? নিউ ইয়র্কের বাইরে যারা থাকে, তারা সবাই নিউ ইয়র্ককে অকারণে ভয় পায়। ঢাকার রাস্তায় রোজ একটা দুটো একসিডেন্ট বা ছিনতাই ঘটে না? এর ভয়ে কি তুমি ঢাকার রাস্তায় বেরুনো বন্ধ করেছো? তাজুলের এ যুক্তি অকাট্য।

তবু লাগরডিয়া এয়ারপোর্টে নেমে আমার বিশাল লটবহর নিয়ে বেরুতে বেরুতে যখন সত্যি সত্যি রাত্রি নেমে এলো, আমার ভয় লেগে গেলো। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই তো রাত্রি হয়।

www.nagorikpathagar.com

ট্রলিতে মালপত্র তুলে ঠেলতে ঠেলতে প্রথমে গেলাম এয়ারপোর্টের তথ্যকেন্দ্রে– ট্যাক্সি পাবো কোথায়? ওরা পাশের দরজা দেখিয়ে দিলো। বেরুলেই ইয়োলো ক্যাব অর্থাৎ হলুদ ট্যাক্সির লাইন।

ওই দরজা দিয়ে বেরুতে যাবো, একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক এগিয়ে এলো। তোমার কাছে কি ৫০ সেন্টস খুচরো হবে? আমি কানাডা থেকে এসেছি। আমেরিকান মুদ্রা পকেটে নেই, একটা ফোন করা দরকার।

আমি তাকে মার্কিন কয়েন দিলাম, বিনিময়ে সে আমাকে দিলো কানাডীয় পয়সা। ওটা নেবো না নেবো না করেও নিলাম, স্মারক চিহ্ন হিসেবে।

এয়ারপোর্টের গেটে সারি সারি ট্যাক্সি। একটা ঘর থেকে যাত্রীদের সিরিয়াল টিকেট দেয়া হচ্ছে। সেই টিকেট দেখিয়ে একটার পর একটা ট্যাক্সিতে ক্রম ঠিক রেখে যাত্রীরা উঠে পড়তে পারে সহজেই।

আমার সিরিয়াল অনুযায়ী যে গাড়িটি আমার পাবার কথা, আরেকজন অতিব্যস্ত যাত্রী সেটাতে উঠে পড়লেন। তিনি যাবেন জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে, কানেকটিং ফ্লাইট ধরতে। তাঁর তাড়া আছে।

ওই ট্যাক্সির ড্রাইভারটা দেখতে ছিলো বাঙালি বাঙালি। ওটা হারিয়ে আমি একটু মনঃক্ষুণ্ন হলাম। পরের ট্যাক্সি এগিয়ে এলো নিমেষেই। ড্রাইভার জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যেতে চাও, ম্যানহাটান?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

ড্রাইভার উৎসাহভরে নেমে আমার বিশাল বিব্রতকর বাংলাদেশী সুটকেস, সদ্য কেনা ব্যাগ ইত্যাদি গাড়ির পেছনে রাখতে সাহায্য করলো। গাড়ি ছেড়ে দিলো।

ড্রাইভারটা দেখতে সুদর্শন, স্মার্ট। চেহারায় মনে হয় ভারতীয়।

জিজ্ঞেস করলাম, আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া?

সে বললো, নো, আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ।

জানে পানি এলো। বললাম, ভাইরে, আমিও বাংলাদেশ থেকেই এসেছি।

এই ট্যাক্সিচালকের নাম রিয়াদ। বাড়ি মাগুরা। আড়াই বছর আগে এসেছেন এ দেশে। বললাম, আমি তো ভাই পাঁচ সপ্তাহেই এদেশে ভাজা ভাজা হয়ে গেছি, আপনার দেশের কথা মনে পড়ে না?

বললেন, ভাই, বাংলাদেশ দেখি স্বপ্নে, বাংলাদেশ হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। বাংলাদেশে থাকতে অনেকের চোখেই আমেরিকা ছিলো স্বপ্নের দেশ, আর এখন স্বপ্নের দেশ হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। রিয়াদের দীর্ঘশ্বাস নিউ ইয়র্কের সেই সন্ধ্যাটিকে বিষণ্ন করে ফেললো।

তবে মজাও লাগলো। কলারাডো স্প্রিংসে বাঙালির দেখা পেতে ২৪ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, আর প্রথম লগ্নেই নিউ ইয়র্কে পেয়ে গেলাম স্বদেশীকে।

লুইস নিউ ইয়র্ক হোটেল, লেক্সিংটন এভিনিউয়ে। বিশাল হোটেল। লবীতে এমন ভিড় যে ধাক্কাধাক্কি করতে হয়। গোসল-টোসল সেরে হোটেল থেকে বেরুলাম খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যায় নাকি এই খোঁজে।

www.nagorikpathagar.com

একটা মনোহারি দোকানে ঢুকলাম চকলেট কিনতে। রাতে মঞ্জু আসবেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাসায় যাবো। মঞ্জু হচ্ছেন মঞ্জুরুল ইসলাম। ভোরের কাগজের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। চলে এসেছেন নিউ ইয়র্কে। তাঁর স্ত্রী সীমা মেরিনার আবাল্য বন্ধু। তাঁদের ছেলে পৃথুর জন্যে এই চকলেট কেনা।

দোকানী দেখলাম শার্টের ওপরে সোয়েটার পরেছে। কলার বেরিয়ে আছে। বুঝলাম– এ ব্যক্তি এদেশের অরিজিন্যাল নয়। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ভারত থেকে এসেছো? বললেন, না, বাংলাদেশ থেকে। আর কি! মাতৃভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিলাম।

আমি বললাম, আপনার দোকানে হাল্কা খাবার তো কিছু নেই। কেক-টেক পাওয়া যাবে কোথায়?

তিনি বললেন, পাশের রাস্তায় যান। ওখানে একটা খাবার দোকানে দুজন বাঙালি আছেন। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। বড়ো খাবারের দোকান। অনেক কর্মচারী। একজনের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম ইনিই তিনি। দুটো কলা, একটা কেক নিয়ে দাম দেবার লাইনে দাঁড়িয়ে বললাম, ভাই আমি বাংলাদেশের, আপনি? উনি বললেন, উনিও।

বললাম, পাশের হোটেলে আছি। উনি কিছুতেই দাম নেবেন না। চোখ টিপে বললেন, চলে যান। দাম লাগবে না। উনি এ দোকানের কর্মচারী। মালিক নন। আশেপাশে অন্য দেশের কর্মচারী। দাম দেয়া-না দেয়া নিয়ে ঝগড়া করলে ওর চাকরির ক্ষতি হতে পারে ভেবে দাম না দিয়ে কেটে পড়লাম।

এরপর আর আমি কোনো বাঙালি চেহারার লোক দেখে ইণ্ডিয়ান কিনা জিজ্ঞেস করিনি। সরাসরি জিজ্ঞেস করেছি বাংলাদেশী কিনা। বিদেশী দোকানীরাও যখন আমার দেশ জানতে চেয়েছে, জিজ্ঞেস করেনি ইণ্ডিয়ান কিনা, সরাসরি জিজ্ঞেস করেছে– বাংলাদেশ থেকে এসেছো?

দীর্ঘদিন নির্জন শহরে থাকার পর অনেক বাঙালির মধ্যে এসে পড়ে আমার মনে হলো– নিউ ইয়র্ক হলো একটুকরা বাংলাদেশ।

কলার‍্যাডোয় আমি রাতের খাবার খেতাম সন্ধ্যা ছটায়, ঘুমিয়ে পড়তাম রাত ন'টায়। আর নিউ ইয়র্কে? আমাকে নিতে মঞ্জু এলেন রাত সাড়ে দশটায়। ওরা থাকেন কুইন্সে। ট্যাক্সি করে আমরা তার বাসায় হাজির হলাম। সীমা খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। পোলাও কোর্মা রুইমাছ। তারপর শুরু হলো গল্প। কতো গল্প। রাত দুটোর সময় হুঁশ হলো। তখন মঞ্জু বললেন, চলেন, নিউ ইয়র্কটা একটু দেখে আসি। বেরিয়ে পড়া গেলো। এবার আর ট্যাক্সিতে নয়, সাবওয়েতে। পাতাল রেলে।

প্রথমে ফিরে এলাম লেক্সিংটন এভিনিউতেই। সেখানে গেলাম একটা রেস্তরাঁয়। রেস্তরাঁর নাম কস্তুরি। আজ্ঞে, কস্তুরিই। ভেতরে দুতিনটা টেবিল জোড়া দিয়ে বসে আছে এক দল যুবক। টেবিল চাপড়ে কোরাস গাইছে, 'মন শুধু মন ছুঁয়েছে...।'

www.nagorikpathagar.com

এরা সবাই ট্যাক্সিচালক। সারারাত ট্যাক্সি চালান। সময় পেলে এ হোটেলে আসেন। পরস্পর দেখা হয়, বাঙালি খাবার খাওয়া হয়। খাবার পাওয়া যায় সব ধরনের। পোলাও, কোর্মা, খিচুরি, রসগোল্লা, সন্দেশ। হোটেলের মালিক বাঙালি। তার স্ত্রী নিজে চা বানাচ্ছেন। এক কোণায় বড় পর্দার টিভি। দেয়ালে বাংলাদেশের নানা দৃশ্য ফ্রেমবন্দি হয়ে ঝুলে আছে।

আমরা গিয়ে বসলাম একটা টেবিলে, চা, মিষ্টি খেলাম। সেই টাক্সিচালক রিয়াদ সাহেবের সঙ্গে ফের দেখা হলো। তিনি বললেন, কি ভাই চিনতে পারছেন না? সত্যি চিনতে পারিনি প্রথম দফায়। অথচ মাত্র ৮ ঘন্টা আগেই তাঁর ট্যাক্সিতে উঠেছি।

মঞ্জু বললেন, চলেন, আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা দেখিয়ে আনি। মঞ্জু আর সীমা নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন। রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে গেলাম ওদিকটায়। সেদিন ছিলো ৪ নভেম্বর– ঘড়ির কাঁটা যেহেতু ১২টা পেরিয়েছে, বলা দরকার ৫ নভেম্বর ৯৫। শনিবার রাত। উইকএন্ড। আজ কোথাও এদের হারিয়ে যাবার নেই মানা জোড়ে জোড়ে। রাস্তার ধারে অসংখ্য বার, নাইটক্লাব। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা বেরুচ্ছে বার থেকে, শিথিল পায়ে। মঞ্জু বললেন, শুক্রবার আর শনিবার রাতটা কে যে কার সঙ্গে কোথায় কাটায়, কে তার খোঁজ রাখে। বাসায় ফেরে রোববার বিকেলে। সোমবার থেকে আবার কাজ / ক্লাস।

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এলাকা থেকে আমরা চললাম টাইম্‌স স্কয়ারে। দি নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স অফিসের পাশে বিশাল বিশাল ট্রাক। কাগজ ছাপা হয়ে ট্রাকে উঠছে।

টাইম্‌স স্কয়ার। নানা বিল্ডিংয়ের দরজায় নিয়নবাতির সাইনবোর্ড। জীবন্ত পুতুল, লাইফ পিপ শো, থ্রি এক্স ছবির বিজ্ঞাপন। প্রকাশ্যে, বড় বড় হরফে। কোনো রাখঢাক নেই। মঞ্জু বললেন, এসব চারআনা আটআনার দোকান। মানে ২৫ সেন্টস ৫০ সেন্টস দিলে জানালা খুলে যাবে, ভেতরে দেখা যাবে নগ্নিকাদের। তারপর জানালা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আবার দিতে হবে চার আনা / আট আনা।

টাইম্‌স স্কয়ার আরেকটি কারণে বিখ্যাত। নিউ ইয়ারের প্রথম লগ্নটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয় এখানে। নেমে আসে বিগ অ্যাপেল। আমি ১লা জানুয়ারি ওখানে কখনো ছিলাম না। তাই জানি না বিগ অ্যাপেল জিনিসটা কি। তবে নিউ ইয়র্ককে বলা হয় বিগ অ্যাপেল। এটা আসলে এদের পর্যটন ব্যুরোর পসার বাড়ানোর বিজ্ঞাপনী কৌশল।

১৯২০-৩০ এর দশকে জ্যাজ গায়করা নিউ ইয়র্ককে বড় আপেলের সঙ্গে তুলনা করে গান গাইতেন। নিউ ইয়র্ক তাদের কাছে ছিলো সফলতার গাছে সবচেয়ে বড়ো আপেলটি। পর্যটন ব্যুরো সেই বিগ অ্যাপেলকে নানাভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে ১৯৭১ থেকে। পোস্টার, ব্যানার, স্টেশনারি জিনিস, শপিং ব্যাগ সব কিছুতেই জুড়ে দেয়া হচ্ছে বিগ অ্যাপেলের ছবি।

www.nagorikpathagar.com

ভোর হয়ে এলো এ সড়ক ও সড়কে হাঁটতে হাঁটতে। নিউ ইয়র্কে রাতে বাইরে থেকো না– এই পরামর্শকে ধুলোয় লুটিয়ে প্রথম রাতটাই আমি কাটালাম ঘরের বাইরে, রাস্তায়।

হোটেলে ফিরলাম সকাল ছটায়। মঞ্জু বাসায় ফিরে গেলেন। আজ সোমবার। সন্ধ্যার আগে আমাদের কোনো প্রোগ্রাম নেই। আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

কিছু তথ্য : নিউ ইয়র্ক

এয়ারপোর্ট থেকে ম্যানহাটান কোন্ পথে এলে পথ সংক্ষিপ্ত, ট্যাক্সিভাড়া পড়বে কম, শিখিয়ে দিতে গিয়ে মঞ্জু বলেছিলেন, কুইনস বড়ো ব্রিজ দিয়ে আসবেন। বড়ো মানে কি? বিগ ব্রিজ? মঞ্জু হেসে বলেছিলেন, না, নিউ ইয়র্ক পাঁচটা borough-র সমষ্টি– ম্যানহাটান, ব্রংক্স, ব্রুকলিন, কুইন্স আর স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড। ম্যানহাটান হলো একটা দ্বীপ। এর পশ্চিমে হাডসন নদী, অন্যদিকে ইস্ট রিভার, উত্তরে ও উত্তরপূর্বদিকে উপসাগর। নিউ ইয়র্কের খ্যাতি পৃথিবীর রাজধানী বলে, তার সবই কিন্তু ম্যানহাটানেই। ম্যানহাটানে জায়গার দাম খুব বেশি, কতো বেশি আমার জানা নেই। রাজপথ এখানে সরু, দুপাশে সব গগনচুম্বী ভবন, আকাশ দেখা যায় না বললেই চলে। রাস্তা সব উত্তর দক্ষিণে আর পূর্ব-পশ্চিমে ছক করে টানা। উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি যে পথগুলো গেছে, সেসব হলো এভিনিউ– এভিনিউয়ের নাম আছে, যেমন আমার হোটেল লেক্সিংটন এভিনিউতে। আর আড়াআড়ি গেছে স্ট্রীট, সেগুলো নাম্বার দিয়ে চিহ্নিত। এর মধ্যে কয়েকটা এভিনিউ আবার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম, ৭ম হিসেবে পরিচিত। নিউ ইয়র্কের রাস্তা যানজটের জন্যেও খুব বিখ্যাত।

নিউ ইয়র্কের লোকসংখ্যা ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ৭৩ লাখ। ১৯৯৫ এ নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বেশি। এর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম এখানে ইহুদি। মুসলিম আছে ১.৫% ভাগ। বাংলাদেশের বাঙালি কতোজন আছে সঠিক পরিসংখ্যান নেই, বলা হয় একলাখ, তবে যেহেতু বহুজন এসেছে অবৈধভাবে মোট সংখ্যা তিন / চার লাখ হতে পারে। বাঙালি যে সংখ্যায় অনেক সেটা রাস্তাঘাটে বেরুলেই বোঝা যায়। সাবওয়েতে উঠলে অন্তত দু'টি কণ্ঠ পাওয়া যায় বাংলায় কথা বলছে। নিউ ইয়র্কে দেশীভাই এতো যে প্রথম প্রথম বাঙালি দেখে যে পরম আগ্রহভরে এগিয়ে গেছি, দুই দিন পর তা করা হয়েছে বাহুল্য। সর্বত্র বাঙালি। তবে রাস্তায় আছে বেশি, অফিস আদালতে কম। ভারতীয়দের বেলায় ঘটনা উল্টো, ওরা রাস্তা মোছে কম, অফিস আদালতে উচ্চপদে আসীন বেশি।

নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটা খবর দেখলাম, আমি নিউ ইয়র্কে থাকতে থাকতেই, অইংরেজি ভাষী শিশুদের লেখাপড়ার সমস্যা নিয়ে। একটা স্কুলের ১০০ জন ছাত্রের

www.nagorikpathagar.com

পরিসংখ্যানে দেখা গেলো সর্বাধিকসংখ্যক ছাত্র চীনা– ২৬ জন, এরপরে বাংলাদেশী ২২ / ২৩ জন।

অন্য কোনো দেশের ছাত্রের সংখ্যা ১০ জনের বেশি নয়। নিউ ইয়র্ক টাইমসে বড়ো করে ছবি ছাপা হয়েছে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের।

নিউ ইয়র্ক শহরের মোট আয়তন ৩০১ বর্গমাইল, এর মধ্যে ম্যানহাটান ২২.৭ বর্গমাইল।

শ্যামল বাংলা

নিউ ইয়র্কে বাংলা পত্রিকা আছে চার-পাঁচটি। প্রতি রোববার দুপুরে ঘণ্টাখানেকের জন্যে কোনো এক প্রাইভেট চ্যানেলের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে প্রচারিত হয় বাংলা টিভি প্রোগ্রাম 'শ্যামল বাংলা'। ৫ নভেম্বর ৯৫ টিভি খুলে শ্যামল বাংলায় দেখলাম প্রচারিত হচ্ছে এ সপ্তাহের নাটক। বিটিভির সাপ্তাহিক নাটক ভিসিআরে রেকর্ড করে সেই ক্যাসেট দেখিয়ে দেয়া হয়। কপিরাইটের বালাই নেই। এ ছাড়া এখানে রেকর্ড করা ছোটখাটো অনুষ্ঠানও থাকে। অ্যামেচারিজমের চূড়ান্ত অবস্থা। থাকে ছায়াছন্দ। বিটিভির কাট টু কাট।

বাংলা বইয়ের দোকান আছে। পত্রপত্রিকার মধ্যে যায় যায় দিন আর বিচিত্রা পাওয়া যায় নিয়মিত। ভোরের কাগজ বা অন্য দৈনিক পত্রিকা যায় সপ্তাহে একবার। বাংলাদেশ থেকে শিল্পীরা গিয়ে গানের অনুষ্ঠান করছেন– এমনটা হয় প্রায়ই।

রোববার বিকেলে মঞ্জুর নেতৃত্বে গেলাম একটা বাঙালি বাসায়। এখানে কয়েকজন সাংবাদিক থাকেন মেস করে। দেশে এরা ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক। এখানে সবাই ট্যাক্সি চালান। তাদের সঙ্গে করে বেরুনো গেলো। আবার লেক্সিংটন এভিনিউ। কস্তুরীতে গিয়ে দেখি বিশাল ব্যাপার। চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের সমাবেশ। সভা হচ্ছে। ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে সভা। আজ ৫ নভেম্বর। সভার উদ্যোক্তা নিউ ইয়র্ক আওয়ামী লীগ। নিউ ইয়র্কে আওয়ামী লীগ আছে, বিএনপি আছে। জাতীয় পার্টি, গণফোরাম, জাসদও আছে সম্ভবত।

আমরা কস্তুরীতে ঢুকে পড়লাম। চা খেতে খেতে আরেকজন সাংবাদিক কাম ট্যাক্সিচালক বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি জানেন আমরা এখন কস্তুরীতে থাকবো। তিনি ছাত্রাবস্থায় শিবিরের নেতা ছিলেন। এখন আর পলিটিক্স করেন না, পেটের ধান্দা করেন। তিনি এলেন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখলেন আওয়ামী লীগের ব্যানার। সঙ্গে সঙ্গে 'ধুরো' বলে চরম ঘৃণা প্রকাশ করে বেরিয়ে গেলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঠিকই গেয়েছেন– বাঘে-মহিষে খানা একসাথে খাবে না। শিবির কর্মী সাবেক হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগকে কতোটা শত্রু মনে করে! আর আওয়ামী লীগ! দুঃখ হয় ভেবে! বক্তাদের বক্তৃতা শুনলাম খানিকক্ষণ। চুপচাপ মন দিয়ে। অনুভাই নামে একজন চমৎকার বলছেন। ৩রা নভেম্বর কিংবা

www.nagorikpathagar.com

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়ে দেশের রাজনীতি সুস্থ ধারায় ফিরে আসতে পারে না, বললেন তিনি।

শুধু আওয়ামী লীগ বিএনপি নয়, নিউ ইয়র্কে আছে নানা আঞ্চলিক সমিতি। এর মধ্যে বিয়ানিবাজার সমিতির প্রকাশিত পুস্তিকা দেখে চক্ষু স্থির। বিরাট কমিটি। বিশাল তাদের কর্মকাণ্ড।

এক ডজন সাংবাদিকের পুনর্মিলন

সন্ধ্যায় আমাদের হোটেলের লবীতে গোল হয়ে বসলাম সবাই। ১২ দেশের ১২ জন সাংবাদিকের বসার কথা। কিন্তু উপস্থিত ১১ জন। একজন নেই। ইন্দোনেশিয়ার ধিনাম। উনি চলে গেছেন দেশে। দেশ থেকে খবর এসেছিলো, তার ছেলের খুব অসুখ। তার ছেলে কেমন আছে, সেই তথ্যটা আর জানা গেলো না।

পরদিন, ৬ নভেম্বর, সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম নিউ ইয়র্ক শহর গাড়ি করে ঘুরে দেখতে। এই গাড়িটা মাইক্রোবাসের মতো। তবে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সম্ভবত একে বলা যায় নিউ ইয়র্ক স্পেশাল। নিউ ইয়র্ক দেখতে গেলে কেবল গাড়ির জানালা দিয়ে পাশে তাকালেই চলবে না, ছাদ দিয়ে আকাশে তাকাতে হবে। সে জন্যে এই গাড়ির ছাদেও আছে জানালা। মানে ছাদটা কাচের তৈরি।

গাড়িটা পর্যটকদের জন্যে তৈরি। তবে লণ্ডন থেকে আনা লাল দোতলা পর্যটক বাস নয়। নিউ ইয়র্কে কিছু ট্যুরিস্ট বাস আছে, দোতলা, লণ্ডনী, দোতলার ছাদ নেই। সেই খোলা দোতলায় বসে পর্যটকরা শহর দেখে বেড়ায়।

গাড়ির ড্রাইভার শুধু ড্রাইভার নন, গাইডও। তিনি বিভিন্ন পয়েন্টে থামছেন, আর ধারাবিবরণী দিচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে গাড়ি থামালেন। এখানে কিছুদিন আগে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, তার বর্ণনা দিলেন সবিস্তারে। উল্টো দিকে একটা চমৎকার ভবন। আমরা ঢুকলাম। সেই ভবনটি ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল সেন্টারের উইন্টার গার্ডেন। বিশাল বিশাল পাম গাছ, কিন্তু গাছগুলো সবই ঘরের ভেতরে, ওপরে কাচ। এই শীতকালীন গৃহপালিত বাগানে কিছুদিন আগে একটা বড়ো অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। জাতিসংঘের ৫০ বছর উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, সেই অনুষ্ঠানটা হয়েছিলো এখানেই। সেই বিশাল ভবনে নানা দোকান আছে, আছে কফি খাবার রেস্তরাঁ। আমরা কফি খেতে গেলাম। ওয়েটারের পোশাক পরে দু'জন টেবিল পরিষ্কার করছেন। চেহারা দেখেই বুঝলাম দেশীভাই। আলাপ করতে এগিয়ে গেলাম। ওরা তেমন উৎসাহ দেখালেন না। ভবনের বাইরে হাডসন নদী। নদীর ওপর পাড়ে দ্বীপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। সেন্ট্রাল পার্ক। ম্যানহাটানের মধ্যে এক বিশাল বন। এটা এমনভাবে তৈরি যে এর ভেতরে গেলে আর কোনো বিল্ডিং দেখা

www.nagorikpathagar.com

যাবে না। যে কেউ ম্যানহাটানে থেকেই ফিরে পেতে পারে সেই অরণ্য, এই নগরের বদলে। পার্কের ভেতরে মোটর গাড়ি যায় না, ঘোড়া গাড়ি যায়। সব ধনীর বাড়ি এই পার্কের দিকে মুখ করা। হলিউডের বড়ো বড়ো তারকাদের বাড়ি এখানে। কোনটা কোন তারকার বাড়ি গাইড সব বলে যেতে লাগলেন।

চীনা শহর ও হারলেম

চায়না টাউন। চীনে নয়, নিউ ইয়র্কে। এই শহরে গিয়ে মনে হলো যেন চীনেই এসেছি। সাইনবোর্ড সব চীনা অক্ষরে। দোকানী সবাই চীনা, এমনকি ক্রেতাও সব চীনা। চীনারা এদেশে এসেছিলো রেললাইন বানানোর শ্রমিক হিসেবে। এখনো রয়ে গেছে তারা, নিজেদের সব চৈনিকতা বজায় রেখে। একেবারে নিউ ইয়র্ককে বানিয়ে রেখেছে চীনা শহর।

হারলেম। হারলেম নদীরে তীরে। এ অংশে ঢুকেই দেখা গেলো দারিদ্র্যের চিহ্ন। ভবনগুলো সব পুরনো। এ অংশে থাকে কালোরা। অপরাধের স্বর্গরাজ্য বলে এমনকি পুলিশও নাকি ভয় করে এলাকাটাকে। আমাদের গাইড বললেন, রাতের বেলা এখানে আসবে না। শোনো, সারা পৃথিবীতে সব শহরেই কিছু জায়গা থাকে, যেখানে রাতে যেতে নেই। কিছুদিন আগে দুজন বিদেশী এ এলাকায় এসেছিলো রাতের বেলা। সঙ্গে দামী ক্যামেরা। তারা শ্যুটিং করতে চায়। ক্যামেরা নিয়ে আর ফিরতে পারেনি। এটা তাদের বোকামি। তোমরা কি রাত্রিবেলা তোমাদের শহরের পার্কে যাও?

গাড়ি চলছে। একটা জায়গায় পথের ধারে উঁচু জমি। পথটাই নিচুতলে। ড্রাইভার সেই উঁচু জমির পাশটার দিকে আঙুল তুললেন। নিখাদ পাথর।

বললেন, এই দেখো, নিউ ইয়র্কের মাটি, মাটি নয় আস্ত শক্ত পাথর। নিউ ইয়র্কের সয়েল কণ্ডিশন খুবই ভালো। একারণে এই মাটিতে বড়ো বড়ো হাই রাইজ বিল্ডিং বানানো সম্ভব হয়েছে।

সংবাদপত্রের এথিক্স ক্লাসে

৬ নভেম্বর বিকেলেই আমাদের প্রোগ্রাম নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটিতে। ওখানকার কমিউনিকেশন বিভাগের প্রফেসর রিচার্ড কানিংহামের কক্ষে। তিনি বক্তৃতা দেবেন সংবাদপত্রের নৈতিকতা বিষয়ে।

আমরা তাঁর রুমে ঢুকলাম। তিনি তাঁর টেবিলের এক পার্শ্বে, অপরপার্শ্বে সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম আমরা। আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংবাদ সংগঠনের কোডস অফ এথিক্স নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন।

এর মধ্যে সোসাইটি অফ প্রফেশনাল জার্নালিস্টস-এর কোড্স এফ এথিক্স নিয়ে একটু আলোচনা করা যায়।

www.nagorikpathagar.com

এই সংগঠন বিশ্বাস করে সাংবাদিকদের কাজ সত্যের সেবা করা।

মানুষের কল্যাণই তাদের ব্রত।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব, কারণ মুক্ত সমাজে এটা মানুষের এক অপরিহার্য অধিকার।

সত্য জানার জনগণঅধিকার ছাড়া অন্য সব বিষয় থেকে সাংবাদিকরা নিজেদের দায়মুক্ত রাখবেন।

এথিক্স

১. উপহার, আনুকূল্য, বিনা পয়সায় ভ্রমণ, বিশেষ যত্ন বা সুবিধা সাংবাদিকদের সততা ক্ষুণ্ন করতে পারে। মূল্যবান কোনো কিছুই গ্রহণ চলবে না। সাংবাদিক ও মালিকপক্ষ কেউ এসব সুবিধা নেবেন না।

২. অন্য কোনো চাকরি, রাজনৈতিক সংযুক্ত, সরকারি চাকরি, সামাজিক সংগঠনে চাকরি বর্জন করতে হবে যদি সাংবাদিক কিংবা মালিকের সাধুতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সম্ভাব্য কিংবা অনিবার্য স্বার্থের সংঘাত থেকে যাতে নিজেকে দূরে রাখা যায় সাংবাদিক ও মালিকপক্ষ সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিজের ব্যক্তিজীবন পরিচালনা করবেন।

৩. নিউজ ভ্যালু না থাকলে সোর্সের সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কোনো সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

৪. বাধা এলে তা ডিঙ্গিয়েও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ খুঁজে বের করে প্রকাশ করতে হবে। সরকারি কাজ জনসমক্ষে করা হবে এবং সরকারি দলিল উন্মুক্ত রাখা হবে– এ জন্যে সাংবাদিকরা সারাক্ষণ তৎপরতা চালাবে।

৫. গোপন সূত্র গোপন রাখার অঙ্গীকারকে তারা সম্মান জানাবে।

৬. অন্যের লেখা, ভাব, খবর চুরি অসততা ও অগ্রহণীয়।

শুদ্ধতা ও বস্তুনিষ্ঠতা

এ ছাড়া সংবাদের শুদ্ধতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে হবে। ভুল রিপোর্ট কিংবা অস্বচ্ছতার কোনো অজুহাত নেই। শিরোনামের সঙ্গে ভেতরের খবরের মিল থাকতে হবে। আলোকচিত্র যেন সঠিক চিত্র তুলে ধরে, অকারণে ছোট বিষয়কে বড়ো করে না তোলে। রিপোর্ট ও মত আলাদা হবে। সংবাদ প্রতিবেদন মন্তব্যমুক্ত পক্ষপাতমুক্ত হবে, সংশ্লিষ্ট সব মহলের বক্তব্য দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

অভিযুক্তকে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। পাপ ও অপরাধের উৎসাহবহ বিশদ বর্ণনা দেয়া যাবে না।

ভুল হলে দ্রুত সংশোধনী দিতে হবে। সাংবাদিক তার খবরের জন্যে জনগণের কাছে দায়ী থাকবে।

এই ক্লাসে জানলাম, সাংবাদিকেরা কারো কাছে কেনো উপহার নেবেন না। কেবল ক্রিসমাস উপহার নিতে পারবেন, কিন্তু তার দাম কিছুতেই ১০ ডলারের বেশি হতে পারবে না।

আমাদের দেশে সাংবাদিকতার নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশিতই হয় স্বার্থের কারণে, জনগণের তথ্য পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়। সরকারি প্রচারযন্ত্রের কাজ দলবাজি, বেসরকারি সংবাদপত্রগুলো কোনটি কেন কার স্বার্থে বেরিয়েছে প্রত্যেকটাই হতে পারে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের দারুণ বিষয়। প্রায় প্রত্যেকেরই আছে বৈষয়িক স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ।

এবার বলি ১ নং এথিকসের কথা। এতে বলা হয়েছে বিনা পয়সায় ভ্রমণ করা যাবে না। ফ্রিডম ফোরাম মিডিয়া স্টাডিজ সেন্টারের 'মিডিয়া স্টাডিজ জার্নাল' (হেমন্ত ১৯৯৫) সংখ্যায় আর্জেন্টিনা ও আমেরিকার সাংবাদিকতার তুলনা করতে গিয়ে অ্যানা ব্যারন লিখেছেন, 'একজন আমেরিকান সাংবাদিক কখনোই প্রেসিডেন্ট কিংবা মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে তার ভ্রমণের খবর কাভার করতে যাবেন না। আর্জেন্টিনায় এটা একটা সাধারণ ঘটনা।'

একই কথা সত্য বাংলাদেশের বেলায়। আমরা, প্রায় সব সাংবাদিকই, প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে বিদেশ যেতে পারলে ধন্য হয়ে যাবো। অন্য সব সংবাদপত্র কিংবা সাংবাদিকের কথা বাদই দিলাম। *যায় যায় দিন* সম্পাদক শফিক রেহমান প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার সঙ্গে গেছেন বেইজিং। *ভোরের কাগজ* সম্পাদক মতিউর রহমান গেছেন নিউ ইয়র্ক। এসব অবশ্য এ দেশের প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শ্রদ্ধেয় আতাউস সামাদ যখন বেগম জিয়ার সঙ্গে একই বিমানে বেইজিং যান তখন বুঝতে হবে, এসব বিষয় নিয়ে কেউ মোটেও চিন্তা-ভাবনাও করেন না। আমাদেরকে সম্ভবত সংবাদপত্রের নৈতিকতা বিষয়ে আরো বহু পথ অতিক্রম করতে হবে, একজন আদর্শ সাংবাদিক পেতে আরো বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

নৈতিকতা শিক্ষা শেষে উচিত শিক্ষা

নৈতিকতা বিষয়ে দেশের বড়ো বড়ো শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা সম্ভবত আল্লাহ্ পছন্দ করলেন না। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির পাঁচতলা থেকে নামার জন্যে আমরা ১২ জন লিফটে উঠলাম, সঙ্গে উঠলো আরো দুজন মহিলা। মাত্র একতলা

www.nagorikpathagar.com

নেমে লিফ্‌ট গেলো আটকে। নড়ে না, চড়ে না, লিফ্‌টের দরজাও খোলে না। ছোট্ট লিফ্‌ট।

৭ জনের ওঠার উপযোগী হবে। আমরা উঠেছি ১৪ জন। প্রচণ্ড ঠাসাঠাসি অবস্থা। লিফ্‌ট যে আটকে গেছে, সেটা বুঝতে বুঝতে ৫ মিনিট। এরপর অ্যালার্ম-এর বোতাম টেপা শুরু হলো। পাঁচ মিনিট রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। এতোক্ষণে এই ভবনে কেউ আছে কিনা, সেটাই সন্দেহের।

অ্যালার্ম বাজিয়ে চলেছি আমরা।

একটুপরে একজনের কণ্ঠ, ওপর থেকে, 'তোমরা কতোজন?'

'১৪ জন।'

'আর ইউ ওকে। তোমরা ভালো আছো?'

আমাদের সঙ্গে যে মহিলারা উঠেছেন, তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ, শিক্ষিকাও হতে পারেন। তারা বললেন, 'হ্যাঁ আমরা ভালো আছি।'

'তোমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। এমার্জেন্সি লিফ্‌ট উদ্ধারকর্মীদের খবর দেয়া হচ্ছে।'

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা। নিজের হৃদধ্বনি নিজে শুনতে পাচ্ছি। আমার কেবল মনে হতে লাগলো– হয় অক্সিজেনের অভাবে সবাই মারা পড়বো, নয়তো সবাই মিলে লিফ্‌টের শিকল ছিঁড়ে ধপাস করে পড়ে মরবো।

এর মধ্যে আছে বুলগেরিয়ার নাতাশা। সে অকারণে হাউ মাউ করে হাসছে। আমার মনে হলো, ওর গালে একটা চড় বসাই।

লিফ্‌টের ভেতরে ফোন আছে। ইন্টারকম। ওই দুই মহিলার একজন ফোন করলেন তার স্বামীকে। বললেন, 'আমার ফিরতে খানিক দেরি হচ্ছে। তুমি চিন্তা করো না।' তারপর বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করবে না, কোথা থেকে আমি বলছি। আমরা ইউনিভার্সিটির এলিভেটরে আটকা পড়ে গেছি।'

প্রায় আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। মাঝে মাঝে ওপর থেকে নারী কণ্ঠের আশ্বাসবাণী, 'তোমরা সবাই অপেক্ষা করো। ভয় পেয়ো না। এই তো উদ্ধারকর্মী এলো বলে।'

তারপর সত্যি সত্যি এক সময় লিফ্‌ট নিচে নামতে শুরু করলো। নিচতলায় এসে খুলে গেলো দরজা।

মুক্তি পেলাম আমরা। আহ্‌। মুক্তি কতো সুন্দর। বেঁচে থাকা কি আশ্চর্য সুন্দর!

সাইরেন বাজানো গাড়িতে করে এসে লিফ্‌ট উদ্ধারকারী বাহিনী উদ্ধার করেছে আমাদের। ভবন থেকে বাইরে এসে দেখলাম সেই গাড়ি।

www.nagorikpathagar.com

প্রবাসীতে

৫ নভেম্বর ৯৫। রাতে ফোন করলাম লেখক জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের বাসায়। তাঁর সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় ছিলো না। বললাম, আমি আনিসুল হক, ভোরের কাগজে কাজ করি। উনি দেশের কুশল জানতে চাইলেন। আমি কথা বলছি কয়েনবক্স থেকে। একটার পর একটা কয়েন ঢোকাতে হচ্ছে। জ্যোতি দত্ত বললেন, 'আপনি কি পাবলিক বুথ থেকে কথা বলছেন?'

আমি বললাম, 'হ্যা। হোটেলের রুম থেকে ফোন করলে আলাদা বিল দিতে হবে, অযথা বেশি খরচ পড়বে।'

নিউ ইয়র্ক। ম্যানহাটান। লেক্সিংটন এভিনিউয়ের লুইস নিউ ইয়র্ক হোটেলের নিচতলায় আমি।

উনি বললেন, 'আপনি রুমে যান। আপনার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যান। আমি রিং করছি।'

আমি লিফ্‌টে করে ওপরে রুমে গেলাম।

একটু পরে ফোন। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। এবার তাঁর কণ্ঠে উচ্ছ্বাস, 'আপনি কি গদ্যকার্টুনের আনিসুল হক?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

জ্যোতিদা বললেন, 'আপনি ফোন করার পর পূরবী বললো, এই আনিসুল হক কি সেই আনিসুল হক?'

আমি হেসে বললাম, 'পূরবীদি একদিন ভোরের কাগজ অফিসে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই আনিসুল হকটা কে? আমি একটু সংকুচিত ধরনের মানুষ। কারো সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে, কথা বলতে পারি না। সেদিনও পারিনি। তবে এই নিয়ে আমি একটা পদ্য লিখেছি। সেটা আমার নতুন বইয়ের প্রথম কবিতা–

'এই আনিসুল হকটা কে?

রাত্রি এসে খুঁজে গেছে তাকে।'

জ্যোতিদা বললেন, আগামীকাল বিকেল ৫টায় আপনার রুমে যাবো। পরদিন জ্যোতিদা এলেন। আমার হোটেলের কাছেই তাঁর অফিস। তিনি একটা প্রকাশনা

www.nagorikpathagar.com

প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। যদিও সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন। জ্যোতিদা বললেন, 'আমেরিকায় মূলধারার সাংবাদিকতায় একজনও বাংলাদেশী নেই।' অর্থাৎ আমেরিকান সংবাদ মাধ্যমে কোনো বাংলাদেশী কাজ করে না। এখানে বাংলা পত্রিকা বের করে কেউ কেউ তবে সেসব পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতে হয় কমই। কারণ বেশিরভাগ খবরই দেশ থেকে আসা নানা পত্রিকা থেকে কেটে ছাপিয়ে দেয়া হয়। দেশ থেকে পেশাদার সাংবাদিক যারা আসেন, তারা খুব একটা আর সাংবাদিকতার সঙ্গে নিজেকে জড়ান না। চুপচাপ ট্যাক্সি চালিয়ে কিংবা অন্য কোনো কাজ করে অর্থোপার্জন করেন।

জ্যোতিদার সঙ্গে গেলাম 'প্রবাসী' অফিসে। নিউ ইয়র্কের বাংলাপত্রিকা। পত্রিকা অফিসে বসে কাজ করছেন সিকদার হুমায়ুন কবির আর নিনি আপা। মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব পত্রিকার মালিক-সম্পাদক। তিনিও আছেন। রাজনীতি, সংবাদপত্র, নিরপেক্ষতা নিয়ে তর্ক শুরু হলো। এ ধরনের বিতর্ক কখনো শেষ হয় না। বিতর্ক চলতেই থাকলো।

মিনার মাহমুদের সঙ্গে

আগের রাতে মিনার মাহমুদের নাম্বারে ফোন করেছিলাম দশটার দিকে। তিনি বাসায় ছিলেন না। যিনি ফোন ধরলেন, তাকে আমার নাম আর ফোন নাম্বার জানিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত চারটার সময় ফোনের রিং। ঘুম থেকে কোনো রকমে জেগে ফোন ধরতেই মিনার মাহমুদের কণ্ঠস্বর। মিনার ভাই বললেন, 'আমি কাজে গিয়েছিলাম। এখনই ফিরলাম।' এগুলো গতরাতের ঘটনা।

আজ রাতে মিনার ভাইয়ের আসার কথা আমার হোটেলে। বসে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। এমন সময় টেলিফোন, এক কাজ করেন, আমার আর রাত্রিবেলা উজান ঠেলে যেতে ইচ্ছা করছে না, আপনিই চলে আসেন।

মিনারভাই সাবওয়েতে কিভাবে তাঁর বাসায় যেতে হবে– প্রথমে এ ট্রেন, তারপর এফ ট্রেন, এলমহার্স্ট স্টেশনে নামবেন– ধারাবিবরণী দিতে লাগলেন। আমি বললাম, এতো বলতে হবে না।

স্টেশনে নেমে কি করবো, তাই বলেন।

উনি বললেন, আপনি স্টেশন থেকে বের হয়ে একটা ফোন করবেন, আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে একবার মেল ট্রেন একবার লোকাল ট্রেন করে যথাস্থানে হাজির হলাম। পাতাল স্টেশন থেকে বেরিয়ে পাবলিক বুথ থেকে ফোন করলাম মিনার মাহমুদের বাসায়। উনি অবাক হয়ে গেলেন। একদিনেই পাতাল রেলের সবকিছু আমি জানলাম কি করে। আমি বললাম, আপনার বাসার পাশেই

www.nagorikpathagar.com

মঞ্জুর বাসা, গতকাল দিনের বেলা একা একা মঞ্জুর বাসায় আমি এই ট্রেনেই এসেছি।

মিনার ভাই মিনিটদুয়েকের মধ্যেই এসে গেলেন আমার অপেক্ষার জায়গাটিতে। পাশেই একটা দোকান থেকে শশা-টমেটো আর বিয়ার কিনলেন প্রথমে। তারপর আমরা গেলাম তাঁর বাসায়।

কুইন্সের এ জায়গাটা মোটামুটি বাঙালিদের পাড়া। এখানে আমি গতকাল নেমে একজনের কাছে মঞ্জুর বাসার লোকেশন জানতে চেয়েছিলাম ইংরেজিতে, উনি জবাব দিয়েছিলেন বাংলায়। রাস্তার দুধারে দোকানে পোস্টার– ইলিশ মাছ, একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি। বাংলায় লেখা। Buy one, get another one free-এর অনুবাদ।

কাছেই একটা মার্কেট এলাকা আছে– পুরোপুরি বাঙালপাড়া। অবশ্য নজর একটু বড়ো করলে বলা যায় ভারতীয় পাড়া। অনেকগুলো শাড়ির দোকান। সোনার দোকান। বাংলায় লেখা সাইন-বোর্ড। মঞ্জু বলেন, এখানে বাংলাদেশের সব পাওয়া যায়। শুধু খেজুরের রসটা ছাড়া।

মিনার ভাইয়ের সঙ্গে এক দোকানে ঢুকেছিলাম একদিন। দোকানী আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ। আমাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করেছিলো, কি অবস্থা? তার খদ্দেররা এতো বেশিসংখ্যক বাঙালি যে, সে অনেক বাঙলা শিখে ফেলেছে।

প্রিয় পাঠক, বিচিন্তা সম্পাদক মিনার মাহমুদকে আশা করি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। এরশাদের আমলে ৮৭ সালে যখন 'যায় যায় দিন' নিষিদ্ধ, তখন মিনার মাহমুদ বের করেন 'বিচিন্তা'। 'যায় যায় দিন' কলাম ও মন্তব্য প্রধান পত্রিকা, আর 'বিচিন্তা' ছিলো রিপোর্টিংভিত্তিক। 'বিচিন্তা'র প্রচারসংখ্যাও সেই অগ্নিঝরা দিনগুলিতে হুহু করে বেড়ে যায়। 'বিচিন্তা'র আগে মিনার মাহমুদ ছিলেন 'বিচিত্রা'য়। কতোগুলো অসমসাহসিক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে 'বিচিত্রা'য় থাকা অবস্থাতেই তিনি খ্যাতি ও বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

৮৭ সালে 'বিচিন্তা' যখন বাজারে বেশ প্রতাপ সৃষ্টি করে ফেলেছে, তখন মোজাম্মেল বাবুর (ভারপ্রাপ্ত) সম্পাদনায় বেরোয় সাপ্তাহিক 'দেশবন্ধু'। আমি তখন ছাত্র। বুয়েট সেকেণ্ড ইয়ারে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল বাবুর পাল্লায় পড়ে আমিও এসে যোগ দিই দেশবন্ধুতে। পূর্ণ দাপটে ১০ সংখ্যা বেরিয়ে পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, এই সেই '৮৭ সাল, যার ১০ নভেম্বরে শহীদ হন নূর হোসেন। আমার সঙ্গে মিনার ভাইয়ের সম্পর্ক তাই প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার দুই কর্মীর। আমি কোনোদিনও 'বিচিন্তা'য় কাজ করিনি। তবু মিনার ভাই আমাদের ভাই, আর বন্ধু সহযোগী।

বিচিন্তা একাধিকবার নিষিদ্ধ হয়েছে। এরশাদের আমলে মিনার ভাই জেলও খেটেছেন। মিনার জেলে থাকতেই মোজাম্মেল বাবুর নেতৃত্বে বেরোয় পূর্বাভাস। সেই পত্রিকায় আমার একটা লেখা পড়ে মিনার ভাই জেল থেকে আমাকে চিঠি

www.nagorikpathagar.com

লেখেন। চিঠিটা আমি পাইনি, কিন্তু তিনি যে চিঠিটা লিখেছেন, এ-খবর আমি জেনে যাই।

মিনার ভাই জেল থেকে বেরিয়ে ওঠেন ইস্কাটনের এক হোটেলে। তখন আমি 'পূর্বাভাস' পত্রিকায় কাজ করছি। পূর্বাভাসের আরেক কর্মী আমিনুর রশীদ আমাকে নিয়ে যায় মিনার ভাইয়ের কাছে। সেই প্রথম আমাদের দেখা প্রথম দেখায় মিনার ভাই বলেছিলেন, 'আপনি ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিকতায় থাকবেন না; কিন্তু আপনার মতো ছেলেরা এ পেশায় থাকলে ভালো হতো।' মিনার ভাইয়ের সেদিনের পূর্বাভাস এখন পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি, কারণ আমি সাংবাদিকতায় রয়ে গেছি, এবং তাতে কারো কিছুমাত্র ভালো হয়েছে বলেও কোনো প্রমাণ নেই।

পরবর্তীকালে যতোদিন বিচিন্তা পুনঃপ্রকাশিত হয়নি তিনি 'পূর্বাভাস' অফিসে আসতেন নিয়মিত। সেটা ৯০ / ৯১ সালের কথা। তসলিমা নাসরিন তখন পূর্বাভাসের কলাম লেখক। দুজনেই অফিসে আসতেন। এটা ওটা কথা বলতেন। আবার তসলিমা একা এলে মিনার ভাইকে ফোন করতেন। পূর্বাভাসে আসাআসি করতে করতেই দুজনে একদিন বিয়ে করেন। তসলিমা পূর্বাভাসে লিখলেন, 'তসলিমা এখন থেকে ঘরকন্না করবে, ভাত রাঁধবে, স্বামীর সেবা করবে' ইত্যাদি।

'বিচিন্তা' বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় কি দিয়েছে, সেটা নানাভাবে ব্যাখ্যেয়, কিন্তু একটা কথা সত্যি, আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় যে এক ঝাঁক নতুন সাংবাদিক উচ্চপদে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন, তাদের অনেকেরই শুরুটা হয়েছে 'বিচিন্তা'তে। 'বিচিন্তা' অনেককে রিপোর্টার বানিয়েছে।

মিনার ভাইকে আমি প্রথমেই বললাম, 'ওই গল্পটা কি সত্যি?'

'কোনটি?'

'ওই যে, আপনি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন। এক যাত্রী আপনাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার দেশ কোনটা।'

আপনি বললেন, 'বাংলাদেশ।'

যাত্রী বললো, 'তুমি তসলিমা নাসরিনের নাম শুনেছো?'

আপনি বললেন, নাম শুনবো কি; ও তো আমার বউ ছিলো। যাত্রী তখন সোজা পুলিশ ডেকে বললো, 'এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ধরো। এ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।'

মিনার ভাই বললেন, 'না তো, শুনিনি।'

'তাহলে কি গল্পটা মিথ্যা?'

এ প্রশ্ন করার দরকার ছিলো না। যাকে নিয়ে গল্প তিনিই যদি না শোনেন, তাহলে নিশ্চয়ই গল্প সত্যি নয়।

www.nagorikpathagar.com

মিনার ভাইয়ের থলে থেকে

মিনার ভাইয়ের বাসার ড্রইংরুম। উনি একটার পর একটা বিয়ার খাচ্ছেন। আর গল্প করছেন। মিনার ভাই ভালো কথক। তবে তার গল্পের বেশির ভাগই ট্যাক্সি ড্রাইভারদের গল্প। প্রথম গল্পটা বাঙালি ড্রাইভারদের সততার।

নিউ ইয়র্কের পুলিশ এক ফন্দি করলো। ট্যাক্সিচালকদের সততার পরীক্ষা নেয়া হবে। তারা ১০০টা ট্যাক্সির প্রতিটিতে ১০০ ডলারসহ মানিব্যাগ ফেলে গেলো যাত্রীবেশে উঠে। এর মধ্যে মাত্র ৩ জন ট্যাক্সি ড্রাইভার ফেরত দিলো মানিব্যাগ। ৯৭ জনই দিলো মেরে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই তিন ড্রাইভারের তিনজনই বাংলাদেশের। সেই সততার খবর বেরুলো নিউ ইয়র্কের নিউজ ডে নামের পত্রিকায়। সারা নিউ ইয়র্কবাসী জেনে গেলো, বাংলাদেশের মানুষ সৎ।

মিনার ভাই বললেন, এরপর থেকে যাত্রীদের কাছে আমাদের কদর গেছে বেড়ে। সেদিন এক প্যাসেঞ্জার আমার দেশের নাম শুনেই খুশি, ও, তাহলে তোমার গাড়িতে আমার সব কিছু ফেলে রেখে গেলেও ক্ষতি নেই, তুমি ঠিক আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

বাংলাদেশের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় সে গাড়ি চালায়। একদিন এক প্যাসেঞ্জার তার গাড়িতে ফেলে রেখে গেলো একটা ব্যাগ। সেই ব্যাগে হাজার হাজার ডলার। বাঙালি যুবক সেই ব্যাগ নিয়ে বিপদে পড়লো। কারণ এর মালিকের ঠিকানা সে জানে না। তার মনে পড়লো যাত্রীটিকে একটা বড়ো বিল্ডিংয়ের সামনে সে নামিয়ে দিয়েছে। সেই বিল্ডিংয়ে গেলো সে। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। অজস্র ফ্ল্যাট। নিচতলায় অসংখ্য ডোরবেলের সুইচ। বুদ্ধি করে যে একটার পর একটা সব সুইচে টিপ দিলো। প্রত্যেক বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কেউ কি ট্যাক্সিতে কিছু ফেলে এসেছো। অবশেষে প্রকৃত মালিককে পাওয়া গেলো। মালিক অভিভূত। তিনি অর্থপুরস্কার দিতে চাইলেন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। বাঙালি বললো, আমি নিতে চাইলে তো পুরোটাই নিতে পারতাম। কোনো দরকার নেই। একটা সেন্ট না নিয়ে সে তার গাড়ি নিয়ে মিশে গেলো নিউ ইয়র্কের জনারণ্যে।

মিনার ভাই একটা সোফায় গা এলিয়ে বসেছেন। তাঁর হাতে বিয়ারের ক্যান। রান্নাঘরে মিনার ভাইয়ের গৃহবন্ধু (হাউজ মেট) রান্না করছেন। গরুর মাংসের মসলার গন্ধে বাতাস মৌ মৌ।

মিনার ভাইকে আজ গল্পে পেয়েছে। এবার তিনি বললেন এক বাংলা জানা জাপানীর আমেরিকা ভ্রমণের গল্প। সেই গল্পটা একটু সবিস্তারে বলি।

www.nagorikpathagar.com

তাকিহিরোর নিউ ইয়র্ক জয়।

তাগোচি তাকিহিরো। এক জাপানী যুবক। বেশ কিছুদিন বাংলাদেশে ছিলেন, বিকেএসপি-তে। সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে। বাংলাদেশে থেকে বাংলাটা তিনি শিখে ফেলেছেন বেশ।

তাকিহিরো এলেন নিউ ইয়র্কে। কোনো পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি উঠলেন মিনার মাহমুদের ব্যাচেলরস কোয়ার্টারে।

রান্নাঘরে মিনার ভাই ব্যস্ত। তাকিহিরো ড্রয়িং রুমে। মিনার ভাই ডাক দেন, তাকিহিরো।

তাকিহিরো জবাব দেয়, আসতেছি।

তাকিহিরোকে নিউ ইয়র্ক দেখানোর জন্যে মিনার ভাই বেরুলেন আরেকজন বন্ধুসহ। প্রথমে তারা গেলেন একটা বাঙালি মালিকের ক্যাসেটের দোকানে। তাকিহিরোকে দেখে দোকানী এগিয়ে এলো সাহায্যার্থে, 'ক্যান আই হেল্‌প ইউ?'

মিনার ভাই বললেন, 'এই জাপানী ভদ্রলোককে কিছু গানের ক্যাসেট দেখান।'

'কি ধরনের ক্যাসেট?' দোকানী জানতে চাইলো।

তাকিহিরো বাংলায় বললো, 'আব্দুল আলীমের গান হবে?'

বাঙালি সেলসম্যান বিস্ময়ে বিমূঢ়। একি কথা শুনি আজ জাপানীর মুখে?

আব্দুল আলীমের ক্যাসেট পাওয়া গেলো না। তারা একটা ফিল্ম নিলেন। দোকানী কিছুতেই দাম নেবে না।

এবার তারা গোপনে আরেকটা দোকানে। এই দোকানেও সেলসম্যান দুজন বাঙালি। তাকিহিরো একা এক কোণে এটা সেটা জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। সেলসম্যান দু'জনের সন্দেহ হলো। তাদের একজন বললো আরেক জনকে, 'এই ব্যাটা জাপানী খালি জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করতেছে, ব্যাপার কি, মতলব ভালো না মনে হয়।'

তাকিহিরো গম্ভীর স্বরে তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি চোর না।'

দোকানী দুজন হতভম্ব। 'কি নেবেন ভাই নেন, দাম লাগবে না।'

কল মি 'প্রেম'

নিউ ইয়র্কে বাঙালিরা সব কিছু করছে। 'জেসমিন, গ্যাস ফ্রম বাংলাদেশ' বলে ক্যাপশনের ওপরে ডজনখানেক পুরো নগ্ন কুৎসিত ভঙ্গির ছবি ছাপা হয়েছে এক বাংলাদেশী কন্যার, তারপর নিউ ইয়র্কের লক্ষ বাঙালি কিনে কিনে ঐ পত্রিকার ঐ সংখ্যাকে হটকেক বানিয়ে দিয়েছে। মিনার ভাইয়ের কাছে জানা গেলো টেলিফোনে যৌনালাপ করার বিজ্ঞাপনে একটা নাম ছাপা হয়েছে 'প্রেম'। টেলিফোন নাম্বার ১-৯০০-Prem। ৯০০ নাম্বারে ফোন করলে পয়সা দিতে হবে কলারকে। ঐ প্রেমের

www.nagorikpathagar.com

নাম্বারে ফোন করলে অপর পার্শ্বে নারীকণ্ঠ বাংলাভাষায় আপনার সঙ্গে যে কোনো বিষয়ে গল্প করবে। কেবল আপনার টেলিফোন বিলের ওজন বাড়বে।

মিনার ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাজলো রাত ১২টা। আমরা খেতে বসলাম। গরুর মাংস, ভাত, সালাদ, ডাল। পুরুষের হাতের রান্না। খেয়ে নিজের প্লেট নিজেই ধুয়ে রাখলাম। মিনার ভাই ফোনে ট্যাক্সি ডাকলেন। ট্যাক্সির ভাড়া আগাম দিয়ে রাখলেন। রাত্রি একটায় একা একা ট্যাক্সি করে কুইন্স থেকে ম্যানহাটানে আমার হোটেলে ফিরলাম। কলার‍্যাডোর মুরুব্বীদের সাবধানবাণী, নিউ ইয়র্কে রাতে বেরুবে না, একা একা চলাফেরা করবে না, কোনো কাজে লাগলো না। আপন মনেই হাসলাম, আমি এসেছি ঢাকা থেকে, ভিড় আর ছিনতাইকারীর ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ আছে।

ধিক, নিউ ইয়র্ক মেয়র!

৭ নভেম্বর ৯৫। সকালবেলা আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে। যথারীতি মেটাল ডিটেকটর গেট পেরিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম ভবনটিতে, লিফট যোগে আমাদের নেয়া হলো সদস্যদের গ্যালারিতে। নিচে বিশাল এক হলঘর, সেখানে বিভিন্ন কোম্পানির আলাদা আলাদা কাউন্টার, বড়ো বড়ো কম্পিউটার, কম্পিউটারগুলো সম্ভবত আদি আমলের। কারণ একেকটার পেছনে আলমারীর মতো বড়ো বড়ো সব যন্ত্র। কাউন্টারের সামনে হাজার হাজার মানুষের ভিড়, চেঁচামেচি মিলিয়ে দক্ষযজ্ঞ।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ এটা। আর ওয়াল স্ট্রীট এখন পরিণত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স কার্যালয় দেখতে। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে। বস্তুনিষ্ঠ খবরের জন্যে প্রথম থেকেই এ পত্রিকাটি অর্জন করে এসেছে পাঠকদের আস্থা। দশ লাখেরও ওপরে এর প্রচার সংখ্যা। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স ইদানীং বাংলাদেশের খবর, বাঙালিদের খবরকে গুরুত্ব দিচ্ছে, এর কারণ নিউ ইয়র্কে বাঙালি অনেক। পত্রিকা অফিসে লাইনো টাইপ মেশিন থেকে পুরনো বহুকিছু রেখে দেয়া হয়েছে মিউজিয়াম পিস হিসেবে। ১৯৬৯ সালে চাঁদের পিঠে মানুষের অবতরণের খবরঅলা কাগজটি বিরাট সাইজে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে দেয়াল জুড়ে। আর দেয়ালভরা পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের ছবি ও পরিচিতি। সেই তালিকা দীর্ঘ, কারণ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স। এ পত্রিকাটির মূল অংশ এখনো বেরোয় সাদায় কালোয়। পত্রিকাকে রঙিন তারা এখনো করেনি। তবে রঙিন পত্রিকা ছাপানোর মেশিন তারা বসাচ্ছে। কারণ হিসেবে তারা মনে করে রঙিন পত্রিকা হলো রঙিন টেলিভিশনের মতো, সাদাকালোকে একদিন না

www.nagorikpathagar.com

একদিন তা প্রতিস্থাপিত করবেই। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিট কভার করেন বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকেরা।

আমাদের দুপুরের খাবার খাওয়ালেন পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি বিভাগের পরিচালক জন লী। সঙ্গে ছিলেন আরো কিছু কর্মকর্তা ও অতিথি। কথা প্রসঙ্গে তারা জানালেন, তাদের সাংবাদিকেরা বাইরের কারো কাছ থেকে কোনো ধরনের উপহার গ্রহণ করে না। কেবল ক্রিসমাস উপহার ফিরিয়ে দেয় না। তবে এক্ষেত্রেও শর্ত হলো– সেই উপহারের দাম ১০ ডলারের বেশি হতে পারবে না।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের বই সমালোচনা সারা দুনিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন হাজার হাজার বই আসে তাদের ঠিকানায়। এসব বই রাখতে তাদের যতো বড়ো রুম দরকার তা দেয়া সম্ভব নয় বলে বই ফেলে দিতে হয়। তবে নিউ ইয়র্ক টাইমস আমাদেরকে একটা চমৎকার ট্রাভেল ব্যাগ উপহার দিয়েছে, সেটা আমরা মোটেও ফিরিয়ে দেইনি। বিকেলে আমাদের হাজির হবার কথা ছিলো নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র Rudolf Giuliani'র সাংবাদিক সম্মেলনে। কিন্তু এই প্রোগ্রামটা বাতিল হলো। এলজবিয়েটা বললো, এর আগে তোমাদের কোনো প্রোগ্রাম বাতিল করতে হয়েছে?

আমরা বললাম, না।

এলজবিয়েটা বললো, তাহলে এই প্রোগ্রামটা কেন বাতিল হলো, বলো। কারণ ইনি হলেন রাজনীতিবিদ। রাজনীতিবিদরা কথা দেন কথা না রাখার জন্যই।

রুডল্ফের সামনে হাজির হতে না পেরে আমি খুব বড়ো বাঁচা বেঁচে গেলাম। কারণ আমি যাকে রাজনৈতিকভাবে পছন্দ করি না, তার সামনে পড়তে চাই না।

রুডল্ফ সম্প্রতি একটা বাজে কাজ করেছেন। অমি তখন কলার‍্যাডোয়। খবরের কাগজে পড়লাম– জাতিসংঘের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে বিশ্বনেতারা হাজির হয়েছেন, তাদের জন্যে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এক কনসার্টের আয়োজন করেছিলো। ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাতও যথারীতি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে আরাফাতকে দেখে ক্ষেপে যান মেয়র। তিনি আরাফাতকে বের করে দেন হল থেকে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন অবশ্য মেয়য়ের আচরণের নিন্দা করেন। খবরটি পড়ে আমার খুব রাগ হলো। মেয়র বলেছেন, আমি সেই সব মার্কিনীদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারি না, যারা প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছেন।

আমি ইহুদিবিদ্বেষী নই। কোনো মুসলিম অন্যায় করলে কেবল মুসলিম বলে তাকে আমি ক্ষমার চোখে দেখবো– এ আমার মানসিকতা নয়। কিন্তু একজন লোক আমার বাড়িতে এলে আমি তাকে অপমানিত করবো না। সে যদি আমার শত্রু হয়, তবু না। আমি বরং 'অপূর্ব প্রতিশোধ' কবিতার মতো মেহমানদারী করে তার চলে যাবার সময় বললো, তুমি আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে যাও, এবং এরপরে তোমাকে পেলে আমি খুন করবো।

www.nagorikpathagar.com

পিএলও দাবী করেছে, তাদেরকেও অন্য সব দেশের মতো আমন্ত্রপত্র দেয়া হয়েছিল। এরপরেও মেয়র আরাফাতকে অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দের সামনে এ অপমানটা করেছেন। সেটা তিনি করেছেন নিহতদের সম্মান দেখানোর জন্যে- এ দাবি আসলে ঠিক নয়। এর পেছনে কাজ করেছে রাজনীতি। নিউ ইয়র্কে ইহুদিরা জনসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তর। ভোটের রাজনীতি মাথায় রেখে মেয়র এ কর্ম করেছেন বলেই সবার ধারণা।

এই মেয়রের সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেলাম আমি।

ব্রডওয়ে শো

ব্রডওয়ে নিউ ইয়র্কের একটা রাস্তা। অনুবাদ করলে দাঁড়ায় প্রশস্ত পথ। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, নিউ ইয়র্কের কোনো রাস্তাই প্রশস্ত নয়। নিউ ইয়র্কের নগর পরিকল্পকরা যথেষ্ট দূরদর্শী ছিলেন বলে মনে হয় না, দুদিকে বিশাল বিশাল ভবন- এই রাস্তাগুলো আর চওড়া করার কোনো উপায়ই নেই।

তারা হয়তো ভেবেছিলেন, জালের মতো বিস্তৃত অসংখ্য রাস্তা থাকছে, সংখ্যাই আসল, বিস্তারটা তেমন ব্যাপার নয়, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে- ট্রাফিক জ্যাম নিউ ইয়র্কের নিত্যসঙ্গী। পার্কিং এ শহরের আরেক সমস্যা, এমনিতেই গাড়ি পার্ক করার জায়গাগুলো সব সময় থাকে পূর্ণ, তারওপর সেগুলো খুবই ব্যয়বহুল। এসব কারণে, আমেরিকার অন্য শহরগুলোর মতো নিউ ইয়র্কে প্রত্যেকের একটা করে গাড়ি থাকতেই হবে এমন নয়, বরং গাড়ি না রাখাই ওই শহরে সুবিধাজনক। ফলে বহুলোক ব্যবহার করছে গণযানবাহন- টিউব রেল, পাবলিক বাস। আর মানুষ হাঁটছে। নিউ ইয়র্ক হলো আরেক ঢাকা, পথে পথে মানুষ আর মানুষ, ফুটপাতে পসরা বসানো ফেরিওয়ালাও আছে। আমেরিকানরা নিউ ইয়র্ককে তাই তেমন পছন্দ করে না। আমার কাছে নিউ ইয়র্ক একমাত্র মার্কিন শহর যাতে প্রাণ আছে, মানুষ আছে, যে শহরটাকে মনে হয় না নির্জন গ্রহ, কিংবা পরিত্যক্ত মহেঞ্জোদারো।

ব্রডওয়ে একটা রাস্তা, কিন্তু এই রাস্তাটা আমাদের বেইলি রোড, নাটক সরণী। ভুবন বিখ্যাত হলো ব্রডওয়ে শো। ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকতেই এলজবিয়েটা, আমাদের প্রকল্প পরিচালিকা, বলে দিয়েছেন- তোমাদের ব্রডওয়ে শো দেখাতে নিয়ে যাবো নিউ ইয়র্কে। ব্রডওয়েতে নাট্যশালা আছে ৩০০টিরও বেশি। ৩৫টি থিয়েটার সেখানে বছরে ৩০টির মতো প্রডাকশন নামিয়ে থাকে। বছরে ৩০ লাখের মতো দর্শক হয়। নভেম্বরের ৭ তারিখে সন্ধ্যায় আমরা চললাম এক ব্রডওয়ে শো দেখতে, ব্রডওয়েতে। নাটকের নাম 'ক্রেজি ফর ইউ'। বাংলা করলে হবে, 'তোমার জন্যে দিওয়ানা'। শুবার্ট থিয়েটারের প্রযোজনা।

www.nagorikpathagar.com

আমরা মোট ১২ জন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেদিন। কোনো ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছিলো না ব্রডওয়ে অভিমুখে। কিন্তু ট্যাক্সিচালকদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো এদের মধ্যে বাঙালি সুপ্রচুর। শেষে একজন চালকের সঙ্গে যখন ইংরেজিতে কথা বলে জানা গেলো তিনি ওদিকে যেতে রাজী নন, আমি বাঙলায় বললাম– কেনরে ভাই যাবেন না। এবার ফল শুভ হলো। তিনি বললেন, উঠুন। ওদিকটায় না যেতে চাইবার কারণ যানজটভীতি।

ট্যাক্সিচালক এই বাঙালিটির বয়স কম। দেখতে সুন্দর, মায়াময় চেহারা। কাগজে লিখে তার টেলিফোন নম্বর দিলেন আমাকে।

নাটকের প্রতিটা টিকেটের দাম ৮০ ডলার। এটা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট। কারণ আমাদের বসতে দেয়া হয়েছে চারতলায়। মূল্যহ্রাসের কারণে টিকেট কেনা গেছে ৪০ ডলার করে।

বিশাল নাট্যশালা। নাটক শুরু হবার আগে আমাদের বলা হলো– তিনতলা ফাঁকা আছে, আমরা ইচ্ছা করলে এক ধাপ নিচে নেমে এক ধাপ উন্নতি ঘটাতে পারি আসনের। গেলাম সবাই।

ক্রেজি ফর ইউ-এর প্রচারপত্রে বলা হয়েছে অল সিংগিং, অল ড্যানসিং-নাচে গানে হাস্যকৌতুকে ভরপুর। নাটক শুরু হলো। মিউজিক্যাল অপেরা। বড় লোকের ছেলে। বাবা-মা বিয়ে দিতে চান। ছেলে বিয়ে করবে না। নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে সে তাই গেলো একটা ছোট্ট শহরে। সেই শহরে থাকে একটা মেয়ে। নায়িকা। নায়ককে প্রথম থেকেই তার অপছন্দ। শহরে এলো এক নাট্যকোম্পানি।

ছেলেটিও তাতে নাটক করে। মেয়েটির পছন্দ নাটকের বুড়ো নির্দেশককে। নায়ক তখন বুড়ো নির্দেশক সেজে আসে নায়িকার কাছে। দুজনে তুমুল প্রেম। এরপর এক সময় দেখা যায় দুজন বুড়ো নির্দেশক। কে আসল কে নকল।

শেষে যখন ছেলের বাবা মা ছেলের খোঁজে আসে এই ছোট শহরে তখন নায়ক নায়িকার মিল দেখিয়ে মধুরেন সমাপয়েৎ। হাসির কাহিনী। সম্ভবত হাস্যকরও। কিন্তু অসাধারণ অভিনয়। তার চেয়েও অসাধারণ সংগীত আর অসাধারণ নৃত্য। কথায় কথায় দল বেঁধে গান, কথায় কথায় দল বেঁধে নাচ। তারো চেয়ে অসাধারণ হলো সেট। কথায় কথায় স্টেজে তিনতলা চারতলা ভবন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কথায় কথায় মঞ্চে ঢুকে পড়ছে আস্ত মোটর গাড়ি।

শুবার্ট থিয়েটার বিখ্যাত থিয়েটার। এর আগের প্রযোজনাগুলোয় এরা অসংখ্য এমি এওয়ার্ড পেয়েছে। নাটক দেখে মনে হলো অর্থ আর প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো খেলা। চাকচিক্য বেশি। এর পাশে আমাদের থিয়েটার নিতান্তই দুয়োরানী। বনের ধারে পর্ণকুটিরে বাস। 'কেরামত মঙ্গল'-এ ঢাকা থিয়েটার কর্মীরা মঞ্চ ঘোরাতেন নিজেরা ঠেলে ঠেলে– একথা মনে হলেই তো খারাপ লাগে, আহা, বেচারাদের কতো কষ্ট। আমাদের 'বিষাদসিন্ধু'র যে গতিময়তা, যে সংগীত-নৃত্য-লোকসংস্কৃতির

www.nagorikpathagar.com

উতরোল সমাহার, সেটার সঙ্গে একটা ক্ষীণ মিল যেন দেখতে পেলাম 'ক্রেজি ফর ইউ'-এর কিংবা এস এম সোলায়মানের নাটকগুলো, যেমন ধরা যাক, 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' তার সঙ্গে স্বভাবগত একটা মিল যেন আছে এই নাটকটির। খুব উঁচু দরের শিল্প এটা নয়, তবে খুব উঁচু দরের প্রডাকশন।

আমি অবশ্য খুবই এনজয় করেছি। এতোগুলো ছেলেমেয়ে নাচছে-গাইছে-হাসছে-হাসাচ্ছে, তাতেই আমার মজা। অন্যদিকে আমার রক্তে মনে হয় একটু আদিমতা আছে। ঢোলক বেজে উঠলেই রক্তে নাচন জাগে। মনে হয়, কোনো দূর প্রাচীন বনে আদিবাসীদের দলে মিশে যাচ্ছি।

মিশে গিয়েছিলে, মিশে তো যেতেই, যদি না তোমার শীত করতো। ওই দিন কেন জানি না, আমার খুবই শীত করতে লাগলো। শার্টের ওপরে সোয়েটার, সোয়েটারের ওপরে কোট, তবু শীত যায় না। আমি মাফলারটা কানে পেচিয়ে নিলাম। সেটা দেখে আমার সঙ্গী ১১ জন হিহি করে হাসতে লাগলো। আনিস, আর ইউ কোল্ড হি হি হি হি। পূর্ব ইউরোপের এই অর্বাচীনবৃন্দের হাসিতে দমবার পাত্র আমি নই।

আমার যে এতো ঠাণ্ডা লাগলো, তবু আমি সে যাত্রা কোনো মতে টিকে গেলাম সে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। মঞ্চের মেয়েগুলো নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাকের। ওদের কি শীত লাগে না! ওরা যদি এই শীতে টিকে যেতে পারে, আমি এতোগুলো কাপড়চোপড় পরে পারবো না?

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস

৮ নভেম্বর ৯৫। সকাল ১০টায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস কার্যালয়ে। সারা পৃথিবীতে সাংবাদিক, সংবাদপত্র, সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণটাই একটা স্বাভাবিক ঘটনা; কারণ সত্য সব সময়েই সৃষ্টি করে শত্রু, আর আক্রমণের ভয়ে আপস করলে সাংবাদিকতা করা চলে না। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে সাংবাদিকতার মিত্রপক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকদের রক্ষা করতে সাংবাদিকেরা গড়ে তুলেছেন নানা প্রতিষ্ঠান– কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস তাদের একটি।

আমরা কথা বললাম এ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বিল ওরমের সঙ্গে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সারা পৃথিবীতে সংবাদমাধ্যমের ওপরে হামলার বার্ষিক প্রতিবেদনের বই দেয়া হলো আমাদের। ১৯৯৩, ১৯৯৪ সালের বই দুটো খুলে তাকালাম বাংলাদেশ অংশে।

অভ্রান্ত রিপোর্ট। জনকণ্ঠ অফিসে মৌলবাদীদের হামলা ও সম্পাদককে গ্রেফতার, ভোরের কাগজে বোমা হামলা, তসলিমা প্রসঙ্গ সবই আছে– সংক্ষেপে, কিন্তু যথাযথভাবে।

www.nagorikpathagar.com

এই প্রতিষ্ঠানকে অমি ধন্যবাদ জানালাম ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে। গেলো বছর ভোরের কাগজের সিরাজগঞ্জের সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো সন্ত্রাস দমন আইনে; তখন সিপিজে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের দেশে তোমরা কিভাবে সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করো।

ওরা জানালো, সরকারের সঙ্গে ওদের নিয়মিত দেনদরবার চলে। ওদের সরকার ওদের সঙ্গে কথা বলাকেও কর্তব্য বলেই জানে।

'আর অন্য দেশে সাংবাদিকদের ওপরে হামলা হলে তোমরা কিভাবে ব্যবস্থা নাও।'

'আমরা বিবৃতি দেই, সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে বার্তা দেই, সবকিছু ব্যর্থ হলে আমরা মার্কিন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করি যেন তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে ঐ দেশটির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিবেচ্য হয়।'

সিপিজে'র এশিয়া অংশের কর্মসূচী সমন্বয়ক একজন ভারতীয় তরুণ। ওর নাম বিক্রম পারেখ, বিক্রম একটা ভালো কাজ করেছেন ভারত বিষয়ে, কাশ্মীর বিষয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে সাংবাদিকদের কতোখানি অসুবিধা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়তে হয়, তা নিয়ে। বিক্রম আমাকে উপহার দিলেন তার বইটি।

নিউজউইক ম্যাগাজিনে

নিউজউইক ম্যাগাজিনের ভবনে নিউজউইক ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র সম্পাদক মাইকেল গ্লেনন-এর সঙ্গে বৈঠক ছিলো ৮ নভেম্বর ৯৫ সকাল সাড়ে এগারোটায়। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো চারটি সংবাদপত্র নিয়ে বলেছি, এটা হলো পঞ্চম পত্রিকা। একই ধরনের বিষয় নিয়ে বার বার কথা বলা শ্রোতাদের বিরক্তিকর। সুতরাং এই বিষয়টি আমি সংক্ষিপ্ত করতে চাই।

এই শিক্ষাটাও কিন্তু নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তাদের সঙ্গে থেকেই পাওয়া। ওরা বললেন, আমরা এমন কোনো রচনা পত্রিকায় ছাপতে চাই না, যা পড়তে ক্লান্তি লাগে। এমনকি বিষয়টা যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তবু না। যে কোনো বিষয় উপস্থাপনে আমাদের প্রধান শর্ত– রচনাটি পড়তে ভালো লাগতে হবে।

আহা, আমাদের পত্রিকাগুলো আর লেখাঅলা আর টিভিঅলারা যদি এই সহজ কথাটা বুঝতেন! যে কোনো বিষয় উপস্থাপিত হোক না কেন, তা যেন ভোক্তাকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

নিউজউইক ম্যাগাজিনের একটা বর্ধিত অংশ হলো নিউজ ইন্টারন্যাশনাল। ১৯৭২ সাল থেকে তারা এই আন্তর্জাতিক সংস্করণটি বের করছে। আনন্দবাজার

www.nagorikpathagar.com

আর প্রবাসী আনন্দবাজার যেমন এক জিনিস নয়, ওদেরও দেশী আর আন্তর্জাতিক সংস্করণ এক পত্রিকা নয়। দুটোর সম্পাদকীয় বিভাগও আলাদা। নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনাল সারা দুনিয়ার ১৯০টি দেশে চলে, ছাপা হয় ১০ লাখ ৪৫ হাজার। এর মধ্যে আমরা পাই এশিয়ান সংস্করণ। জাপানী ও কোরীয় ভাষায় এর আলাদা সংস্করণ বেরোয়। প্রধানত বেরোয় আটলান্টিক আর ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণ।

আর অকৃত্রিম যে নিউজউইক সেটা আমেরিকায় চলে ৩১ লাখেরও বেশি। এই পত্রিকাটি ওয়াশিংটন পোস্ট হাউজেরই একটা প্রকাশনা।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি

'আমেরিকা হচ্ছে সেই দেশ লিবার্টি যেখানে স্ট্যাচু।' মার্কিনীদের স্বাধীনতা নিয়ে ব্যাজস্তুতি কম হয়নি। ব্রিটিশ কবি অ্যাডরিয়েন মিচেল এই দেশটাকে বলছেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ হরিব্‌ল আমেরিকা। আর অ্যালেন গিন্সবার্গ? থাক এফ দিয়ে শুরু কোনো চার অক্ষরের ইংরেজি শব্দ আমি এখন বলতে চাই না। আমি বলতে চাই না বটে, কিন্তু মার্কিনীদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ কিন্তু এটি। অতিসুন্দর দুটো তরুণ তরুণী হেঁটে যাচ্ছে, তাদের কথা কানে আসছে, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে অন্তত একবার এফ...

মিনার মাহমুদ বলে রেখেছেন, ৮ নভেম্বর বুধবার দুপুর থেকে আমি ফ্রি। আপনাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। আপনি কোথায় যেতে চান?

আমি বললাম, স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে।

হোটেলের রুমে মিনার ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। বেলা দুটোর দিকে মিনার ভাই এলেন। হোটেলের নিচতলা থেকে ইন্টারকমে ফোন করলেন। আমি ততোক্ষণ বিরক্ত হয়ে রুম ছেড়ে নিচে নামছি। মিনার ভাই ফোন করেন, রিং হয়, কেউ ধরে না। এমন সময় স্বয়ং আমি নিচে নেমে হাজির।

মিনার ভাই বললেন, আপনার জন্যে আজ আমি কোনো কাজ রাখিনি। আজ আমার মন খুব ভালো।

আমি বললাম, ঘটনা কি?

তিনি বিশদ বর্ণনা দিতে লাগলেন। আমরা দুজন একটা রেস্তরাঁয় দুপুরের খাবার খেতে বসলাম। স্যাণ্ডউইচ।

মিনার ভাই বললেন, আজকে আমার একটা মামলা ছিলো।

আমি বললাম, মিনার ভাই, মামলার অত্যাচারে দেশ ছাড়লেন, এখানে এসেও মামলা। সাপ্তাহিক বিচিন্তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা ছিলো দেশে। শুধু মামলা করেই যে একটা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের জীবনের বারোটা বাজিয়ে দেয়া যায়, আমাদের সরকার ও ঋণখেলাপী বড়োলোকেরা তার প্রমাণ রেখেছেন। এই হলো বঙ্গদেশে বাক, ব্যক্তি ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার প্রকৃত হাল। মিনার ভাইয়ের

www.nagorikpathagar.com

ঢাকার জীবনে শেষদিকে এমন হয়েছিলো, প্রায় প্রতিদিনই মামলার তারিখ পড়তো। কাজ কর্ম সব বাদ দিয়ে আদালতপাড়ায় গিয়ে বসে থাকতে হতো।

আজ মিনার ভাই মামলা জিতেছেন। মিনার ভাই নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালান। পুলিশ তাকে টিকেট ধরিয়ে দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো– তিনি গতিসীমার অতিরিক্ত দ্রুততায় গাড়ি চালিয়েছেন এবং এরপর পুলিশের নির্দেশ মেনে যথাস্থানে থামতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আজ ছিলো এই মামলার তারিখ। মিনার ভাইয়ের বর্ণনামতে, তিনি ভেবেছিলেন শ দেড়েক ডলার ফাইন দিতে হবে তাকে। এর কারণ তাদের চালক অ্যাসোসিয়েশনের উকিলকে তিনি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন! ফলে তাকে একা একা কোর্টে হাজির হতে হয়। তবে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। পুলিশকে জেরা করার জন্য বানিয়ে এনেছিলেন ১৭টি প্রশ্ন। বিচারক ছিলেন একজন মহিলা। বিচারক অভিযোগের প্রেক্ষিতে মিনার মাহমুদের কোনো বক্তব্য আছে কিনা জানতে চান। মিনার বলেন, আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ আমি বেশি দ্রুত গাড়ি চালিয়েছি। সিগন্যালে লাল বাতি ছিলো। আমি গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলাম। সেখান থেকে স্টার্ট নিয়ে অমুক পয়েন্টে আসতে গতিসীমা কি এতো বেশি তোলা সম্ভব? দ্বিতীয়ত আমাকে যে জায়গায় পুলিশ থামতে বলেছিলো, সেখানে থামলে পেছনে বহু গাড়ি আটকা পড়তো। ট্রাফিক ল অনুসারে ঐ জায়গায় আমি দাঁড়াতে পারি না। কেবল আরেকটু এগিয়ে গিয়ে আমি যথাস্থানে গাড়ি থামিয়েছি। মিনার ভাই তার এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশকে প্রশ্ন করা শুরু করেন। ৭টি প্রশ্নের পর বিচারক জানতে চান, তোমার কি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। মিনার ভাই বলেন, সবে তো কলির সন্ধ্যা, আমার মোট ১৭টি প্রশ্ন।

বিচারক বলেন, তোমার আর প্রশ্ন করার দরকার নেই, ফাউণ্ড নট গিল্টি। অভিযুক্ত নির্দোষ।

মামলায় জিতে মিনার ভাইয়ের মনটা ফুরফুর করছে। আমরা টিউব রেলে চড়ে কিছুটা হেঁটে কিছুটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছলাম ব্যাপারি পার্ক। এখান থেকে ফেরিতে করে যেতে হবে, সার্কেল লাইন ফেরি। হাডসন আর ইস্ট রিভার যেখানে মিশেছে নিউ ইয়র্ক উপসাগরে, সেই জায়গায় একটা দ্বীপের মধ্যে এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি।

মিনার ভাই টিকেট করে আনলেন। দীর্ঘ লাইনের শেষে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘড়িতে সাড়ে তিনটা। এটাই সম্ভবত শেষ ফেরি। লাইনে শাড়িপরা দক্ষিণ ভারতীয় একটা পরিবার। একটু আগে লেক্সিংটন এভিনিউয়ের সাবওয়ে সেন্ট্রাল স্টেশনে দেখলাম একজন প্রৌঢ়া টেলিফোনে কথা বলছেন, কান পেতে বোঝা গেলো, কথা বলছেন সিলেটি ভাষায়।

ফেরি ছেড়ে দিলো। বাইরে হুহু বাতাস, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মিনার ভাই ভেতরের উষ্ণ নিশ্চিত আরামের বদ্ধতার চেয়ে ছাদের হিমশীতল হাড়-কাঁপানো উন্মুক্ততাই বেশি

www.nagorikpathagar.com

পছন্দ করবেন– এ আর বিচিত্র কি? তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আমি শীতে কাঁপতে লাগলাম।

পৌঁছুতে ২০ মিনিট কি আধঘণ্টা লেগে গেলো। লিবার্টি আইল্যাণ্ড। স্বাধীনতা দ্বীপ।

মিনার ভাইয়ের এটা ১১তম আগমন। বাংলাদেশ থেকে তার বন্ধুবান্ধব যেই আসে, তাকে নিয়ে আসতে হয় এ এলাকায়।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি পা থেকে মাথা পর্যন্ত ১৫৪ ধাপ। ভেতরটা ফাঁপা, সেখানে লিফট আছে, সিঁড়ি আছে। লিফটে করে কিছুদূর যাওয়া যায়, মূর্তিটি যে কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই উচ্চতা পর্যন্ত লিফট যায়। তারপর মূর্তির দেহ সরু হতে থাকে।

প্রথমে সিঁড়ি। তারপর আর সাধারণ সিঁড়ি নয়, ঘোরানো সিঁড়ি, সর্পিলাকৃতি। সেই সিঁড়িগুলো খাড়া খাড়া, কিন্তু খুবই চিকন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। ২২ তলা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু পেঁচানো লম্বা সিঁড়ি, কোনো রকমে একজন মানুষ উঠতে পারে এমন পরিসর। এক সময় মনে হলো এই বোকামোটা কেন করছি। স্বাধীনতা-ভাস্কর্যের শিরস্ত্রাণে ওঠার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে এক সময় নিচে নামতে শুরু করলাম। বোকামির কতোটা উচ্চতায় উঠেছিলাম দুজন, টের পেলাম নামার পর।

দুজনের পায়েই খিল ধরে গেছে। আমরা কেউ যেন আর নড়তে পারছি না। পায়ে এমন ব্যথা হলো, মিনার ভাই এরপরে ৪৮ ঘণ্টা তাতে ভুগেছেন।

নিচে নেমে রেস্তরাঁয় কফি খেলাম। একটা যাদুঘর মতো আছে, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির মোট ওজন চার লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। এই বিশাল কর্মটি মার্কিনীদের প্রতি ফরাসীদের উপহার। এটাকে কিভাবে আনা হলো, কতোদিনে বসানো হলো, সে সবের ছবি আছে এই যাদুঘরটিতে।

বাইরে এসে ভাস্কর্যটির চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। মিনার ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ভাস্কর্যটি নারী না পুরুষ। মিনার ভাই বুকের দিকে তাকিয়ে ভালো করে নিরীক্ষা করে বললেন, নারী ই তো মনে হচ্ছে।

মেয়ে তো বটেই।

একে বলা হয় মিজ লিবার্টি। ওর মুখখানা বড়ো নিষ্পাপ। সমস্ত দেহখানা কাপড়চোপড় সমেত খানিকটা সবজে, কারণটা রসায়নিক। তামার সঙ্গে সালফারের বিক্রিয়ায় নাকি এমনটা হয়েছে, খোলা আকাশের নিচে থাকতে থাকতে।

ফেরার ফেরিতে উঠলাম। এটাই শেষ ফেরি। অন্ধকার হয়ে গেছে। মিজ লিবার্টির হাতের মশালে বাতি জ্বলে উঠেছে। আমাদের ফেরি আর গেলো না এলিস আইল্যাণ্ডে। ওটা লিবার্টি আইল্যাণ্ডের পাশেই।

১৮৯২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এলিস আইল্যাণ্ড ছিলো সমুদ্রপথে আমেরিকা আগতদের ইমিগ্র্যান্ট চেকপোস্ট। বর্তমানে এটা যাদুঘর। মিনার ভাই

www.nagorikpathagar.com

বললেন, চার্লি চাপলিনের ইমিগ্র্যান্ট ছবিতে যেমন দেখা যায়, তেমনি রয়ে গেছে অবিকল, এমনকি সিলগুলো পর্যন্ত রেখে দেয়া হয়েছে যথাস্থানে।

ব্যক্তিগত চোখ

ফেরি থেকে যখন নামলাম তখন অন্ধকার। টাইম্‌স স্কয়ারে আসা হলো টিউবে চড়ে। রাতের টাইম্‌স স্কয়ার জ্বলতে শুরু করেছে। চারদিকে রঙিন আলো, তার মধ্যে নগ্নিকাদের হাতছানি জ্বলছে, নিভছে।

আমার একটু শখ হলো এসব বারে ঢোকার। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ভেতরে না জানি কি আছে। মিনার ভাই বড়ো ভাইয়ের মতো। তাকে মুখ ফুটে বলতেও পারছি না– মিনার চলেন, কোনো ন্যুড ক্লাবে যাই।

সেদিন আমাদের এক বন্ধু ঢাকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ফোন করেছিলেন। তিনি আমেরিকায় এসেছেন স্কলারশিপ নিয়ে। বললেন, আনিস সহপাঠীদের সঙ্গে সবাই মিলে হৈ চৈ করতে করতে গেলাম একটা ন্যুড ক্লাবে। মেয়েরা নাচতে শুরু করলো। কারো গায়ে বিন্দুমাত্র কাপড় নেই। আমার কান গরম হয়ে যেতে লাগলো। সবাই মিলে গেছি বলে গিল্টি ফিলিংস কম।

মিনার ভাই বললেন, নিউ ইয়র্কের নাইট লাইফ দেখাতে হয় আপনাকে।

না দেখলে আসলে আপনি কিছুই হারাবেন না। কিন্তু দেশে গেলে অনেকে জিজ্ঞেস করবে, কি, ওই জায়গায় যাও নাই। তখন যদি বলেন, না, যাই নাই, নিজেকেই বোকা বোকা লাগবে আর পূর্বাভিজ্ঞরা এমন ভাব করবে যেন কতো কি থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। তার চেয়ে মনের মধ্যে আফসোস রাখার দরকার নেই। চলুন, ওই 'ব্যক্তিগত চোখ'-এ গিয়ে ঢুকি।

ব্যক্তিগত চোখ মানে পরসোনাল আই। এটা একটা বার। ঠিক সেক্সশপ নয়। মঞ্জু যাকে বলেছিলেন চার আনা আট আনার দোকান, সেসব সম্পর্কে মিনার ভাই বললেন, ওগুলো নিতান্তই নিম্নমানের। ও সবে যাওয়াটা রুচিঅলা লোকের উচিত নয়।

ব্যক্তিগত চোখে ঢুকে পড়লাম। কাউন্টার ঘেঁষে একটা টেবিলে বসে মিনার ভাই বিয়ারের অর্ডার দিলেন। এই বারটা কতো বড়ো আমি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারলাম না। চারদিকে দেয়াল জোড়া কাচ আর কাচ। ছোট ছোট কয়েকটা মঞ্চ। সেসবে উঠে নগ্নবক্ষা মেয়েরা মিউজিকের তালে তালে মৃদু নাচছে। নানা ধরনের কসরত দেখাচ্ছে। সেটা নাচ নাকি জিমন্যাস্টিকস বোঝা মুশকিল।

একটা বিয়ারের কৌটার দাম বাইরে দেড় ডলার। এখানে রাখছে দশডলার। মিনার ভাই রেগে গেলেন।

এদিকে আমাদের সামনের মঞ্চে একটা মেয়ে একটা খুঁটি ধরে প্রচণ্ড কষ্টকর শারীরিক কসরত দেখাচ্ছে। দেখে মায়াই হয়। মিনার ভাই বললেন, খবরদার,

www.nagorikpathagar.com

এদের চোখের দিকে তাকাবেন না, তাহলে কিন্তু কোলে এসে বসে পড়বে। তখন কমপক্ষে পাঁচ ডলার টিপ্‌স দিতে হবে।

নিউ ইয়র্ক হলো টিপ্‌সের শহর। ট্যাক্সিতে উঠলে ভাড়া ছাড়াও দিতে হয় টিপ্‌স। মিনার ভাই বলেন, টিপ্‌সের নিয়ম হলো মূলভাড়ার ১৫%। ৬ ডলার ভাড়া উঠলে ১ ডলার দিতে হবে। তবে এটা বাধ্যতামূলক নয়, এটা একটা ভদ্রতা। নিউ ইয়র্কের বাইরে এ নিয়ম নেই। কোনো নিউ ইয়র্কার বাইরে গেলে অভ্যাস বশে টিপ্‌স দেয়। যাকে দেয়, সে আনন্দে বলে ওঠে, আপনি নিশ্চয়ই এসেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে।

মিনার ভাই বললেন, সেক্স জিনিসটা আসলে ব্যবসার নয়। এটা হলো ভালোবাসার। এই সব পয়সা দিয়ে শরীর দেখানো, শরীর বেচাকে আমি ঘৃণা করি।

আমি এদিকে পড়েছি মহামুশকিলে। কোনো মেয়ের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছি না। যদি সত্যি সত্যি কোলে এসে বসে। সে এক বিড়ম্বনার বটে।

মিনার ভাইয়ের আরো বিয়ার দরকার। দুটো বিয়ারে তার কিছুই হয়নি। তিনি বললেন, আনিস, চলেন তো।আমি শুকনো গলায় বললাম, চলেন।আমরা ব্যক্তিগত চোখ থেকে বেরিয়ে এলাম। রাত আটটা। রাত এখনো ইয়ং কেবল নয়, রীতিমতো ভার্জিন। মিনার ভাই ট্যাক্সি ডাকলেন। নিউ ইয়র্কে লাইসেন্সধারী ট্যাক্সি আছে ১১,৭৮৭টি। এই ট্যাক্সিগুলোর কোনো স্ট্যাণ্ড নেই। রাস্তায় দাঁড়ায় না, সারাক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় চক্কর দেয়। ৮৫টি দেশের লোক নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালায়, এরা মোট ৬০টি ভাষায় কথা বলে। তবে ইংরেজি জানা বাধ্যতামূলক। ট্যাক্সিতে ধূমপান করা নিষেধ। আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

www.nagorikpathagar.com

আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ

আমরা এলাম কুইন্সে। উদ্দেশ্য, সাদ কামালীর বাসায় যাবো। সাদ কামালী লেখক মানুষ, আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর বাসায় যাবার আগে মিনার ভাই একটা বারে ঢুকলেন। আইরিশ বার।

মিনার ভাই বললেন এই বারে এক সন্ধ্যায় তিনি মারপিট করেছেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি এসেছিলেন আরো দুজন বাঙালিকে নিয়ে। মিনার মাহমুদের দুবন্ধুর একজন উঠলেন বাথরুমে যাবার জন্যে। পথের মধ্যে ক'জন আইরিশ হল্লা করছে। তারা বাঙালিটিকে একা পেয়ে তার থুতনি ধরে নাড়তে লাগলো। মিনার ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। বন্ধুটি ফিরে এলে এবার তিনি নিজে গেলেন সেই পথে। আইরিশরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটালো। হাত দিলো মিনারের থুতনিতে।

মিনার তার বন্ধু দুজনকে নাম ধরে ডাকলেন চিৎকার করে। তারপর দড়াম করে ঘুষি মারলেন এক আইরিশের চোয়ালে। তিন বাঙালি অতর্কিতে কয়েকজন আইরশকে কিল ঘুষি লাথি মেরে লংকাকাণ্ড বাধিয়ে ফেললেন। বারের মালিক ফোন করলো পুলিশকে। বাইরে পুলিশের গাড়ির শব্দ পেয়ে চম্পট দিলেন তিন বাঙালি।

আজ বার ফাঁকা। আলো কম। বুড়ো মালিক দোকান খুলে বসে আছেন বিক্রির আশায়। কাঠের তৈরি ঘর। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, তেলরঙে আঁকা একটা ছবি। কিংবা একটা পুরনো আমেরিকান ছবির সরাইখানা।

মিনার ভাই বললেন সেই ঘটনার পরে এই বারে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো প্রায়। কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়েছেন তাঁর এক আমেরিকান বন্ধু। নাম টনি। টনি এখানকার স্থানীয় ছেলে। এই বারেই তার সঙ্গে পরিচয়। টনি ছেলে খুবই ভালো, ভালো বংশের ছেলে। অন্য ভাইয়েরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। কেবল টনি কিছু করে না, নেশাভাং করে। আর্মিতে ছিলো কিছুদিন। অ্যাডিক্ট বলে সেখান থেকে বহিষ্কার। টনি থাকে তার মায়ের সঙ্গে। টনির মা বুড়ো হয়ে গেছেন। কেবল ছোট ছেলেটির জন্যেই বোধহয় মরছেন না। নেশা করা ছেলেদের টাকার খুব অভাব। তারা সাধারণত ধার

www.nagorikpathagar.com

কর্জ করে। আত্মীয়-স্বজন কেউই তাদের টাকা দিতে চায় না। শুধু দশটাকার জন্যে এরা যে কোনো কারো পা ধরতে পারে। মিনার ভাই টনিকে মাঝে-মধ্যে পাঁচ দশ ডলার দেন। টনি তাই মিনার ভাইকে খুবই পছন্দ করে।

আইরিশ বারে মারামারির পর মিনার ভাই সব জানালেন টনিকে। টনি বললো, কুছ পরোয়া নেই। পরদিন টনি তার বন্ধুবান্ধবসহ চলে এলো বারে, কেউ যেন তাকে কিছু না বলে, তার গায়ে যেন ফুলের আঁচড়টিও না পড়ে। হুমকিতে কাজ হলো। মিনার আবার নিয়মিত প্রবেশধিকার পেলেন এই বারে।

তবু মিনার ভাই ছুটির দিনে এখানে আসেন না। উইক এন্ডে বার থাকে জমজমাট।

আইরিশ হলো খুবই জাত্যাভিমানী জাতি, বললেন মিনার ভাই। সবচেয়ে ভালো হলো জাপানীরা, ট্যাক্সি চালনার অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন তিনি। ঠিক জায়গায় নেমে ঠিক ১৫% টিপ্‌স দেবে, কোনো ওলটপালট নেই।

মিনার ভাই বললেন, চলেন, আপনাকে টনির বাসায় নিয়ে যাই। আপনি তো লিখবেন এসব, আপনার লেখার একটা ভালো সাবজেক্ট পাবেন।

টনির বাসা কুইন্সেই। একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায়। টনি তার ঘরে গল্প করছে প্রতিবেশী এক তরুণের সঙ্গে। আমরা ঢুকে প্রথমে পেলাম টনির মায়ের ঘর। টনির মা বসে বসে টিভি দেখছেন। আমাদের দেখে খানিক বিরক্তই হলেন বলে মনে হলো। টনির ঘরে ঢুকলাম। ব্যাচেলরের একলা ঘর। টনির কোলে একটা বিড়াল। মিনার ভাই টনির জন্যে ছটা বিয়ারের ক্যান নিয়েছিলেন। সেটা দিলেন। টনি খুবই খুশি। ওর গড়ন একহারা। থুতনিতে সামান্য দাড়ি। বয়স ৩০ / ৩২ হবে। টনি কথা বলে ছটফট করতে করতে।

মিনার ভাই তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। পড়শী ছেলেটির সঙ্গেও পরিচয় বিনিময় হলো। টনি বললো, মিনার, ২০টা ডলার দাও। মিনার ভাই বললেন, না, পকেটে টাকা নেই। টনি কিছুতেই ছাড়বে না। দিতেই হবে। দিতেই হবে। কি যে করতে লাগলো টনি, ২০টা ডলারের জন্যে।

অগত্যা মিনার ভাই বললেন, ২০ ডলার নয়, ১০ ডলার পাবে। টনি টেলিফোন করলো একটা গোপন নাম্বারে। আমেরিকায় যেমন ফোন করে ট্যাক্সি ডাকা হয়, কিংবা টেলিফোনের লাইন লাগানো যায়, তেমনি ফোন করলে ঘরে বসে পাওয়া যায় যে কোনো মাদক। মদ, গাঁজা, হেরোইন– কি চাই।

ফোন করার ৫ মিনিটের মধ্যেই টনির বাড়ির সামনে গাড়ি এসে গেলো। টনি নিচে নেমে গেলো। ফিরে এলো কোকেইন হাতে। টনি তার নেশা করার স্পেশাল পাইপটি বের করলো।

কোকেনে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়াটা টেনে নিলো মুখে। নিজের মুখে জমা ধোঁয়া আবার চালান করতে লাগলো পড়শি ছেলেটিকে, মুখ লাগিয়ে। ভয়ংকর দৃশ্য।

টনি এসব করছে, আর বার বার দেখছে তার মা আবার দেখে ফেললেন কি না।

www.nagorikpathagar.com

রাত সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। আমি বললাম, মিনার ভাই, চলেন যাই। বিয়ার খেয়ে মনে হয় মিনার ভাইয়ের চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে। টনির ঘর থেকে বেরিয়ে মিনার ভাই বললেন, আনিস, আমি লোকটা মনোগামি নই। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলবো, পয়সার বিনিময়ে আমি কখনো নারীর শরীর কিনিনি। এটা আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো। কিন্তু জানেন, নিউ ইয়র্কের বাঙালিদের শতকরা ৯০ জন একথা বলতে পারবে না। মিনার ভাই যখন একথা বলেন, তখন তিনি স্বাভাবিক ছিলেন না। তাঁর এই পরিসংখ্যানটি বিশ্বাস না করাই ভালো।

তবে নিউ ইয়র্কের বাঙালিরা কেমন আছে, এই প্রশ্নের জবাব অনিশ্চিত। মিনার ভাই ঢাকায় ইস্কাটনের বাসায় একা থাকতেন। বিশাল বাসা। এখন এক বাসায় দুজন থাকেন। দুরুমের বাসা। একটা ড্রয়িংরুম, একটা বেডরুম। এক বেডরুমে খাট ফেলে থাকেন দু'জন। ট্যাক্সি চালালে কাঁচা পয়সা। ১০০ ডলার / ১৫০ ডলার প্রতিদিন। নানা খরচ, সাপ্তাহিক ছুটি বাদ দিয়ে মাসে দু'হাজার আড়াই হাজার ডলার আয় তো হয়ই। টাকার ধান্দায় মত্ত থাকলে আরো বেশিই হয়। কিন্তু মিনার ভাই বললেন, তাঁর এক পয়সাও সঞ্চয় নেই।

দিনে অন্তত ১২ ঘন্টা গাড়ি চালান। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা। সারাদিন ঘুমিয়ে আবার সন্ধ্যায় যাত্রা। শুধু উইকএন্ড দুদিন কেনো তাড়া নেই। মিনার ভাই সে দুদিন, ধারণা করতে পারি, তরলে ভাসতে থাকেন। কি লাভ তাহলে আমেরিকায় থেকে? এতো কষ্ট করে?

মিনার ভাইকে আমি এক ফাঁকে বললাম, মিনার ভাই, আপনার খারাপ লাগে না? সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না। যখন ৬০ হাজার কপি বিচিন্তা ছাপা হতো? আমাদের সেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের তীব্র তীক্ষ্ণ দিনগুলো। সাংবাদিকতার কতো নিয়ম আমরা জানতাম না। মানতাম না। হয়তো সেই ছেলেখেলার মধ্যে জন্ম নিতো নতুন প্রকরণ।

কিংবা যে একটা লাইন লিখেছে বাংলাদেশে, একটা তুলির আঁচড় দিয়েছে পটে, একটা গান গেয়েছে মাইক্রোফোনে, একবার ক্লিক করেছে ক্যামেরায়, সে কি করে পারে এই নামহীন গোত্রহীন জীবনে সুখ খুঁজে পেতে?

মিনার ভাই বলেছেন, আনিস, দেশে দিয়ে লিখবেন, আমেরিকা কোনো স্বপ্নের দেশ নয়, এ হচ্ছে স্বপ্নভঙ্গের দেশ, বাস্তবতার দেশ।

মিনার ভাই দেশে ফিরতে চান। কিন্তু ফেরাটা তার জন্যে দুরূহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মামলা আছে তাঁর বিরুদ্ধে। আমি আমেরিকা গেছি মুক্ত সাংবাদিকতা দেখতে শিখতে, গেছি সংবাদপত্রের মিত্র কতো সংগঠনের কাছে, আর পরিহাস এই যে, বাংলাদেশের এক লড়াকু সাংবাদিককে পালিয়ে চলে আসতে হয়েছে মার্কিন দেশে।

মিনার মাহমুদকে নিয়ে এসব কথা আমি লিখলাম, লিখতে পারলাম, কারণ তার কাছ থেকে আমি লেখার অনুমতি নিয়ে এসেছি। মিনার ভাই হলেন অকুতোভয়

www.nagorikpathagar.com

মানুষ! আমার লেখার স্বাধীনতা তিনি ক্ষুণ্ন করতে চাননি, এমনকি তাতে যদি তার ব্যক্তিগত জীবনও প্রকাশিত হয়ে যায়, তবু না। মিনার মাহমুদ আমাদের দেশে সেলিব্রেটি আর সেলিব্রেটিদের ব্যক্তিজীবন আমেরিকার সাংবাদিকতার রীতিতে আর ব্যক্তিগত থাকে না।

আমি অন্য বাঙালিদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু না বলে বরং সাধারণভাবে বলি। বাঙালিরা ওখানে বড়ো পরিশ্রম করে। শাদারা ও দেশে খুচরো কাজ করে না, বাথরুম ধোয় না। সম্ভবত ওই কাজগুলো করিয়ে নেবার জন্যে সারা পৃথিবী থেকে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে ওরা ওপি-১-এর মাধ্যমে লোক নিচ্ছে। কায়িক শ্রম খারাপ একথা আমি বলি না। কিন্তু রবি ঠাকুর কবিতা না লিখে যদি আমেরিকায় গিয়ে দোকানে সেল্‌সম্যান হয়ে কাটিয়ে দিতেন, সেটা খুব ন্যায়বিচার হতো না; শ্রমবিভাজন বলতে একটা কথা তো আছেই। বেশির ভাগ বাঙালি ওখানে যেসব বাড়িতে থাকে, তাতে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। আমি আমেরিকান মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বাড়ি দেখেছি, কাজেই আমেরিকান দারিদ্র্য চিনতেও আমার ভুল হবার কথা নয়।

তবু যারা মার্কিন মুলুকে যেতে চান, আমি বলবো, যান। তবে দৃঢ় মন আর কষ্ট করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাবেন। আমেরিকায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কেউ আপনাকে ট্যাক্সির চাবি দিয়ে দেবে না। কতোদিন বেকার থাকবেন, কেউ জানে না। ওখানকার সেল্‌সম্যান মানে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, আর সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকা। গল্প-গুজব-আড্ডা বলতে ওখানে কিছু নেই। একই বাসায় থাকা দু বাঙালির মধ্যেই কথা হয় খুব কম, দেখা হয় খুব কম। বর্ণভেদ আছে ওখানে, ধর্মভেদও আছে, ভেতরে ভেতরে। কালোরা শত্রুভাবে এশীয়দের, লুই ফারাখান সেটা প্রকাশ্যেই বলেছেন। শাদারাও আপনাকে মিত্র ভাববে না। তবু মোটের ওপর, আমেরিকায় কেউ একবার পা রাখলেই তার আদি দেশ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। আগেই বলেছি, ওটা একটা মানব চিড়িয়াখানা। আর যারা পড়াশুনা করতে যেতে চান, স্কলারশিপ নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের আমি জানাবো অভিনন্দন। জ্ঞান অর্জনের জন্যে চীন দেশে হলেও তো যেতে হবে। পড়াশুনা করতে গিয়ে যদি আপনাকে জুতো সেলাই করতে হয়, তবু সই। পৃথিবীর একটা পরিহাস এই যে ইমিগ্রান্টরা সাধারণত ভালো করে স্থানীয়দের চেয়ে, তাদের অধ্যবসায়, জেদ, কষ্টসহিষ্ণুতা তাদের জিতিয়ে দেয় আখেরে। বাঙালি কখনো দেশ ছাড়তে চায়নি, একবার যখন বেরিয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো এর ফল ভালো হবে।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে

৯ নভেম্বর দুপুরে আমরা হাজির হলাম জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। ভবনের সামনে বিরাট লন। সবদেশের পতাকা টাঙানো। সেই লনে অসংখ্য পায়রা এসে জুটেছে।

www.nagorikpathagar.com

লোকজন এটা ওটা খাবার দিচ্ছে। পাখিগুলো নির্ভয়ে হাতে-কাঁধে বসছে। ইরাক-ইসরায়েল-সার্বিয়াকে বশ মানাতে পারেনি বটে, শান্তি প্রতীককে দেখলাম জীবন্ত বশ করেছে জাতিসংঘ।

দুপুরের খাবারটা খাওয়া হলো সদর দপ্তরের নিচতলায় বিশাল ক্যাফেটেরিয়ায়। জাতিসংঘের ক্যাফে বলে কথা। কতো বিচিত্র খাবার, আর কতো বিচিত্র তার ভোক্তা। বিশাল ক্যাফেটেরিয়া। তার লাইনও বিশাল।

ভোরের কাগজের কলাম লেখক হাসান ফেরদৌস কাজ করেন সদর দপ্তরে। লিফটে অনেকতলা বেয়ে গেলাম তাঁর কক্ষে। দেখি রুম ফাঁকা। এটাই তাঁর রুম কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম। দেয়ালে স্ত্রী-সন্তানের ছবি। টেবিলের ওপরে দেখলাম ভোরের কাগজের সাংবাদিক শ্যামল দত্তের ভিজিটিং কার্ড। শামলদা কিছুদিন আগে আমেরিকা এসেছিলেন ছমাসের জন্যে।

এখানে-ওখানে খানিক ঘোরাঘুরি, আবার এলাম হাসান ফেরদৌসের রুমে। এবার তাঁকে পাওয়া গেলো।

দুপুর দুটায় শুরু হলো আমাদের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিক ট্যুর। একজন গাইড আমাদেরকে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখাবেন। এই গাইড লোকটা আমেরিকায় আমার দেখা সবচেয়ে মজার লোকদের একজন। তিনি রুশ। এখানে জনসংযোগ বিভাগে কাজ করছেন।

আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কক্ষ। কক্ষে ঢোকার আগেই লনে পড়লো নানা দর্শনীয় জিনিস। বিভিন্ন দেশ উপহার হিসেবে জাতিসংঘকে দিয়েছে এসব।

একেকটা উপহার একেক কিসিমের। সে সবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা মজার গল্প। আমাদের গাইড রসিয়ে রসিয়ে বললেন সেসব গল্প। কি যে মজার গল্প। কিন্তু গাইড সাহেব কিছুতেই সে সবের নোট নিতে দেবেন না। না না, এসব কথা লিখবেন না। আমি স্মৃতি থেকে সেসব উদ্ধার করছি পাঠকদের জন্যে। ভ্রমণকাহিনীতে, আশা করি, এসব গল্প বললে এথিক্স ভাঙা হয় না। তবে, আমারও একই কথা, এসব কাহিনী কেউ অন্যত্র লিখবেন না। কোথাও উদ্ধৃত করবেন না, রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করবেন না।

ওমান জাতিসংঘকে দিয়েছে একটা ঐতিহ্যবাহী বাক্স। দেখতে অনেকটা পালকির মতো অত্যন্ত চমৎকার কারকার্যময় এই সিন্দুক। তবে সেটার গায়ে ঝুলছে একটা আধুনিক তালা। এই তালাটা অবশ্য ওমানের উপহার নয়। এটা লাগিয়েছে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা প্রহরীদের কয়েকজন এই বাক্সটায় রাখতো মদের বোতল। সন্ধ্যার পরে ভবনটা ফাঁকা হয়ে গেলে বেশ আসর জমাতো তারা। সেই অপকর্মটি ধরা পড়ে যায়। অগত্যা ওমানের বাক্সের মুখে দিতে হয় তালা।

বাহরাইন জাতিসংঘের এই প্রদর্শনী বারান্দায় রাখার জন্যে উপহার দিয়েছে একটা সোনার খেজুর গাছ। ওই গাছে সোনা আছে মাত্র ১২০ কেজি। এই গাছ

www.nagorikpathagar.com

পেয়ে জাতিসংঘের মহসচিব নিতান্তই ব্যথিত স্বরে ওমানকে জানালেন, আপনাদের গাছ তো আমরা রাখতে পারবো না, কারণ এই সোনা সাধারণ পরিষদে রাখতে হবে, আমাদের প্রতিষ্ঠান নিতান্তই অর্থকষ্টে ভুগছে, এটা পাহারা দেবার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। ওমান বললো, ঠিক আছে চিন্তা করতে হবে না। তারা একটা বুলেট প্রুফ কাচ দিয়ে সোনার গাছটাকে চিরস্থায়ীভাবে ঢেকে দিয়ে সেটা পাহারা দেবারও ব্যবস্থা ক'র দিলো।

ইউক্রেইন জাতিসংঘকে উপহার দেবার জন্যে পাঠিয়েছিলো দুটো বিশাল অলঙ্কৃত মৃৎপাত্র। জাহাজে করে আনতে গিয়ে তার একটা ভেঙে যায়। ভালোটা জাতিসংঘকে দিয়ে দেয়া হয়। ভাঙাটা জোড়া দিয়ে রাখা হয় ইউক্রেইনের দূতের বাসভবনে। ইউক্রেইনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে দূত সবাইকে বাসায় দাওয়াত দেন। খানা ও পিনা দুটোই একটু বেশিই হয়েছিলো। সম্ভবত দ্বিতীয় ব্যাপারটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। দূত সাহেবের টলায়মান দেহ আঘাত করে সেই মৃৎপাত্রটিকে। ওটা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। চৌচির মানে চারচির হলে বলা উচিত শতচির হয়ে যায়। ইউক্রেইনের দূত অতিথিদের সবার হাতে একটা করে ভাঙা টুকরা ধরিয়ে দেন।

জাপানের শিশুরা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচায়। তামার পয়সা। তাদের কাছে সারা পৃথিবীর শিশুরাও পাঠিয়ে দিতে থাকে আরো তামার পয়সা। সেই তামার মুদ্রা গলিয়ে বানানো হয় একটা বিশাল ঘণ্টা। শান্তির ঘণ্টা। সাধারণ পরিষদের ভবনের পাশে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে সেই ঘণ্টা বসানো হয়। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসার আগে এই ঘণ্টাটা বাজানো হয়। ঘণ্টা বাজানোর জন্য যে হাতুড়ি, সেটাও বিরাট। তার ওজনও নিতান্ত কম নয়। পেরেজ দ্য কুয়েলার তখন জাতিসংঘ মহাসচিব। তাঁর মুখের খানিকটা অংশ অবশ ছিলো বলে এমনিতেই তাকে দেখলে মনে হতো মুখ বাঁকা মানুষ। তার ওপর তিনি যখন এই ঘণ্টা বাজানোর জন্যে ভারী হাতুড়িটা তোলেন, তখন তার মুখের অবস্থা দাঁড়ায় আরো ভয়াবহ। সেই ছবিটা সাংবাদিকেরা ধরে রাখেন ক্যামেরায়। একটা পত্রিকায় ছবির নিচে ক্যাপশান ছাপা হয়- টু বিট অর নট টু বিট দি ডিপ্লোম্যাটস। কূটনীতিবিদদের পেটানোর জন্যে কিংবা না পেটানোর জন্যে।

নাইজেরিয়া থেকে জাতিসংঘকে দেয়া হয় একটা ব্রোঞ্জের লম্বাটে মূর্তি। মূর্তিটার সবই ভালো, কিন্তু এটার ইঞ্জিনিয়ারিং কাঠামোর হয়তো সমস্যা থাকবে। এটা ভেঙে পড়ে যায় একাধিকবার। এখনো মূর্তিটা একটা সমস্যা। কখন কার মাথায় যে ভেঙে পড়ে।

আমরা গেলাম জাতিসংঘের ডিপ্লোম্যাট লাউঞ্জে। এখানে কূটনীতিকরা এটা ওটা খান, পান করেন, আর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারেন। যখন কোনো বিষয়ে ভোটভুটি হয়, তার আগে এ লাউঞ্জের ব্যবহার যায় বেড়ে। এই লাউঞ্জে ফটো তোলা নিষেধ। নিষেধ কেন? চিলিতে তখন সামরিক শাসন। সম্ভবত পিনোচেটের আমল। আর

www.nagorikpathagar.com

কিউবায় যথারীতি ফিদেল ক্যাস্ট্রো ক্ষমতাসীন। দুদেশের মধ্যে কোনোই কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। একদিন দেখা গেলো, চিলির প্রতিনিধি আর কিউবার প্রতিনিধি পরস্পরকে আলিঙ্গন করছেন। এই ছবিটা সাংবাদিকের ক্যামেরায়ও ধরা পড়লো এবং পরদিন পত্রিকায় ছাপা হলো গুরুত্বের সঙ্গে। ক্যাস্ট্রোর কিউবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে গলাগলি। এই কূটনীতিক চাকরি হারালেন।

তখন খোঁজ নেয়া হলো, ব্যাপারটা কি? যা জানা গেলো, তাতে সব দেশের কূটনীতিকেরা ভীষণ আহত হলেন। চিলি আর কিউবা এ দুদেশের এই দুজন কূটনীতিকের ছেলেবেলা কেটেছে একই শহরে, তারা পড়াশুনা করেছেন একই স্কুলে, এমনকি তারা বিয়ে করেছেন একই বাড়িতে। তারা পরস্পর ভায়রা। কিন্তু তাদের মধ্যে বছরের পর বছর কোনো যোগাযোগ ছিলো না। দুদেশের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক না থাকায় এতোদিন পরে দুজন দুজনের দেখা পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি।

ব্যাপারটি জানতে পেরে জাতিসংঘের নানা দেশের কূটনীতিবিদদের রাগ গিয়ে পড়ে ফটোগ্রাফারদের ওপর। ফলে নিয়ম করা হয়, ডিপ্লোম্যাট লাউঞ্জে এরপর থেকে আর কেউ ছবি তুলতে পারবে না।

আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন কক্ষে ঢুকে পড়লাম। গাইড সাহেব বললেন, যে কেউ সভাপতি কিংবা মহাসচিবের আসনে বসে ছবি তুলতে পারেন। আমি সভাপতির চেয়ারে বসার লোভটা সম্বরণ করলাম। ব্যাপারটা ঠিক ছেলেমানুষী হয়ে যায় বলে। কি দরকার, যে আসনে বসার যোগ্যতা নেই, সেটায় বসে। তবে বাংলাদেশ লেখা ডেস্কে বসে একটা ছবি তুলেছি বটে। একইভাবে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো নিরাপত্তা পরিষদে অধিবেশন কক্ষে। টেবিলের ওপরে প্রত্যেকের জন্য পানির জগ ও গ্লাস রাখা। ভেতরে বরফ ভাসছে। সেই পানি ঢেলে খেলাম। আমার সঙ্গীদের কেউ কেউ ছবি তুললো।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কক্ষের অভ্যন্তরীণ সজ্জা আমার পছন্দ হয়নি। যদিও এটা সাজিয়েছেন পৃথিবীর সেরা আর্কিটেক্টরা। নিরাপত্তা পরিষদের পেছনে দেয়ালে একটা মুরাল আছে। তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি আছে যুদ্ধের বীভৎসতা। গাইড বললেন, অনেক ডিপ্লোম্যাটের আবার পছন্দ নয় এই ছবিটা।

www.nagorikpathagar.com

বিদায় আমেরিকা

৯ নভেম্বর ৯৫। ১১ নভেম্বর আমার ফ্লাইট দেশের উদ্দেশ্যে। মাঝখানে আর মাত্র একটা দিন। বিমান দেশে পৌঁছুবে ১৩ নভেম্বর। ঐ দিন বিরোধী দলের ডাকে ৭ দিনের হরতালের শুরু। এয়ারপোর্টে পৌঁছে কিভাবে বাসায় যাবো জানি না। তবু আনন্দে অস্থির লাগছে– নিজের দেশে তো ফিরে যাবো। ৭ দিন যদি আটকা থাকতে হয়, আমি ঢাকা এয়ারপোর্টে থাকবো। সেটা আমি করতে পারবো সানন্দে, কারণ ওটা আমার এয়ারপোর্ট। আমি শুধু মনে মনে চাইছি, যেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ঢাকাগামী ফ্লাইটটা বাতিল না করে।

সন্ধ্যায় ফেয়ারওয়েল ডিনার হলো একটা জাপানি রেস্তরাঁয়। বেশ গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এ অনুষ্ঠানে। ফেয়ারওয়েল শব্দটার মধ্যে বিদায় বিদায় গন্ধ আছে। বিদায়ের সুর আমাকে বিষণ্ন না করে বরং আনন্দিত করে তুলেছে।

রাত ন'টায় ফিরে এলাম হোটেলে। বাঁধাছাদা করে ঘুমিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। রাত একটায় টেলিফোন। ইন্টারকম। হোটেলের নিচতলার লবী থেকে মিনার মাহমুদ। ট্যাক্সি চালাতে চালাতে চলে এসেছেন। বললেন, আনিস, চলে আসুন। রাতের নিউ ইয়র্ক দেখিয়ে আনি। মিনার ভাই ডাকলে না গিয়ে উপায় থাকে না। আমি আবার কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সির পেছনের সিটেই বসার সুযোগ ঘটেছে এতোদিন। এবার বসলাম সামনের সিটে, চালকের পাশে। ট্যাক্সির মাথায় 'ডিউটি অফ' সাইন লাগিয়ে মিনার ভাই বললেন, চলেন যাই ব্রুকলিন।

গাড়ি ছুটে চলেছে। আমরাও ছুটে চলেছি এতোদিন। এ রাস্তা ও রাস্তা, এ পথ ও পথ। যেতে যেতে গল্প। মিনার ভাই, তসলিমা নাসরিন নাকি নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন নাই? মিনার ভাই বললেন, না।

পথের ধারে দুজন নারীপুরুষ, ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। অমি বললাম, মিনার ভাই, প্যাসেঞ্জার তোলেন।

www.nagorikpathagar.com

মিনার ভাই ডিউটি অফ সাইন সরিয়ে ওদের গাড়িতে তুললেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম মিনার ভাইয়ের পাশে। মিনার ভাই অভয় দিয়ে বললেন, কথা বলেন, অসুবিধা নাই। আমাদের দেশ হলে এতো রাতে কেউ ড্রাইভারের পাশে আরেকজন লোক দেখলে ট্যাক্সিতে উঠতো না। এরা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

নিউ ইয়র্কের দেয়ালে দেয়ালে নানা উদ্ভট দেয়াল লিখন। কেউ কেউ আবার ছবি এঁকে রেখেছে। তরুণ শিল্পীরা সাধারণত এই সব কর্ম করে। আমি যে বেকার পেয়েছি আঁকার স্বাধীনতা। একটা দেয়ালে খুব বড়ো বড়ো করে নানা দেশের খ্যাতিমান নেতৃবৃন্দের ছবি আঁকা। চে গুয়েভারা কি ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ছবি। সেই ছবিটা ভালো করে দেখাবার জন্যে দুতিনটা রাস্তা ঘুরে মিনার ভাই আবার গাড়ি আনলেন সেখানে।

গ্রীন উইচ ভিলেজ। নিউ ইয়র্কের কবি সাহিত্যিকদের আড্ডাখানা। বুদ্ধদেব বসুর বাংলায় 'গ্রীনিচ গ্রাম'। মিনার ভাই সেই গ্রামের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন আমাকে দেখানোর জন্যে। ভাগ্যি তিনি এখানে আমাকে এনেছেন শীততাড়িত শেষ রাত্রিতে। কবি সাহিত্যিকদের কারো সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা আমার মধ্যে নেই। কি হবে একজন বিখ্যাত গিন্সবার্গের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুললে? দেশের বিখ্যাত লেখকদের বাসায় গিয়েই কোনো দিন সাহস করে চোখ তুলে কথা বলতে পারি না, আর নিউ ইয়র্কে। তার চেয়ে এই ভালো হলো, এই নির্জন গ্রীনিচ গ্রামের পথে গাড়ি করে ঘোরা। গ্রীনিচ গ্রাম নিয়ে আমি কিছু লিখবো না। বরং কিছুটা উদ্ধৃত করি বুদ্ধদেব বসু থেকে। 'এই ছোটো পাড়াটুকুর মধ্যে বইয়ের দোকান যত আছে, আমার বিশ্বাস অবশিষ্ট সমগ্র নিউ ইয়র্কে তা নেই, সপ্তাহে প্রতিদিন রাত্রির বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই দোকানগুলো।'

'ঋতু যখন মৃদু হয়ে এলো, তখন দেখেছি গ্রীনিচ গ্রাম চিত্রকলার অনুশীলনে উচ্ছল; যেন সারা পাড়া জুড়ে বসেছে আঁকিয়ে ছেলেমেয়েরা।'

এই উদ্ধৃতি বাড়ানো যায়, কিন্তু তাতে পাঠক এমনি মজা পেয়ে যাবেন যে, হয়তো পরে এই ক্ষুদ্র লেখকের বর্ণনা পড়তে বিরক্ত লাগবে। মনে হবে মিষ্টি খাওয়ার পরে চা খাচ্ছি। সুতরাং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এখানেই বুদ্ধদেবের বাণীর সমাপ্তি।

নিউ ইয়র্কে শেষ দিন

১০ নভেম্বর ৯৫। অদ্যই শেষ রজনী। সকালের প্রোগ্রাম হলো ফ্রিডম ফোরাম মিডিয়া স্টাডিজ সেন্টার দেখা।

সেখানে লাঞ্চ সেরে সমাপনী বৈঠক, মূল্যায়ন পর্ব। আমাদের উদ্যোক্তাদের বড়ো বড়ো কর্তারা সেই বৈঠকে উপস্থিত।

আমরা সবাই ছ সপ্তাহের এ সাংবাদিকতা বিনিময় কর্মসূচীতে আমাদের দাওয়াত দেবার জন্য ধন্যবাদ জানালাম আমন্ত্রকদের।

www.nagorikpathagar.com

সমস্ত প্রোগ্রামের শেষে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন কি? আমি সংক্ষেপে পেশ করলাম আমার বক্তব্য। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কতোটা সুফল দিতে পারে, মার্কিন সমাজ হলো তার আদর্শ উদাহরণ, আমি বললাম।

কিন্তু, আমি যোগ করলাম, স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি ব্যক্তির স্বাধীনতা। ব্যক্তি যদি স্বাধীন না হয়, তাহলে গোষ্ঠীর স্বাধীনতা আছে কি নেই সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে। মার্কিন সমাজে ব্যক্তি যে কোনো কিছু বলতে পারে, কিন্তু সেটা সবার কাছে পৌঁছাতে পারে না; কারণ গণমাধ্যমগুলো তাদের বড়ো বড়ো মালিক প্রতিষ্ঠানের মতামতকেই প্রতিফলিত করে। এ দেশে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড়ো মাছের মতো বড়ো বড়ো হাউজগুলো সব পত্রপত্রিকা কিনে নিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করছে। ফলে মতের বৈচিত্র্য নেই। মিডিয়া তাদের ইচ্ছামতো জনমত সৃষ্টি করছে এবং নিজের ইচ্ছাকেই জনমত বলে লেবেল এঁটে দিচ্ছে। আমেরিকায় মতের বৈচিত্র্য বলতে মাত্র দুটো মত– লিবারেল আর ডেমোক্রাট। সেটাও আবার আকৃতি পায় বড়ো বড়ো সংবাদ কোম্পানির মতের আদলে। তাহলে আমি আমার মতটা প্রকাশ ও প্রচার করবো কি করে? আমি নিতান্তই ব্যক্তি ও দরিদ্র ব্যক্তি।

আমার দুর্বল ইংরেজিতে এই বক্তব্য আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। উদ্যোক্তারা এই মন্তব্য খুব মেনে নিতে পারলেন বলে মনে হলো না। তারা বলতে চান, ব্যক্তির ভিন্নমতও এদেশে যে কোনো মতাবলম্বী কাগজে ছাপা হয়! কে জানে? হয়তো হয়। কিন্তু মনে মনে আমিও সেটা খুব মেনে নিতে পারলাম না।

নিউ ইয়র্কে শেষ রাত্রি

বিকেলবেলা হাজির হলাম প্রবাসী পত্রিকা অফিসে। ভোরের কাগজের সম্পাদক মতিউর রহমান আমেরিকা এসেছেন জাতিসংঘের ৫০ বছর উপলক্ষে। আজ তাঁর প্রবাসীতে উপস্থিত থাকার কথা। তাঁকে ধরার জন্যে আমি ঘাপটি মেরে বসে রইলাম প্রবাসী পত্রিকায়।

মতি ভাই এলেন। হাসান ফেরদৌস এলেন। খানিক গল্পগুজব করে তারা চলে গেলেন। রইলাম আমি, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আনোয়ার শাহাদৎ, আর প্রবাসীর কর্মকর্তারা। সিকদার হুমায়ুন কবির আর বিশ্বজিৎ সাহা। আগের রাত্রে পূরবীদির সঙ্গে কথা হয়েছে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। আনোয়ার শাহাদৎ হলেন সাপ্তাহিক *দিনের পর দিন* পত্রিকার সম্পাদক। তিনি এখন নিউ ইয়র্কে। মিনার ভাই বলেছেন, আনোয়ার শাহাদৎ খুব ভালো আছেন। আনোয়ার ভাইও তাই বললেন। এর কারণ তার চাকরিতে খাটুনি কম। তিনি এখানে একটা প্রতিষ্ঠানে সিকিউরিটি বিধানের কাজ করেন। কাজ বলতে শুধু নজর রাখা। কখনোই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। ফলে কায়িক শ্রম নেই। আনোয়ার ভাই গল্প লেখেন। আনোয়ার ভাইয়ের ইচ্ছা তাঁর বাসায় যাই, ভাবী রাঁধবেন। সবাই মিলে আড্ডা দেয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.com

আমারও সেরকমই ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাটা প্রবল হবার কারণ আছে। জ্যোতিদাকে আমি সেদিন এক কপি 'অন্ধকারের একশ বছর' উপহার দিয়েছিলাম। সেটা পড়ার পর, তাঁর ও পূরবীদির আলাদা আলাদা ভাষ্যমতে, তিনি ডিস্টার্বড। খুবই চিন্তিত। সত্যি সত্যি এমন অন্ধকার যদি নেমে আসে আমাদের দেশে।

বাংলাদেশে এক লেখক সাধারণত আরেক লেখকের প্রশংসা করে না। বিদেশ বলেই হয়তো জ্যোতিদা আমার বইটি সম্পর্কে দুটো ভালো কথা বললেন। জ্যোতিদার সঙ্গ তাই আমার জন্য খুবই কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার হয়ে গেলো।

তবু আনোয়ার শাহাদতের বাসায় যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। মঞ্জু ও সীমাকে বলে রেখেছি, রাতে ওদের বাসায় যাবো। সীমা হলো মেরিনার বাল্যবন্ধু। কাজেই ওই বাসায় যাওয়াটাই অগ্রাধিকার পেলো।

রাতে মঞ্জুর বাসায় খেলাম। ওদের ছেলে পৃথু খুব সুন্দর ও মজার হয়েছে। এখনো স্কুলে যায় না। সামনের বছর থেকে যাবে। পৃথু একটা রঙপেন্সিল এনে মাকে বলছে, মা, এটা আমার ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে।

মা বললেন, ঠিক আছে, তুমি ওটা টেবিলের ড্রয়ারে ফেলে দিয়ে আসো।

'না, মা, এটা গার্বেজ ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে।'

ওর মা আর কি বলবেন? ঠিক আছে, 'গার্বেজেই ফেলে দাও।'

গার্বেজ ব্যাপারটা মনে হয় পৃথুর খুবই প্রিয়। আমি আমার মার্কিন ভ্রমণের ফটোগুলো সীমাকে দেখতে দিয়ে বাইরে যাচ্ছি, পৃথু এসে বললো আংকেল, তুমি ছবিগুলো রেখে যাচ্ছো কেন? হারিয়ে যাবে তো। আমি বললাম, হারিয়ে আর কোথায় যাবে? সে বললো, 'যদি গার্বেজে চলে যায়!'

'গার্বেজে যাবে কি করে?'

'আমিই তো ফেলতে পারি।' সে সাবধান করে দিলো।

খেয়েদেয়ে আবার বেরুলাম আমি ও মঞ্জু, রাত্রি ১১টার দিকে। সাবওয়ে যোগে চলে এলাম ম্যানহাটান, লেক্সিংটন এভিনিউ, সেই বাঙালি হোটেল কস্তুরিতে। আবার চা পান, মিষ্টি ভক্ষণ। সাংবাদিক ফজলু ভাই, তারেক ভাই– এরা এখন নিউ ইয়র্ক প্রবাসী– এলেন। আড্ডা চললো খানিক।

কস্তুরীর পাশেই একটা টেলিফোন বুথ আছে। মালিক সম্ভবত পাকিস্তানী। সেখান থেকে দেশে-বিদেশে নগদ পয়সার বিনিময়ে কল করা যায়। বিল ওঠে তুলনামূলকভাবে বেশ কম। সেখান থেকে কথা বললাম দেশে। জানতে পারলাম, বিরোধী দল ১৩ নভেম্বরে হরতাল ডেকেছে বিকাল চারটা পর্যন্ত। সুতরাং এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকায় ফিরতে কোনো অসুবিধা হবে না। খুবই সুসংবাদ।

খানিক পরে মঞ্জুদের বললাম, যাই গিয়ে ঘুমোই। তিনজন বাঙালি সাংবাদিক (প্রাক্তন বলাই ভালো) আমার সঙ্গী হলেন হোটেল লবী পর্যন্ত। ট্যাক্সিতে উঠলাম চারজন। ট্যাক্সি ড্রাইভারও পাওয়া গেলো বাঙালি। তিনি বিনাপয়সায় লিফ্‌ট দিলেন আমাদের।

www.nagorikpathagar.com

বিদায় আমেরিকা

১১ নভেম্বর। সন্ধ্যায় আমার ফ্লাইট। দুপুর ১২টার মধ্যে হোটেলের কক্ষ ছাড়তে হবে। সকাল সকাল সব বাক্সপেটরা নিয়ে উঠলাম মঞ্জুর বাসায়। আমার বাংলাদেশী স্যুটকেসের দুর্দশা দেখে মঞ্জুর সিংহহৃদয় অস্থির হয়ে পড়লো। তিনি বাড়ির কাছের একটা দোকান থেকে একটা সুটকেস কিনে এনে বললেন, এটা একটু সীমার মায়ের বাসায় পৌঁছে দিতে হবে। পথের মধ্যে যাতে আর সুটকেস খুলে জিনিসপাতি গড়াগড়ি না খায়, সেজন্যে মঞ্জু জাহাজী কায়দায় বেঁধে দিলেন দড়ি দিয়ে।

বিকেলবেলা পৌঁছলাম কেনেডি বিমান বন্দরে। মঞ্জু পৌঁছে দিয়ে গেলেন ট্যাক্সি করে।

বহুজনের কাছে এ রকম বহু ছোটবড়ো সহযোগিতা নিয়ে অশেষ ঋণে আবদ্ধ আমি অবশেষে উঠে পড়লাম ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে। ফ্লাইট যাবে লণ্ডন হয়ে। লণ্ডন পর্যন্ত আমার সহযাত্রী হয়ে উঠলো বুলগেরিয়ার নাতাশা। তার সিট পড়েছিলো আমাদের কেবিনের অনেক সামনে, এতো সামনে যে, টিভিস্ক্রীন দেখার উপায় ছিলো না। পরে আমার পাশের আসন ফাঁকা দেখে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ তাকে বসিয়ে দিয়ে গেলো আমার পাশে।

'কি নাতাশা, কেমন কাটলো আমেরিকা?'

নাতাশা ফিসফিস করে বললো, দেখো, আমার বাড়ি রাজধানী থেকে অনেক দূরে, আমাকে একটা ডমেস্টিক প্লেনে উঠতে হবে, অথচ এলজবিয়েটা তার খরচ আমাকে দিলো না। অনেকেই আবার কতো কিছু পেয়েছে। প্রকল্প পরিচালিকা এলজবিয়েটা পোলিশ, পোল্যাণ্ডের একজন সাংবাদিক ছিলো আমাদের দলে, হয়তো তার সঙ্গে এলজবিয়েটা একটু বেশি গল্পগুজব করেছে– এসব নিয়ে নাতাশার মেয়েলি অভিযোগ।

লণ্ডনে নাপা শাক

বিমান লণ্ডনে পৌঁছার কথা সকাল আটটায়। পৌঁছলো নয়টায়। আমি তড়িঘড়ি করে বের হলাম। নাতাশাকে ভালো মতো বিদায় সম্ভাষণও জানানো হলো না। কারণ সাড়ে আটটার সময় রিজুর আসার কথা হিথ্রো বিমান বন্দরে। আমার ফ্লাইট লন্ডনে দাঁড়াবে ১৪ ঘন্টা। এতোক্ষণ এয়ারপোর্টে আটকা থাকার মানেই হয় না। আমি ব্রিটিশ ভিসা নিয়ে এসেছি।

গত পরশুরাতে মঞ্জু ফোন করেছেন রিজুকে। রিজু আলম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাস করেছেন। এখন লণ্ডনে আছেন কমনওয়েলথ স্কালারশিপ নিয়ে। ভিনা, ওর স্ত্রী, এখন পড়ছেন লণ্ডনে। রিজু আমাদেরই ব্যাচের। সাপ্তাহিক পূর্বাভাস পত্রিকায় রিজু

www.nagorikpathagar.com

একটা-দুটো লেখা দিয়েছিলেন, তখনই আমার সঙ্গে পরিচয়। তবে আমার চেয়েও মেরিনার সঙ্গে এ পরিবারের বন্ধুত্ব পুরনো। ভিনাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী ছিলেন।

ইমিগ্রেশন চেকিংয়ে দীর্ঘ লাইন। আমার হাতে বোঝা কম। কারণ বড়ো বড়ো স্যুটকেস দুটো বিমানের দায়িত্বে এখন। ইমিগ্রেশন মোটেও ঝামেলা করলো না।

রিজুর থাকার কথা এয়ারপোর্টের ইনফরমেশন কাউন্টারে। সে জায়গাটায় গিয়ে দেখি রিজু এখনো পৌঁছেননি। খানিক পরে এলেন তিনি। এয়ারপোর্টের নিচেই লণ্ডনের বিখ্যাত টিউবরেলওয়ের স্টেশন। আমরা পাতাল রেখে উঠে পড়লাম। রেল থেকে নেমে বাস। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ দোতলা বাস। এ শহরে একই টিকেটে রেলে ও বাসে ওঠা যায়।

রিজুর বাসায় পৌঁছলাম। রিজুর একটা ছেলে হয়েছে। তখন বাচ্চার বয়স মাস তিন চারেক। নাতীর মুখ দেখার জন্যে রিজুর আম্মা চলে এসেছেন ছেলের বাড়িতে।

রিজুদের অরিজিন্যাল বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুরে। রিজুর আম্মাও রংপুরের। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, আমি ভীষণ আনন্দ পেলাম। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ আমার আম্মা-খালাদের মতোই।

ভিনা বললেন, কি খাবেন, ভাত না পোলাও।

কথায় কথায় রিজুর আম্মা বললেন, নাপা শাক আছে।

নাপা শাকের কথা শুনে আমার মন লাফিয়ে উঠলো।

রংপুরে এক ধরনের শাক পাওয়া যায়– নাপা শাক। আমার ধারণা এই শাক পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জাতে শাক হলেও খেতে মাংসের চেয়েও ভালো। আমি ঢাকার বহুজনকে জিজ্ঞেস করেছি, নাপা শাক খেয়েছো? খাওয়া তো দূরের কথা, নামও শোনেনি কেউ। সেই নাপা শাক লণ্ডনে! রিজুর আম্মা আবিষ্কার করেছেন।

নাপা শাক রান্না হলো। মুরগি, মাছের শুঁটকি, ভাত। কি যে উপাদেয় হলো খাওয়া।

আমাকে আজ যদি জিজ্ঞেস করেন, লণ্ডন কেন ঢাকার চেয়ে বেশি উন্নত, আমি বলবো, কারণ লণ্ডনে নাপা শাক পাওয়া যায়।

রিজুর সঙ্গে বেরুলাম শহর দেখতে। রিজুরা থাকে ম্যারুন স্ট্রিটের উইলিয়াম হাউজে। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলাম সরকারি সব সাইনবোর্ডের ইংরেজির নিচে বাংলা। এ এলাকায় বাঙালি বেশি। তাই সাইনবোর্ডে বাংলা চলে এসেছে। স্কুলে বাংলা পড়ানো হয়। মিউনিসিপ্যালিটির এই এলাকার মেয়রও সম্ভবত বাঙালি। বাঙালিদের মার্কেটে গেলাম। সোনালি ব্যাংক। আলাউদ্দিনের মিষ্টির দোকান। সর্বত্র বাংলা আর বাংলা। বইয়ের দোকানে বাংলা বই, রিজু খুব করে আমার বই খুঁজতে লাগলেন।

বাকিংহাম প্যালেস, বিগবেন, টেমসনদীর ওপরে লণ্ডনব্রিজ, পিকাডেলি– সব কিছু দ্রুত দেখে যাওয়া, দ্রুত। স্থাপত্যরীতি দেখলাম ওয়াশিংটন ডিসির সঙ্গে বহুভাবে মিলে যায়। আমেরিকার বহু কিছু ইউরোপেরই উত্তরাধিকার।

www.nagorikpathagar.com

বাকিংহাম প্যালেসের উল্টোদিকে একটা পার্ক। কি যে সুন্দর সেই পার্ক। লণ্ডন কিন্তু আমার খুব ভালো লেগে গেলো।

রিজুর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলো। রিজু দেশ নিয়ে খুব ভাবেন, নানা তাত্ত্বিক ভাবনা। তাকেও আমার দারুণ লাগলো। গত বছর রিজুরা দেশে এসেছিলেন ভিনার থিসিস পেপারের কাজে। উত্তরা থেকে ঢাকায় আসার পথে একদিন এক লোক ভিনাকে বলেছিলো, এই মেয়ে, মাথায় কাপড় দাওনি কেন? রিজু মৌলবাদীদের উত্থান নিয়েও খুব চিন্তিত।

লণ্ডন থেকে ঢাকার পথে

আবার বিমানে ওঠা। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত রিজু সঙ্গে এসেছিলেন। নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন। লণ্ডন থেকে দিল্লি। দিল্লি থেকে ঢাকা। যাওয়ার পথে সময় আর যাচ্ছিলো না। সন্ধ্যার সময় প্লেন ছাড়লো। সেই রাত আর ফুরোয় না। কারণ হাতের ঘড়িতে সময় ছয় ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। এবার হলো উল্টো। ঘড়িতে ছয়ঘণ্টা যোগ করতে হচ্ছে। ফলে লণ্ডন থেকে রাত ১০টায় বিমান ছাড়ার খানিকক্ষণ পরেই ভোর হয়ে এলো। আবার দিল্লি হয়ে ঢাকা আসতে না আসতেই হয়ে গেলো বিকেল। প্লেনে ছিলাম আসলে ১২ ঘণ্টা, কিন্তু ঘড়িতে সময় গেলো ১৮ ঘণ্টা, এর ফলে যা ঘটলো, তা হলো– ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ লণ্ডনে দিলো রাতের খাবার, খানিক পরেই তাদের দিতে হলো ব্রেক ফাস্ট, আবার খানিক পরে হলো লাঞ্চ, খানিক পরে বিকেলের টিফিন। ১২ ঘণ্টা সফরে ১৮ ঘণ্টার খাবার। আবার আগের দিন নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন ফ্লাইটেও ৮ ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু খাবার পেলাম ১৪ ঘণ্টার।

বার বার খাবার আসে। এবং কি আশ্চর্য খিদেও লাগে। খাদ্যে অরুচি হয় না। ফলটি দাঁড়ালো, আমি মোটা হয়ে গেলাম।

দিল্লি-ঢাকা ফ্লাইটে ঘটলো দুটো ঘটনা। এক, পাইলট বললেন, এভারেস্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের জানালা দিয়ে তাকান। আমি বসেছিলাম ডান দিকের জানালায়। উঠে গিয়ে দেখলাম। ওই তো হিমালয়। ধূসর, ধূসর। যেন মেঘ– তার মধ্যে একটা পাহাড় উঁচু। হয়তো ওটিই এভারেস্ট।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটলো পর্দায়। ওরা ম্যারাডোনার ওপরে একটা প্রামাণ্য ছবি দেখালো। খুবই গরিব ঘরের ছেলে ছিলেন ম্যারাডোনা। বহু বছর আগে একটা জাতীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলো ম্যারাডোনার দল। ম্যারাডোনা ছিলেন ক্যাপ্টেন। ছোট্ট ম্যারাডোনা ট্রফি হাতে নিয়ে স্থানীয় টিভিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার স্বপ্ন আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে খেলা এবং আমার স্বপ্ন সেই দলটিকে নিয়ে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হওয়া। পৃথিবীর কতো মানুষের কতো স্বপ্ন থাকে। কোনোটা ঘোষিত, কোনোটা অঘোষিত। ম্যারাডোনার স্বপ্ন সফল হয়েছে কিন্তু ম্যারাডোনার বর্তমান জীবন হয়ে গেছে এলোমেলো। তার গ্রেফতার,

www.nagorikpathagar.com

সাংবাদিকদের গুলি চালানো– সে সবও দেখানো হতে লাগলো ছবিটিতে। খুব বিচলিত বোধ করতে লাগলাম। ম্যারাডোনাবিরোধী লেখা লিখে এতোদিন বেশ মজা পেয়েছি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, আর নয়।

ঢাকা এয়ারপোর্ট

১৩ নভেম্বর বিকালে ঢাকা এসে পৌঁছলাম। ইমিগ্রেশন পেরুনোর আগেই দেখি আমার বাল্যবন্ধু কাস্টম্‌স অফিসার পিন্টু দাঁড়িয়ে, শাদা ইউনিফরম পরে। সহাস্যে। এর আগের বার বাঙ্গালোর থেকে আসার সময় পিন্টু ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। লাগেজ নিয়ে বেরুচ্ছি, হঠাৎ এক কাস্টম্‌স অফিসার বললেন, আপনার ব্যাগ চেক করতে হবে, দাঁড়ান। উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে দেখি, পিন্টু হাসছে।

ইমিগ্রেশন পেরিয়ে এলাম। এবার লাগেজের জন্যে অপেক্ষা। মালপত্র আসতে দেরি হচ্ছে। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, মেরিনা, শুভ্র, মিলন। রেমন ভাই গাড়ি নিয়ে এসেছেন।

মালপত্র আসতে দেরি হচ্ছে। পিন্টু বললো, চা খাও। খেতে খেতে আমার মনে হলো, ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এলাম, কিন্তু কোনো অঘটন ঘটবে না, তা কিভাবে হয়। আমার মতো মানুষ কোনো অসুখ-বিসুখে পড়লো না, পাসপোর্ট টিকেট হারালো না। আমার ১২ জন সতীর্থ সাংবাদিকের তিনজনের ব্যাগ ওয়াশিংটনে পৌঁছেছে তিনদিন পর। তিন দিন ওরা একবস্ত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। এবার নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে। সব আসবে, কেবল আমার মালপত্র আসবে না।

তাই হলো। মালবাহী শেকলটা ঘুরছে, সবাই যার যার জিনিসপাতি পেয়ে যাচ্ছে। একে একে সবাই চলে গেলো। শেকলের ঘোরা বন্ধ হয়ে গেলো। শূন্যহাতে শূন্য হৃদয়ে আমি গেলাম ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে। দুটো সুটকেস হারানোর ফরম পূরণ করে আমি খালি হাতে বেরিয়ে এলাম বিমান বন্দরের কাচ ঘেরা এলাকা থেকে।

আমার পরনে সোয়েটারের ওপরে কোট। মেরিনা বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, গরমে সবার মারা যাবার যোগাড়, খোলো ওসব।

তুমি তো বেশ মোটা হয়ে গেছো– বললো সবাই। বললাম, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের খাবার বার বার খেয়েই এই তো কিছুক্ষণ আগে মোটা হলাম।

রেমন ভাই গাড়ি চালাচ্ছেন। আমি, মিলন, মেরিনা, শুভ্র গাড়িতে। কতো গল্প, কতো কথা। সব কি একবারে বলা যায়। গাড়ি চলছে। উত্তরা, বারিধারা, মহাখালি। সেই রিক্‌শা, সেই কালো, বাদামী, ভাঙাচোরা মানুষের স্রোত। রাস্তায় ধূলি। সব কিছু কতো ভালো। হেমন্তকাল। না শীত, না গরম। শৈশবের স্মৃতি জাগানিয়া শুকনো মনমরা বিকাল। কতো দিন পর আমি আবার ফিরে এসেছি আমার দেশে। আমার দেশ, আমার নিজের! এ শহর, ঢাকা। তার যানজট, তার হরতাল।

www.nagorikpathagar.com

বইমেলা, বেইলি রোডে নাটক। মোহামেডান, আবাহনী। রাস্তার ধারে রিকশাঅলাদের জন্যে চুলোয় চড়েছে চিতোই পিঠা। আমি আমার এই দেশ ছেড়ে কোথায় যাবো? মনে পড়ে গেলো কলারাড্যোর হোটেলের কর্মচারীর সেই সংলাপ। বাংলাদেশ, ওটা কি পৃথিবীর সেরা দেশ হতে পারে? তুমি তো লাসভেগাস যাওনি, তাই। আর আমার সেই কান্না। সেই অঝোর অশ্রুপাত। তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও আমি রব এই বাংলায়।

মনে মনে আবার আবৃত্তি করতে লাগলাম–
'পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে–
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।'

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

বাংলাদেশকে পটভূমি করে অস্ট্রেলিয়ান চিত্রকর ও ঔপন্যাসিক ওয়াইন এস্টনের লেখা উপন্যাস

টিন রঙা শাড়ি

ওয়াইন এস্টনের সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Under a Tin-grey Sari*-র বাজার জমজমাট। সম্প্রতি এক আড্ডায় উপন্যাসটি সম্পর্কে জানতে পারি। কৌতূহল ব্যাপক হয়, যখন শুনি উপন্যাসটির পটভূমি বাংলাদেশ। আরো চমৎকার যে পেপার ব্যাকে মোড়া ৪৭০ পৃষ্ঠার উপন্যাসটির পটভূমি আমার জন্মভূমি চট্টগ্রাম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মনোরম শৈল শহর চট্টগ্রামের প্রেম কাহিনী। খ্যাতিমান সমালোচক কিম স্কট লিখছেন, 'ইট ইজ আ সেনশুয়্যাল লাভ স্টোরি সেট ইন ১৯৬৭ ইন দ্য বাস্টলিং সিটি অব চিটাগাং। আই লাভড্ দ্য প্লেফুল উইট অ্যান্ড আইরনি অব দিজ নভেল অ্যান্ড ফেল্ট আই হ্যাড এন্টার্ড্ ইনটু অ্যান ইনটিমেট প্যাক্ট উইথ দি ন্যারেটর।

উপন্যাসটির আগাগোড়া ইতিহাসের সময়কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। খালেদ নামের এক বাবুর্চি এ উপন্যাসের নায়ক। এই তরুণ বাবুর্চিটি অসাধারণ তন্দুরি পাকানোর কারণে চট্টগ্রাম শহরে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে এবং তার বদ্ধ ধারণা সাহেব (Sahib's) মহলে বিয়ের খানা পাকাতে পাকাতে একদিন সে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠবে। যখন তার উদ্ভূত ধারণা চুরি করে ইংরেজ সাহেবদের কারখানায় তন্দুরি পাকানো শুরু হয়, খালিদের বেদনা তখন চরমে পৌঁছে। ইতিমধ্যে সাহেবের বাসার জেঠি নামের সুন্দরী আয়াটির সঙ্গে খালেদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রেমান্ধ খালেদ জানে না যে, জেঠি উত্তেজক অপরাহ্ন পাড়ি দিচ্ছে। কেননা সাহেবীয় প্রেমের আলাদা স্বাদের জন্য জেঠি তখন পাগলপ্রায়। আরো অনেক ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের ভেতর এগিয়ে যায় উপন্যাসটি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গেও ইঙ্গিত রয়েছে এতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে অস্থির খালেদের প্রতিক্রিয়াগুলো চমকে দেয়। নিঃসন্দেহে ওয়াইনের ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট উপন্যাসটি। ভাষা যেন সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো দোল খায়। পশ্চিম প্রান্তে বড় হওয়া ওয়াইন এস্টন পাশ্চাত্য ধারায় কৌতুকের ব্যাপারেও অগ্রণী। তাই রসবোধের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রেম কাহিনীটি মনোটোনাস তো নয়ই বরং দ্বন্দ্বে অনেক তীব্র।

–অজয় দাশগুপ্ত, (দৈনিক প্রথম আলো **২১-০২-২০০৩**)

উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ শিবব্রত বর্মনের অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে

www.nagorikpathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আফগান লেখক খালেদ হোসাইনি'র
আলোড়ন সৃষ্টিকারী, প্রশংসিত প্রথম উপন্যাস:

দ্য কাইট রানার

বার বছরের বালক আমির বাবার স্বীকৃতি পেতে মরিয়া। ওর মাঝে পৌরুষের উপাদান আছে প্রমাণ করতে স্থানীয় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার সংকল্প করে ও। ওর বিশ্বস্ত বন্ধু হাসান ওকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সবসময়ই আমিরকে সাহায্য করে সে। কিন্তু এটা ১৯৭০ দশকের আফগানিস্তান। হাসান স্রেফ নিচু শ্রেনীর এক ভৃত্য, পথেঘাটে যাকে নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়, যদিও ছেলেটার সহজাত সাহস আর ওর বাবার হৃদয়ে তার আসনের কারণে তাকে ঈর্ষা করে আমির। প্রতিযোগিতার দিন বিকেলে হাসানের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আঁচ করতে পারে নি ওরা কেউই– যা চুরমার করে দেবে ওদের জীবন। রাশানরা আগ্রাসন চালানোর পর ওর পরিবার যখন আমেরিকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, আমির বুঝল একদিন অবশ্যই ফিলতে হবে ওকে এমন কিছুর সন্ধানে নতুন জগৎ যা দিতে পারে নি ওকে: নিস্কৃতি।

"সত্য ও সুন্দরের অন্বেষণ। নিস্পাপ ছেলেবেলা আর দুটি কিশোরের বেদনার্ত কাহিনী।" –*ডেইলি টেলিগ্রাফ*

"হোসাইনি সত্যিই একজন প্রতিভাবান কথক... আপনার হৃদয়ে সুর তুলতে কোনও তন্ত্রীতে টোকা দিতেই শঙ্কিত নন।" –*দ্য টাইমস্*

"দরদ ও সত্যির অনুরণন। আমির ওর মারাত্মক ভুল শোধরানোর প্রয়াস পাচ্ছে, সে বিচারে ওই গ্রন্থের নায়ক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাসানের নীরব, নিবেদিতপ্রাণ ভালোবাসাই আপনার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবে।" –*ডেইলি মেইল*।

"প্রেম ও বিবাহের অভিজ্ঞতার মূলে পৌঁছানোর ক্ষমতা হোসাইনিকে ট্যাং-রা লা'র মতো নতুন আমেরিকার অনন্য কাহিনীর কাতারে পৌঁছে দেয়... অসাধারণ মহত্ত্ব, সততা এবং সহানুভূতির উপন্যাস।" –*ইন্ডিপেন্ডেন্ট*।

"খালেদ হোসাইনির *দ্য কাইট রানার* এক অসাধারণ উপন্যাস।... দীর্ঘক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিলাম। ব্যতিক্রমধর্মী। ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী লেখক।" –*ইসাবেল আয়েন্দো*।

সাদেকুল আহসানের অনুবাদে সন্দেশ থেকে
লেখক কর্তৃক অনুমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

www.nagorikpathagar.com

সোফির জগৎ

মূল: ইয়স্তেন গার্ডার

অনুবাদ: জি এইচ হাবীব

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নিয়ে একটি চমকপ্রদ, অভাবনীয় উপন্যাস!

সোফি অ্যামুন্ডসেন। চোদ্দ বছর বয়েসী এই নরওয়েজিয় বালিকা একদিন তাদের বাসার ডাকবাক্সে উঁকি মেরে দেখতে পায় সেখানে কে যেন অবাক-করার মতো দু'টুকরো কাগজ ফেলে রেখে গেছে। কাগজ দুটোয় স্রেফ দুটো প্রশ্ন লেখা

"তুমি কে?" আর "এই পৃথিবীটা কোথা থেকে এল?"

অ্যালবার্টো নক্স নামের এক রহস্যময় দার্শনিকের লেখা সেই রহস্যময় চিরকুট দুটোর সেই কৌতূহল উস্কে দেয়া প্রশ্ন দুখানিই সূত্রপাত ঘটিয়ে দিল প্রাক-সক্রেটিস যুগ থেকে সার্ত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের রাজ্যে এক অসাধারণ অভিযাত্রার। পরপর বেশ কিছু অসাধারণ চিঠিতে আর তারপর সশরীরে, পোষা কুকুর হার্মেসকে সঙ্গে নিয়ে, অ্যালবার্টো নক্স সোফি-র কৌতূহলী মনের সামনে দিনের পর দিন একের পর এক তুলে ধরলেন সেই সব মৌলিক প্রশ্ন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছেন বিভিন্ন দার্শনিক আর চিন্তাশীল মানুষ।

কিন্তু সোফি যখন এই চোখ ধাঁধানো আর উত্তেজনায় ভরা আশ্চর্য জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে আর অ্যালবার্টো নক্স এমন এক ষড়যন্ত্রের জালে নিজেদেরকে বাঁধা পড়তে দেখল যে খোদ সেটাকেই এক যারপরনাই হতবুদ্ধিকর দর্শনগত ধাঁধাঁ ছাড়া অন্য কিছু বলা সাজে না।

> অসাধারণ... তিন হাজার বছরের চিন্তার ইতিহাসকে ইয়স্তেন গার্ডার চারশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত জটিল সব বিতর্কিত বিষয়কে, অথচ সেগুলোর গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়নি এতটুকু। ...সোফির জগৎ এক অসাধারণ কীর্তি। **–সানডে টাইম্‌স**

সকলের পাঠোপযোগি এ বইটি বাংলাসহ ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

ISBN 984 70209 0036 8